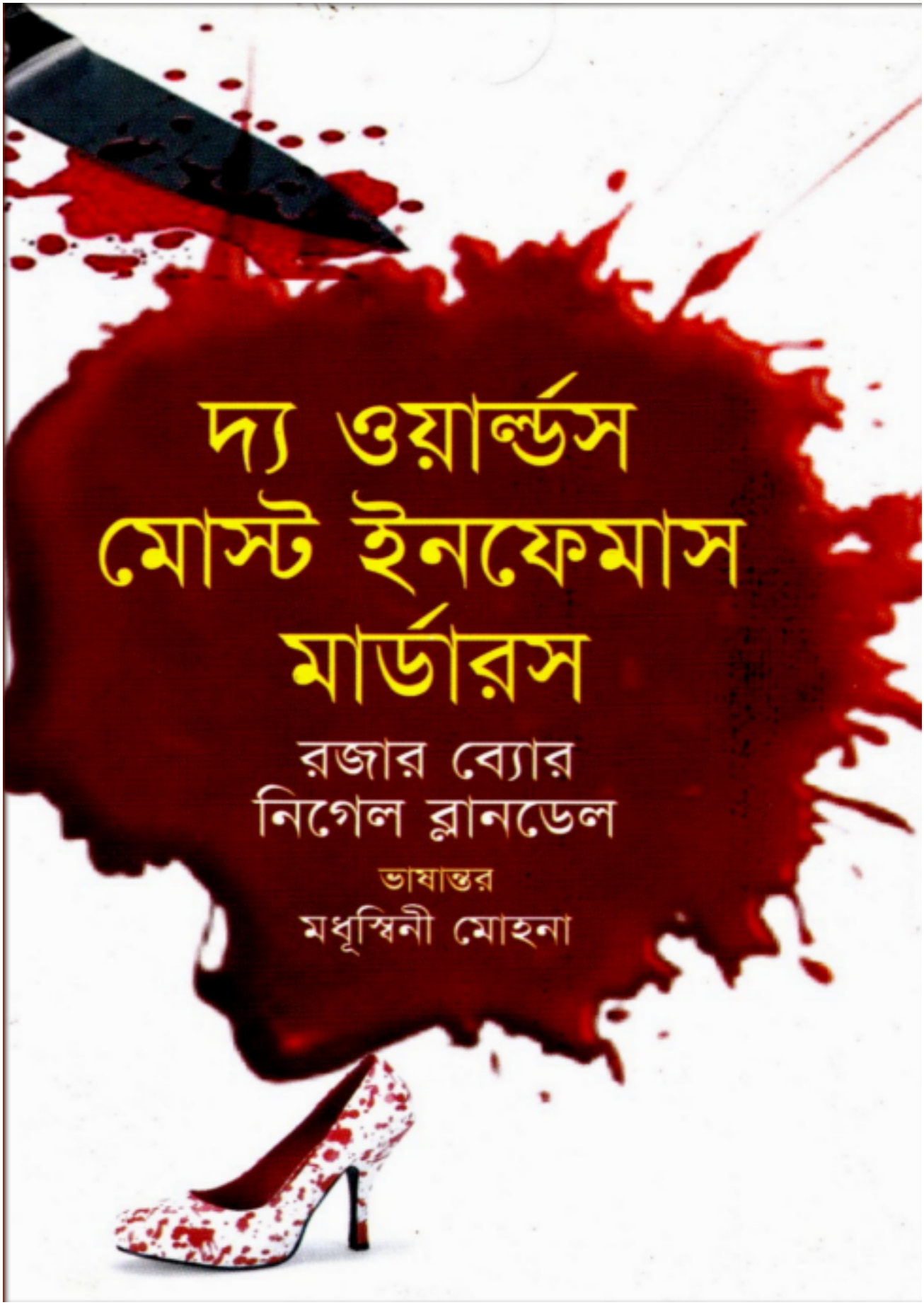
দ্য ওয়ার্ল্ডস
মোস্ট ইনফেমাস
মার্ডারস
রজার ব্যোর
নিগেল ব্লানডেল
ভাষান্তর
মধূস্বিনী মোহনা

দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ইনফেমাস মার্ডারস

মূল
রজার ব্যোর
নিগেল ব্লানডেল

ভাষান্তর
মধূস্বিনী মোহনা

ঐতিহ্য

দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ইনফেমাস মার্ডারস
মূল : রজার ব্যোর ও মিগেল ব্লানডেল
ভাষান্তর : মধুস্বিনী মোহনা

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪১৯
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
পাঁচশত টাকা

THE WORLD'S MOST INFAMOUS MURDERS by
Roger Boar & Nigel Blundell.
Translated by Modhuswiny Mohona
Published by Oitijjhya.
Date of Publication : February 2013.

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Copyright©2013 The Hamlyn Publishing
Group Limited, 1983
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form.

Price: Taka 500.00 US$ 15.00
ISBN 978-984-776-125-1

অনুবাদকের উৎসর্গ

বাবাকে

যিনি ঝরা পাতা দিয়ে আলপনা আঁকতে অনুপ্রেরণা দেন

অনুবাদকের কথা

খুন একটি জঘন্য অপরাধ। এই ভয়ংকর অপরাধ বিশ্বের সব দেশেই সংঘটিত হয়েছে এবং হয়ে আসছে। আমাদের দেশেও প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে নৃশংস সব খুনের ঘটনা। পৃথিবীর সবচেয়ে নৃশংস ও চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিখ্যাত অপরাধ বিষয়ক লেখক রজার ব্যোর ও নিগেল ব্লান্ডেল রচিত 'দ্য ওয়ার্ল্ড'স মোস্ট ইনফেমাস মার্ডারস' বইটি যখন আমার হাতে আসে আমি তা অনুবাদ করার লোভ সংবরণ করতে পারিনি। বইটি পড়ে আমি পশ্চিমা দেশের হত্যাকাণ্ড ও আমাদের দেশের হত্যাকাণ্ডের মোটিভ ও ধরনে বেশ সুস্পষ্ট পার্থক্য খুঁজে পাই।

এই বইটিতে এমনও ঘটনার উল্লেখ আছে যেখানে একজন খুনি ১৩০টি ছেলেকে হত্যা করে তাদের মাংস বিক্রি করেছিল। এমনও দম্পতি আছে যাদের সংসার জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল ছোট ছোট নিষ্পাপ শিশুকে যৌননির্যাতন করে হত্যা করা। মিষ্টি মধুর কথায় প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে আইনের ছাত্র টেড পৈশাচিক অত্যাচার করে একাই হত্যা করেছিল ৩৬জন তরুণীকে, ঐতিহাসিক 'জ্যাক দ্য রিপার' এর হাতে খুন হয়েছিল কয়েক ডজন নারী, 'মনস্টার অফ দ্য আন্দিজ' কীভাবে ১১০টি বালিকাকে হত্যা করে অবলীলায়। নিছক আনন্দের জন্য বিষ প্রদানের মাধ্যমে অসংখ্য খুনের ঘটনারও উল্লেখ আছে বইটিতে। সামান্য ইন্স্যুরেন্সের অর্থের জন্য চার স্বামী, নিজের ১১টি সন্তানসহ সেই স্বামীদের আরও ৭জন সন্তানকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছিল এক নারী। 'দ্য টিনএজ মনস্টার' তার সমান ছেলেমেয়েদেরই নির্মম অত্যাচার করে হত্যা করত। মানুষ কীভাবে মারা যায়! মৃত্যু যন্ত্রণায় মানুষের অনুভূতি কী? মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা উপভোগ করার জন্য ইহুদি হত্যার নামে একজন চিকিৎসক গ্যাস চেম্বারের মাধ্যমে ৫০জনকে হত্যা করে। এসব তো শুধু কয়েকটি ঘটনার উদাহরণ মাত্র। এ গ্রন্থে বর্ণিত হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকা দুটি কথায় ব্যক্ত করার মতো নয়। পৃথিবীতে আরও অনেক ধরনের খুন ও গণহত্যার ঘটনার অবতারণা ঘটেছে তবে এই বইটিতে শুধু ব্যক্তি বিশেষে হত্যাকারী ও হত্যার ধরনকে অবলম্বন করে গল্প সংকলন করা হয়েছে। এখানে হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকার সাথে খুন ও খুনির প্রকৃতি এবং তার মোটিভও বর্ণিত হয়েছে।

'দ্য ওয়ার্ল্ড'স মোস্ট ইনফেমাস মার্ডারস' বইটির ১৭টি গল্প অমর একুশে বইমেলা ২০১২তে দিব্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয় 'বিশ্বের কুখ্যাত খুনের কাহিনি' শিরোনামে। প্রথম বইটির চমৎকার ভূমিকা লিখে দেন জনাব শফিকুর রহমান। প্রথম প্রচেষ্টা ও প্রথম প্রকাশেই বইগুলো মেলা থেকে নিঃশেষিত হয়ে যায় যা আমার অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস। এছাড়াও এই বইটির অনূদিত গল্পগুলো ধারাবাহিকভাবে মাসিক পত্রিকা 'ডিটেকটিভে' প্রকাশিত হয়। ডিটেকটিভ ও দিব্য প্রকাশ আমার পুনঃপ্রচেষ্টায় সাহস যোগাতে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে। অমর একুশে বইমেলা ২০১৩ তে আবারও পরবর্তী

১৮টি গল্পের সাথে পূর্বপ্রকাশিত গল্পগুলো নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কলেবরে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে এই অনুবাদগ্রন্থটি। বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা 'ঐতিহ্যে'র প্রধান নির্বাহী জনাব আরিফুর রহমান নাইমের সুপরামর্শে বইটির প্রকৃত নাম অপরিবর্তিত রেখে অখণ্ডভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথমবারের প্রকাশিত ১৭টি গল্পের সাথে নতুন ১৮টি গল্প থাকছে যেখানে লোমহর্ষক পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের অবতারণা ঘটেছে। প্রতিটি ঘটনাই আমাকে অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত করেছে। অনুবাদ করতে গিয়ে নিজেকেই বলেছি, "কীভাবে একজন মানুষের পক্ষে এতটা নৃশংস আচরণ প্রদর্শন করা সম্ভব?" আগেই একবার বলেছি যে আমাদের দেশে এতটা জঘন্য হত্যাকাণ্ড সাধারণত সংঘটিত হয় না। এর মানে এই নয় যে শুধু হিংস্র পাশবিক হত্যাকাণ্ডই শুধু অপরাধ হিসেবে গণ্য। হত্যা একটি অমার্জনীয় অপরাধ। অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের অপরাধী যতটা দোষী একটি খুনের অপরাধী তার চেয়ে কম নয়। এ প্রসঙ্গে শেকসপিয়ারের একটি উক্তি মনে পড়ল, "সবচেয়ে উত্তম উদ্দেশ্যে কৃত হত্যাকাণ্ডও নিকৃষ্টতম।"

'দ্য ওয়ার্ল্ড'স মোস্ট ইনফেমাস মার্ডারস' বইটিতে বর্ণিত কাহিনির প্রত্যেকটি হত্যাকারীকেই গ্রেফতার করে উপযুক্ত সাজা দেওয়া হয়। যত সংখ্যক হত্যাই করে থাকুক না কেন, অপরাধী কখনও লুকিয়ে থাকতে পারে না। পুলিশ নিবিড় তদন্তের মাধ্যমে প্রতিটি ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন পূর্বক তাদের গ্রেফতার করে, অনেকের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয় লোমহর্ষক ঘটনা। তাদের সাজা ও পরিণতি সবই বর্ণিত আছে এই বইটিতে। আশা করি আমার অনুবাদ করা গল্পগুলো পাঠককে ততখানিই শিহরিত ও আন্দোলিত করবে যতটা আমাকে করেছিল। তবেই না অনুবাদ সাহিত্যে আমার প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক হবে।

মধুস্বিনী মোহনা
নিউ বেইলী রোড
ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

সূচিপত্র

দ্য সন অব স্যাম/১১
গ্ল্যামারস লাভারস/১৮
দ্য ফল রিভার অ্যাক্স মার্ডারস/২৫
দ্য মুরস মার্ডারারস/৩৭
দ্য ভয়েজ অব টেরর/৪৩
কনভিক্টেড বাই হিজ ক্রুকেড টিথ/৪৭
দ্য 'মনস্টার ইন হিউম্যান শেইপ'/৫২
এ মিসক্যারিজ অফ জাস্টিস?/৬০
দ্য স্ট্রিকনিন স্পেশালিস্ট/৬৮
কট বাই এ নিউ ইনভেনশন ৭৭
দ্য বোস্টন স্ট্র্যাঙ্গলার/৮৮
দ্য লোনলি হার্টস কিলারস/৯৫
দ্য কিলার ক্লাউন/১০১
দ্য ভ্যাম্পায়ার কিলার/১০৬
দ্য এ সিক্স লে-বাই মার্ডারার/১১০
দ্য ম্যাস মার্ডারার অব হ্যানোভার/১১৬
দ্য স্যাডিস্টিক রোমিও/১২৪
দ্য হার্টলেস হাজব্যান্ড/১৩৪
ইস্ট এন্ড টেরর/১৩৯
দ্য ওয়ান হু গট অ্যাওয়ে/১৪৬
দ্য ভ্যাম্পায়ার অব ডাসেলডর্ফ/১৫০
দ্য কিলার হু কেপ্ট কোয়ায়েট/১৬০
দ্য মনস্টার অব দ্য অন্দিজ/১৭১
দ্য মার্ডারাস ফ্যামিলি/১৭৮
ব্যাড বাট নট ম্যাড/১৮৩
দ্য প্রিন্স অব পয়জনার্স/১৮৯
দ্য মার্ডারাস মিউজিশিয়ান/২০২
দ্য ট্রায়াঙ্গুলার চেম্বার অফ ডেথ/২০৯
দ্য টিনএজ মনস্টার/২১৬
দ্য সুইসাইড মার্ডারস/২২৪
দ্য র‍্যাট পয়সনার/২৩৫
দ্য ইয়র্কশায়ার রিপার/২৪১
দ্য লিথাল রোমিও/২৫০
আটলান্ট'স স্ট্রিটস অফ ফিয়ার/২৫৯
দ্য কেস অব লিথাল কাপপা/২৬৫

দ্য সন অব স্যাম

সন অব স্যাম নামে পরিচিত নৃশংস হত্যাকারী ডেভিড বেরকভিজ (David Berkowitz) সুপরিকল্পিতভাবে এবং অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় একের পর এক খুনের ঘটনা সংঘটনের মাধ্যমে সে বছর গোটা নিউইয়র্ক শহরকে ভীষণভাবে আতঙ্কিত করে রেখেছিল। পর পর ছয় ছয়টি মানুষকে হত্যা করে সে সকলের কাছে কুখ্যাত খুনি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৭ সালে পর পর ৫ জন মহিলা ও একজন পুরুষকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর সারা শহর তার ত্রাসের রাজত্বে পরিণত হয় এবং সমাজে দুর্বিষহ ও চাঞ্চল্যকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। সন অব স্যাম সাধারণত অবিবাহিত প্রেমিক-প্রেমিকা জুটি অথবা নিঃসঙ্গ নারীদের ওপর হামলা চালাত। তার ছয়টি খুনের প্রথম চারজন শিকারই ছিল নিঃসঙ্গ নারী এবং শেষের দুজন ছিল নারী-পুরুষ জুটি। এই নিষ্ঠুর হত্যাকারী দুটি কুকুরকে হত্যা করে। খুবই কম সময়ে ছয়জন মানুষ নিহত হওয়ায় পুলিশ হন্যে হয়ে খুনিকে খুঁজতে থাকে। তার নিষ্ঠুর খুনের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। তার খুনের সংখ্যা যতই বাড়ছিল প্রমাণের আলোকে ততই মৃগী রোগ অথবা কোনো মানসিক রোগের সঙ্গে খুনের যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছিল। রাতের অন্ধকারে নির্জন স্থানে নিঃসঙ্গ নারী অথবা হাসি-খুশি অভিসাররত প্রেমিক জুটির ওপর খুনি তার অজানা আক্রোশের বিস্ফোরণ ঘটাত। ডিস্কো ও রেস্টুরেন্টগুলো আগে আগে খালি হয়ে যেত। কারণ বেশিরভাগ স্থানীয় মানুষ খুনির ভয়ে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরে যেত।

কয়েক মাসের মধ্যেই বেরকভিজ সর্বত্র সন অব স্যাম নামে কুখ্যাতি লাভ করে। এর মূল কারণ হলো ঘটনাস্থলের কাছাকাছি প্রায়ই একটি চিঠি পাওয়া যেত। যেখানে খুনি নিজেকে সন অব স্যাম নামে পরিচয় দিত। প্রথমবার যে চিঠিটির মাধ্যমে এই খুনি সম্পর্কে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। সেটি একটি প্রেমিক-প্রেমিকা জুটির গুলিবিদ্ধ ও ক্ষত-বিক্ষত লাশ থেকে কয়েক হাত দূরেই রাস্তার ওপর পড়ে থাকতে দেখা যায়। এটি ছিল খুনির ৫ম ও ৬ষ্ঠ খুন এবং এই হত্যাকাণ্ড সংঘটনের মধ্য দিয়ে সে সর্ব প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ক্ষুদ্র একটি চিঠির মাধ্যমে যার বিষয়বস্তু ছিল এ রকম...

'প্রিয় ক্যাপ্টেন জোসেফ বোরেলি, (Joseph Borelli) আপনি আমাকে অবজ্ঞাভরে Women Hater (নারী ঘৃণাকারী, প্রচলিত ভাষায় Homosexual বা Gay বা সমকামীরাও নারীঘৃণাকারী) বলাতে আমি গভীরভাবে দুঃখিত ও আহত হয়েছি। আপনি ভুল করেছেন, আমি সমকামী নই। কিন্তু আমি পিশাচ, আমি রাক্ষস। আমি সন অব স্যাম।'

ডেভিড বেরকভিজ এই চিঠিটি ফেলে রাখে যেখানে, সে গাড়ির ভেতর ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকা ক্যাপ্টেন জোসেফ বোরেলি ও তার বাগদত্তাকে নির্মমভাবে গুলিতে শরীর ঝাঁঝরা করে হত্যা করে। এই খুনটির সঙ্গে আরও একটি খুনের যোগসূত্র আছে, সে ঘটনায় আমি পরে আসছি।

এতগুলো খুন ও চারটি ভয়ংকর হামলার পর ক্যাপ্টেন জোসেফের মৃত্যুর ঘটনাস্থল থেকে এমন চিঠি পাওয়া শুরু হয়। পরবর্তী হত্যাকাণ্ডগুলোতেও লাশের আশপাশে এমন লোমহর্ষক ভাষার ছোট্ট চিঠি পাওয়া যেতে থাকে। প্রথম চিঠিটা প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিউইয়র্ক শহরের মেয়র পুলিশকে নির্দেশ দেন সন অব স্যামকে যে কোনো অবস্থায় গ্রেপ্তার করতে ঊর্ধ্বতন গোয়েন্দা কর্মকর্তা জন ফালোটিকোর (John Falotico) নেতৃত্বে ২০০ জন গোয়েন্দা নিয়ে যেন একটি বিশেষ স্কোয়াড গঠন করা হয়। এই গোয়েন্দারা নিউইয়র্কের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে।

প্রত্যেকটি গুজব, প্রত্যেকটি প্রমাণকেই তৎপরতার সঙ্গে অনুসরণ করা হচ্ছিল। কিন্তু খুনির পরিচয় রহস্যের আড়ালেই থেকে যাচ্ছিল। এদিকে খুনির তৎপরতা ও নিষ্ঠুরতা সবার অগোচরে বেড়েই চলছিল। তাই এ অবস্থা ঠেকাতে গভীর রাতে ডিউটি করার জন্য আরও ১০০ জন অস্ত্রধারী পুলিশকে নিয়োগ করা হয়। যেসব জায়গার আশপাশে আগে খুন হয়েছে এবং যেসব জায়গায় পরবর্তীতে হামলা হতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল, সেসব জায়গায়কেও কড়া নিরাপত্তাধীন রাখা হলো।

পুলিশ খুনিকে পাগল অথবা স্কিটসোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত (Schizophrenia, এটি এক ধরনের মানসিক রোগ যা মানুষের মস্তিষ্ককে অসংলগ্ন করে ফেলে ও রোগীকে আশপাশে অবাস্তব জিনিস দেখতে ও কল্পনা করতে বাধ্য করে। এসব রোগী এই অবাস্তব দুনিয়ার ভয়ে হয় গৃহবন্দি অথবা হিংস্র হয়ে ওঠে। কারণ তখন সে সকলকেই সন্দেহ ও ঘৃণা করতে থাকে) মানসিক রোগী হিসেবে বর্ণনা করল। তদন্ত ও অন্যান্য প্রমাণের আলোকে পুলিশ ধারণা করল যে, খুনি হয়তো নিজেকে কোনো পৈশাচিক শক্তির জিম্মি হিসেবে কল্পনা করে এবং কাউকেই শুভাকাঙ্ক্ষী ভাবতে পারে না। বেরকভিজের লেখা চিঠির ধরন থেকে সন্দেহ করা হলো যে, সে হয়তো কোনো এক সময় পুলিশ বাহিনীর কোন সদস্য ছিল এবং হয়তো হঠাৎ করেই সবার আড়ালে চলে গিয়েছিল। তার বয়স আন্দাজ করে কাছাকাছি বয়সের

নিখোঁজ পুলিশ সদস্যদের খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। এরই মধ্যে একটির পর একটি খুন হয়েই চলছিল এবং তখন পর্যন্ত তার মোট খুনের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল আটটিতে। এ সময় আরও একটি জুটি খুন হয় গাড়িতে বসা অবস্থায়। বেরকভিজ গাড়ির কাঁচ ভেদ করে ছেলেটির হাত ও ঘাড়ে এবং মেয়েটির মাথা, ঘাড় ও কাঁধে গুলি করে। এ ঘটনার পর পুলিশ তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কিছুতেই খুনির হদিস পাওয়া যায় না। পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সে আবারও এক মাসের মধ্যে আরেকটি হামলা করে। এবার সে ববি ভায়োলান্তে (Bobby Violante) ও স্টেসি মস্কোভিজ (Stace Moskowit) নামে দুটি ২০ বছরের ছেলেমেয়েকে নির্মমভাবে খুন করে। স্টেসি ৩৮ ঘণ্টা হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ডেভিড বেরকভিজ

অবশেষে এই নিষ্ঠুর খুনিকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ সক্ষম হয় ক্ষুদ্র একটি বস্তুগত সাক্ষ্য অর্থাৎ একটি পার্কিং টিকেটের সুত্র ধরে। সাধারণত সে আড়াল থেকে লক্ষ করত কখন পুলিশ তার গাড়িতে পার্কিং টিকেট লাগায়। পুলিশ সেখান থেকে সরে গেলে সে টিকেট ছিঁড়ে তা গায়েব করে দিত। ফলে তার খোঁজ পাওয়া যেত না। বেরকভিজ তার হামলার জন্য বেশিরভাগ সময়ই পার্কিং স্থান নির্ধারণ করত তাই পুলিশ এক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করছিল। এভাবে অত্যন্ত চাতুর্যতার সঙ্গে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতে দিতেই একদিন তার ভাগ্যের

নির্মম পরিহাসে একজন মহিলা তাকে দেখে ফেলে। সমাজ ও পুলিশের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, কোনো জীবিত ব্যক্তি এই প্রথম তার চেহারা স্বচক্ষে দেখতে পারে।

মহিলাটি তার কুকুরকে নিয়ে সন্ধ্যায় হাঁটতে বেরিয়েছিল এবং তখনই সে একটি ছেলেকে এগিয়ে আসতে দেখে। ছেলেটির চেহারা মহিলার মনে ছিল। কারণ ছেলেটির মুখে একটি অদ্ভুত হাসি লেগেছিল। কাছাকাছি আসার পর ছেলেটির হাতে অস্ত্র দেখে মহিলাটি ভয় পেয়ে একটি গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে যায়। আবারও সৌভাগ্যই বলতে হবে যে ছেলেটি তার গাড়ির থেকে পার্কিং টিকেটটি ছিঁড়ে ওখানেই ফেলে রেখে যায়। মহিলাটি তখনই পুলিশকে ফোন করে এবং অজ্ঞাতনামা ছেলেটির ফেলে দেওয়া পার্কিং টিকেটটি পুলিশকে দেয়। টিকেটটির সাহায্যে পুলিশ গাড়ির মালিক সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করে এবং বেরকভিজের তথ্য পায়। তারা বেরকভিজের গাড়ি খুঁজে বের করে তার গাড়ি রাখার নির্ধারিত স্থানে গিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে।

সেদিনই সন্ধ্যার পর বেরকভিজ গাড়ি নিতে আসে খুবই শান্তভাবে হেঁটে হেঁটে। তার মুখে লেগেছিল এক অদ্ভুত হাসি। পুলিশ সেই মহিলার বর্ণনার কথা মনে করে। সেই ছেলেটির মুখে একটি অদ্ভুত বাচ্চাসুলভ হাসি লেগেছিল যেন, খুব মজার কিছু হচ্ছে। তার হাতে ছিল একটি সাধারণ কাগজের প্যাকেট যার মধ্যে ০.৪৪ ক্যালিবারের গান পাওয়া যায়। পুলিশ তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তার হাতের অস্ত্র ফেলে দিতে বলে। এ সময় পুলিশ তাকে তার আসল নাম ডেভিড বলে সম্বোধন করলে সে খুবই শান্তভাবে তা অস্বীকার করে পুলিশকে বলে, 'আমার নাম স্যাম এবং আমি নির্দোষ।' তখনো তার মুখে হাসি লেগেই ছিল। পুলিশ কঠোরভাবে তার দিকে অস্ত্র তাক করে তার অস্ত্রটি নিয়ে নিলে সে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে এবং সে অবস্থায়ই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর সে অদ্ভুত তথ্য দেওয়া শুরু করে ও প্রলাপ করতে করতে বার বার বলতে থাকে যে, এসব খুন সে নিজে করেনি বরং কোনো এক পৈশাচিক শক্তি তাকে বাধ্য করেছে খুনগুলো করতে। সে আরও বলতে থাকে যে, তার হাতে খুন হওয়া কুকুরটির মধ্যে ৬ হাজার বছরের বয়স্ক একজন ব্যক্তির আত্মা ছিল এবং তারই আদেশে তাকে মুক্ত করার জন্য সে কুকুরটিকে হত্যা করতে বাধ্য হয়।

বেরকভিজের বয়স তখন ছিল ২৮ বছর। সে স্কিটসোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগী হওয়ায় তাকে এই ১০টি মানুষ ও দুটি কুকুর হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি। কিন্তু ৩০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যদিও ধারাবাহিক খুনগুলোর জন্য তাকে একাই দায়ী করা হয়, কিন্তু সে তার শুনানিতে দাবি করে যে, সে নিউইয়র্ক স্যাটানিক কাল্ট (New York Satanic Cult) নামক চক্রের সদস্য এবং তার সঙ্গে আরও কয়েকজন বন্ধু এ রকম কাজে নিয়োজিত। তখন

তার কথার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং বেরকভিজও তার সহসদস্যদের কোনো হদিস দিতে পারেনি। পুলিশ বিশ্বাস করল যে, বেরকভিজ একাই এসব কাজ করত। কিন্তু সাংবাদিক, আইনজীবী ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বেরকভিজের কথা বিশ্বাস করতে লাগল। সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন ভয় জন্ম নিল যে সত্যিই হয়তো আরও লোক আছে উক্ত খুনি চক্রে, যারা এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নিয়োজিত। পুলিশ ও গোয়েন্দারা গুরুত্বের সঙ্গে আরও তদন্ত শুরু করল। প্রথমে যদিও বেরকভিজের কথায় পুলিশ বিশ্বাস করেনি। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানের সাক্ষীরা খুনির উচ্চতা ও চেহারা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিলে পুলিশ বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে আরও তদন্ত চালিয়ে যায়। সাক্ষীদের দেওয়া তথ্যের মিল বলতে ছিল মুখে লেগে থাকা অদ্ভুত হাসি, যা বেরকভিজের চেহারায় সবার আগে চোখে পড়ত। এছাড়া সাক্ষীর বর্ণনার সাহায্যে পুলিশের আঁকা চারটি ছবি ছিল চার রকম। এই চারটি ছবির মধ্যে একটি বাদে বাকি তিনটি বেরকভিজের চেহারার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলে পাওয়া চিঠির সব হাতের লেখা বেরকভিজের সঙ্গে মিলেনি। এসবের পর সবচেয়ে ভীতিকর কৌতূহল ছিল কে এই খুনি চক্রের নেতা! এই রহস্যটির সঙ্গে স্যাম কার (Sam Carr) নামক ব্যক্তির যোগসূত্র পাওয়া যায়, যে ছিল বেরকভিজের হাতে খুন হওয়া প্রথম কুকুরটির মালিক। বেরকভিজ বলেছিল যে, এই কুকুরটিই পৈশাচিক শক্তি দ্বারা তাকে বশ করেছিল। স্যাম কারকেই ওই খুনি চক্রের নেতা সন্দেহ করা হলো, কারণ বেরকভিজের গ্রেপ্তারের পর থেকেই সে ছিল নিখোঁজ এবং আজও পর্যন্ত তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। সন্দেহ আরও বাড়ল যখন বেরকভিজের গ্রেপ্তারের পর স্যামের দুই ছেলেই অত্যন্ত নৃশংস ও রহস্যজনকভাবে মারা যায়। স্যামের বড় ছেলে জন কারকে (John Carr) তার বাগদত্তার বাড়িতে গুলিবিদ্ধ ও মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কে তার হত্যাকারী তা জানা যায়নি এবং তার বাগদত্তারও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এর কিছুদিনের মধ্যেই স্যামের ছোট ছেলে মাইকেল কারকে (Michael Carr) পাওয়া যায় তার বিধ্বস্ত গাড়িতে মৃত অবস্থায়। জনমানবশূন্য সেই গলিতে গাড়ি দুর্ঘটনার কোনো কারণই পুলিশ খুঁজে পায়নি। ধারণা করা হয় যে, এই দুই ভাই খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাছাড়া খুনি তার চিঠিতে নিজেকেও সন অব স্যাম অর্থাৎ স্যামের পুত্র হিসেবে পরিচয় দিত। এ থেকে স্যাম কারের প্রতি সন্দেহ আরও জোরদার হয়।

এসব ঘটনার আবির্ভাবে আইনজীবী সমাজ বলেন যে, বেরকভিজ একটি বৃহৎ ও জঘন্য খুনি চক্রের সদস্য ও ষড়যন্ত্রের শিকার মাত্র। এসব কাজে জড়িত পিশাচদের খুঁজে পেতে হলে বেরকভিজকে কাজে লাগানো উচিত। তারা পুলিশকে অনুরোধ করেন, বেরকভিজকে আসামি হিসেবে কিছু বাড়তি সুবিধা দিতে। ফলে

বেরকভিজের মানসিক রোগের কথা ভেবে পুলিশ তাকে অতিরিক্ত সুবিধা দিতে রাজি হয়।

পুলিশের কাছ থেকে জানা যায় যে, বেরকভিজকে গ্রেপ্তার করার পর তারা তাকে প্রথমে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ভেবেছিল। এর কারণ হলো, জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তাকে ভয় দেখানোর জন্য তার মাথার দু'পাশে দু'টি বন্দুক চেপে ধরা হলেও সে ভীত হয়েছিল বলে মনে হয়নি, বরং সে হাসছিল। অফিসার জন ফালোটিকো বলেন, 'মাথার দু'পাশে দু'টি বন্দুক ধরার পরও তার মুখে সেই বোকা বোকা হাসিটি লেগেছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে একটি বাচ্চা আর আমরা সবাই তার সঙ্গে খেলা করছি'।

পুলিশের ভাষ্যমতে, বেরকভিজকে গ্রেপ্তার করতে এতটা সময় লাগার অন্যতম কারণ ছিল যে, সে দেখতে খুবই সাধারণ ছিল এবং তার মধ্যে চোখে পড়ার মতো খুনির লক্ষণ দৃশ্যমান ছিল না।

এমনকি সে যে বাসায় ভাড়া থাকত সে বাড়িওয়ালা এবং তার পরিবারের বেরকভিজ সম্পর্কে ধারণা ছিল, 'বেরকভিজ একজন সাধারণ ছেলে, যে মাঝে মাঝে মধ্যরাতে গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বের হতো'।

বেরকভিজের জীবনযাপন এতটাই সাধারণ ছিল যে, একবার দেখে কেউ তাকে মনে রাখত না। তার আশপাশের লোকজনের ধারণা ছিল যে, সে চালচুলোহীন একটি নিঃসঙ্গ যুবক যে সারাদিন ফাস্ট ফুড ও মিষ্টি খাওয়ায় নিমগ্ন থাকত। তার প্রিয় খাবার ছিল হ্যামবার্গার ও চকলেট আইসক্রিম। তার চেহারার এই সাধারণত্বই তাকে প্রতিবার সন্দেহ বা গ্রেপ্তার হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিত।

বেরকভিজ কেন খুন করা শুরু করল তা কেউই নিশ্চিতভাবে জানতে পারেনি। তবে তার নৃশংস কর্মকাণ্ডের কারণ হিসেবে অনেক কিছুই ধারণা করা হয়। যতদূর জানা যায়, প্রথম খুনটি করার পর থেকেই সে খুন করার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং রাতের পর রাত গাড়ি চালিয়ে সে গোটা নিউইয়র্ক শহর চষে বেড়াত শিকার খোঁজার জন্য। তার মধ্যে খুনের স্থানে বার বার ফিরে যাওয়ার প্রবণতাও দেখা যেত। একবার এক প্রেমিক জুটিকে হত্যা করার পর সেখান থেকে পালানোর বদলে সে ওই এলাকায় পাশের গলিতে তার প্রথম হত্যাকাণ্ডের শিকার ডোনা লরিয়ার (Dona Lauria) বাড়িতে যায়। ডোনার মৃত্যুর পর থেকে ছোট্ট সুন্দর এই বাড়িটি কেন যেন খালিই ছিল। ডোনা ছিল বেরকভিজের প্রেমিকা। কোন আক্রোশে সে তার প্রেমিকাকে খুন করে তা শুধু ধারণাই করা হয়।

বেরকভিজের চিঠিগুলো থেকে দেখা যায় অনেকেই তাকে সমকামী বলে সন্দেহ করত এবং সমকামী বলে ডাকার প্রতিশোধ হিসেবে সে তাদের হত্যা করেছিল। সমকামিতা নিয়ে ডোনার সঙ্গে কোনো ঝগড়াকে কেন্দ্র করেই

বেরকভিজ ডোনাকে নির্মমভাবে হত্যা করে বলে সন্দেহ করে পুলিশ। তার ওপর আবার সে ছিল স্কিটসফ্রেনিয়া রোগী। পুলিশ ধারণা করে এসব কারণে শুধু ডোনা নয়, ডোনার বন্ধু বা আত্মীয়কেও বেরকভিজ খুন করতে পারে। পুলিশের ধারণা সত্যি ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন তথ্যে প্রকাশ পায় যে, বেরকভিজের হাতে নির্মমভাবে নিহত ক্যাপ্টেন জোসেফ ছিল ডোনার আত্মীয়। ধারণা করা হয়, ক্যাপ্টেন জোসেফ হয়তো ডোনা ও বেরকভিজের ঝগড়ার কথা জানত ও ডোনার খুনি হিসেবে তাকে সন্দেহও করত, সে কারণে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। বেরকভিজ পুলিশকে জানায় যে, ডোনাকে হত্যা করার পর সে নিজের মধ্যে অসীম শক্তির সঞ্চারণ অনুভব করে। তাই সে একের পর এক খুন করতে উৎসাহ পায়। ডোনার বাড়িতে এসে সে স্মৃতি রোমন্থন করে রাগে অন্ধ হয়ে যেত ও খুন করত। খুন করে আবার ডোনার বাড়িতে বা বাড়ির কাছে এসে নিজের মধ্যে পৈশাচিক শক্তির সঞ্চারণ ও আত্মবিশ্বাস অনুভব করত।

এরপর গভীর রাতে কোনো ফাস্ট ফুডের দোকানে গিয়ে বার্গার ও তার পছন্দের চকলেট আইসক্রিম খেত।

বেরকভিজের সারা জীবনই জেলের ভেতরে কাটে এবং সে এ বাড়তি সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে তার বিখ্যাত হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে। জঘন্য খুনি চক্রকে ধরার জন্য তাকে অবাধ ও নিবিড়ভাবে চিঠি লেখার ও পত্রবন্ধু তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু বেরকভিজকে বশকারী চক্রের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। জেলে থাকা অবস্থায় এই চিঠির সাহায্যে সে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয় ও পত্র পত্রিকায় নিজের লেখা পাঠায়। এভাবে সে একটি বই লিখে ফেলে। শুধু তাই নয়, সে নিজের জীবন অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুমতিও লাভ করে। বই, অন্যান্য লেখালেখি ও চলচ্চিত্রের অনুমতি কাজে লাগিয়ে সে দুই লাখ ডলারের বেশি আয় করে। তার দ্বারা খুন ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আত্মীয়রা তার এই দুই লাখ ডলার লাভের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করে। অনেক দিন এ মামলা চলার পর মামলাটি জিতে স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগী বেরকভিজ তার প্রাপ্ত টাকা জিতে নেয়। তার শিকারদের আত্মীয়ের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। শেষ বয়সে বেরিকভিজের কার্যকলাপ নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে হয়নি। এক সময়ের ত্রাস সৃষ্টিকারী নৃশংস এই খুনি নীরবেই হারিয়ে যায়।

দ্য গ্ল্যামারস লাভারস

বনি পার্কার (Bonnie Parker) ও ক্লাইড ব্যারো (Clyde Barrow) আকর্ষণীয় ও হাসিখুশি জুটি হিসেবে জনপ্রিয় থাকা সত্ত্বেও তাদের এই রূপটি বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ তাদের দুজনের উপরই ঝুঁকিপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর ব্যাংক ডাকাতি সংঘটনকারী হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছিল। সত্যি সত্যিই তাদের মোহময় জীবনের বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। বনি ও ক্লাইড দুজনই ছিল মারাত্মক চোর ও ভয়ংকর খুনি।

সুদর্শন ক্লাইডের জন্ম হয় ১৯০৯ সালের ২৪ মার্চ, টেক্সাস প্রদেশের একটি অভাবী কৃষক পরিবারে। শৈশব থেকেই তার নিষ্ঠুর মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রায়ই নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে তার বাবার খামারের গবাদি পশুর উপর অত্যাচার চালিয়ে মজা করার প্রবণতা দেখা যেত। এছাড়াও প্রায়ই খেলতে গিয়ে খেলার সাথীদের সে গুরতর আহত করে ফেলত। বলা যায় তার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়েই তার বাবা তাকে সিমেন্ট (Cement) শহরে পাঠিয়ে দেয় এই আশা করে যে, কষ্ট করে জীবন যাপন করতে গিয়ে হয়তো তার স্বভাবে কিছুটা পরিবর্তন আসবে।

বনির জন্ম হয় ১৯১১ সালে একটি নিষ্ঠাবান ব্যাপটিস্ট (Baptist, অভিসিঞ্চনকারী যাজক) পরিবারে। দুর্ভাগ্যবশত মাত্র চার বছর বয়সেই সে তার বাবাকে হারায়। অভাবের তাড়নায় ও নতুন জীবনের সন্ধানে তার মা তাকে নিয়ে টেক্সাস প্রদেশের সিমেন্ট শহরে এসে বসবাস শুরু করে। বনি ছিল অত্যন্ত সুন্দরী একটি মেয়ে, তার গভীর নীল চোখ ও কুচকুচে কালো চুল ছিল প্রশংসা করার মতো। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই সে রয় থর্ন্টন (Roy Thornton) নামের একটি দুঃখী ও বিপদগ্রস্ত ছেলেকে বিয়ে করে। তার এই আকস্মিক বিয়ে বেশিদিন টিকেনি। অভাবের তাড়নায় রয় প্রায়ই বিভিন্ন চুরি-ডাকাতি করত এবং নেশা ও জুয়ার পেছনে সব টাকা উড়াত। বিয়ের কিছুদিন পরই তাকে খুনের দায়ে ৯৯ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলে বনির বিয়ে ভেঙে যায়। কয়েক বছর পর ক্লাইডের সাথে বনির পরিচয় হয় এবং তারা একে অপরকে পছন্দ করে ফেলে।

বনি পার্কার ও ক্লাইড ব্যারো

ক্লাইডের মতো সুদর্শন যুবকের সাথে বনির পরিচয় হওয়াতে বনির মা অনেক খুশি হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে ক্লাইড হয়তো তার মেয়েকে তার দুঃখ ভরা জীবন থেকে ফিরে আসতে সাহায্য করবে। তখন বনির বয়স ছিল উনিশ বছর এবং ক্লাইডের বয়স ছিল একুশ বছর।

বনি ও ক্লাইড তাদের সম্পর্কের শুরুর দিকের দিনগুলো খুব একটা সহজ বা ভালো যায়নি। প্রথম যেদিন ক্লাইড বনির বাড়িতে নৈশভোজের দাওয়াতে যায়, সেদিনই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে ৭ টি ছিনতাই ও একটি গাড়ি চুরির অভিযোগ ছিল। এসব অভিযোগের আলোকে তাকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু তাকে পুরোপুরি দুই বছর জেল খাটতে হয়নি কারণ বনি কোনোভাবে কারাগারে একটি বন্দুক পাচার করেছিল। বন্দুকটির সাহয্যে ক্লাইড জেল থেকে পালাতে সক্ষম হয়। পালানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই সে অস্ত্রের মাধ্যমে ভয় দেখিয়ে একটি রেলওয়ে অফিসে ডাকাতি সংঘটন করে। এবারও সে গ্রেপ্তার হওয়া থেকে বাঁচতে পারেনি। তাকে গ্রেপ্তার করে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং তাকে পাঠানো হয় টেক্সাস কেন্দ্রীয় কারাগারে।

টেক্সাস কেন্দ্রীয় কারাগারে জীবন ছিল দুর্বিষহ ও অত্যন্ত কষ্টকর। এই নরক থেকে মুক্তি পাওয়ার অদম্য ইচ্ছা তাকে অস্থির ও দুর্দান্ত করে তুলেছিল; নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ক্লাইড অন্য একজন কয়েদিকে প্ররোচিত করে তার দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল কুড়াল দিয়ে কেটে ফেলে। এরকম দুর্ঘটনা ঘটায় জেল কর্তৃপক্ষ তার চিকিৎসা করায় এবং তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে সোজা তার প্রেমিকা বনির কাছে ফিরে যায়।

বনির মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার শর্তমত সৎ জীবন যাপনের কথা দিয়ে ক্লাইড ম্যাসাস্যুটস (Massachusetts) শহরে একটি সাধারণ চাকরি নেয়। কিন্তু ঘর থেকে এত দূরে একা একা থাকা এবং সাধারণ সৎ জীবন তার সহ্য হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত চাকুরি ছেড়ে সে খুব শীঘ্রই পশ্চিম ডালাসে (West Dallas) চলে আসে। এর তিনদিন পরই বনি তার মায়ের বাড়ি ছেড়ে ডালাসের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ডাকাতি ও নরহত্যার নারকীয় জীবন যাপন করতে। ডালাসে এই জুটির সাথে যোগ দেয় ক্লাইডের একজন পুরনো বন্ধু রে হ্যামিলটন (Ray Hamilton) এবং আরও দুই ব্যক্তি– রিকি (Ricky) ও জোনস (Jones)।

পাঁচজনের এই নিষ্ঠুর সংঘবদ্ধ দলটি কাজ শরু করার পর প্রথম খুনটি করে ১৯৩২ সালে টেক্সাসের হিলসবরোতে (Hillsboro)। তারা জন ডব্লিউ বুচার (John W. Bucher) নামক একজন স্বর্ণকারকে মাত্র চল্লিশ ডলারের মত নগণ্য ক্ষুদ্র অংকের টাকার জন্য নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। ওই সময় বনি একটি গাড়ি চুরির সন্দেহে জেলে ছিল। তিন মাস পরই সে ছাড়া পেয়ে যায় কারণ তখন সন্দেহ প্রমাণিত হওয়ার মতো কোনো অপরাধ বা ব্যবহার সে

করেনি। বনি ছাড়া পাওয়ার কয়েকদিন আগেই ক্লাইড ও তার সহকারীরা মিলে একজন শেরিফ (Sheriff) এবং একজন ডেপুটি শেরিফকে একটি নামকরা নাচমহলের (Dancehall) সামনে নির্দয়ভাবে গুলি করে হত্যা করে।

এই চক্রটির ছিনতাইয়ের মাধ্যমে লুণ্ঠিত টাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় অংকের টাকা ছিল একসাথে সাড়ে তিন হাজার ডলার। এ ঘটনাটি তারা ঘটায় গ্র্যান্ড প্রেইরির (Grand Prairie) একটি ফিলিং স্টেশনে । সেবার বনি ও ক্লাইড কিছুদিন ছুটি উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা গাড়িতে করে মিসৌরি (Missouri), ক্যানসাস (Kansas) এবং মিশিগান (Michigan) শহরগুলো চষে বেড়াল, সেখানকার শীর্ষ হোটেলগুলোতে থেকে ও নামিদামি রেস্টুরেন্টগুলোতে ভুঁড়িভোজ করে ছিনতাই করা টাকাগুলো দুহাতে খরচ করতে লাগল। এভাবে খুব শীঘ্রই তাদের টাকা শেষ হয়ে গেল। প্রতিবারের মতো এবারও তাদের ডাকাতি করা টাকা বেশিদিন টিকলো না এবং আবারও ছিনতাই করার প্রয়োজন হলো। এইসব তুচ্ছ অংকের টাকা ছিনতাই ও ছোটখাটো ডাকাতি করেই তাদের দিন চলত। জঘন্য এই চক্রটির সবচেয়ে ভয়ংকর বৈশিষ্ট্য ছিল যে তারা অবিশ্বাস্যরকম ক্ষুদ্র অংকের টাকার জন্য নির্মমভাবে এবং অবলীলায় খুন করত। বনি খুবই ঠান্ডামাথায় টেক্সাসে একজন কসাই এর পেটে তিনটি গুলি চালিয়ে তাকে হত্যা করে ও তার দোকান লুটপাট করে। পরে তারা উইলিয়াম জোনস (William Jones) নামক একটি ছেলেকে হত্যা করে। ছেলেটি 'ব্যারো গ্যাং' শীর্ষক গানের দলের গিটারিস্ট ছিল এবং তার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। রাতের অন্ধকারে নির্জন গলিতে ছুরির আঘাতে ও গুলি করে তাকে হত্যা করে। এছাড়াও একবার গাড়ি চুরি করতে গিয়ে গাড়ির মালিকের কাছে প্রায় ধরা পড়ে যাওয়ায় তারা ওই ব্যক্তির ছেলেকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তাদের কর্মকাণ্ডে মনে হতো যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তাদের হাতে বন্দুক চলে আসত এবং অবলীলায় গুলি করে হত্যা করাটা যেন তাদের স্বভাবিক আচরণেরই একটি।

১৯৩৩ সালের মার্চে চক্রটি আবার মিসৌরিতে যায়। সেখানে তাদের সাথে যোগ দেয় ক্লাইডের ছোট ভাই বাক (Buck) এবং তার স্ত্রী ব্লানচে (Blanche)। তারা দুজনেই ছিল ভয়ংকর ঘাতক ও পলাতক অপরাধী। এরা দুজন যে ফ্ল্যাটে থাকত সেখান থেকে তারা পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে সূক্ষ্মভাবে পালিয়ে আসে এবং পালানোর পথে দুজন পুলিশ সদস্যকে গুলি করে হত্যা করে। বাক ও তার স্ত্রীর যোগদানের পর দলটি আরও ভয়ংকর ও বেপরোয়া হতে থাকে। দিন দিন তারা নিরাপদ আশ্রয় হারাতে থাকল। বেশিদিন এক জায়গায় থাকা তাদের জন্য কোনভাবেই নিরাপদ ছিল না। তাই তারা এক শহর থেকে আরেক শহরে ঘুরে ঘুরে ইচ্ছামতো ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা একটি বিষয়ে খুব

ভালোভাবেই অবগত ছিল যে, তাদের এই অবাধ বিচরণ খুব বেশিদিনের জন্য নয়। শুধু তাই নয়, বনি তাদের মৃত্যু ও শেষজীবন কেমন হতে পারে চিন্তা করে 'দ্য স্টোরি অব বনি এন্ড ক্লাইড' (The Story of Bonnie and Clyde) শীর্ষক একটি কবিতাও লিখেছিল। তারা দুজনে তাদের পিতা মাতাকে অনেক ভালোবাসত এবং তাদের সবচেয়ে বড় আফসোস ছিল এটাই যে তারা হয়তো মৃত্যুর আগে আর কোনদিন তাদের দেখতে পারবে না। বনির কবিতা ও একটি ডায়েরিতে ছাড়া ছাড়া ভাবে লেখা তাদের জীবনের চিত্র পাওয়া যায় বনির প্রিয় ফোর্ড ভি-৮ সেডান (Ford V-8 Sedan) গাড়ির মধ্যে।

জুন মাসে টেক্সাসের ওয়েলিংটন (Wellington) শহরের কাছে একটি গ্রামে হঠাৎ একদিন তাদের একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরু খাদের মতো একটি জায়গায় পড়ে যায়। ক্লাইড ও জোনস গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু বনি আঁকা পড়ে যায়। হঠাৎই গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। এদিকে ক্লাইড ও জোনস বনিকে গাড়ি থেকে বের করার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল, অপরদিকে গাড়ির আগুনও বেড়ে চলছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে বনির গায়েও আগুন ধরে যায় এবং তার শরীরের অনেকখানি পুড়ে যায়। এ অবস্থায় স্থানীয় একজন কৃষক তাদের সাহায্য করে ও তারা বনিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। স্থানীয় কৃষক ও তার পরিবার দয়ার্দ্র হয়ে তাদের কিছুদিনের জন্য তাদের বাড়িতে আশ্রয় দেয় এবং সেবা যত্ন করে বনিকে কিছুটা সুস্থ করে তোলে। কৃষকটি বার বার ডাক্তার ডাকার কথা বা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে তারা তা এড়িয়ে যায়। কিছুদিন পর তাদের আচরণ ও কথাবার্তায় কৃষকটির সন্দেহ হয় ও সে পুলিশকে ব্যাপারটা জানায়। কিন্তু জোনস তা জেনে ফেলে ও সাথেসাথেই ক্লাইডকে বলে দেয়। বনি তখন অত্যন্ত দুর্বল ও আহত ছিল এবং তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। ভাগ্য তাদের সাথেই ছিল বলতে হবে। কারণ এবারও তারা আশ্চর্যজনকভবে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। তারা মিসোরিতে বাক ও ব্লানচের কাছে যায়, বনি তখন গুরুতর অসুস্থ ছিল। এদিকে পুলিশ পুড়ে যাওয়া গাড়িটি থেকে পাওয়া জিনিস পত্র ও গাড়ির চুরির ঘটনা ও চোরদের সম্পর্কে কিছু তথ্য জোগাড় করে। এর সূত্র ধরে পুলিশ হন্যে হয়ে ক্লাইড ও তার দলকে খুঁজতে থাকে। জুলাইয়ের প্রথম দিকে তারা ঠিক করে যে তারা মিসৌরির কোনো পর্যটন ক্যাম্পে গিয়ে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে ও বিশ্রাম করবে। এতদিনে অনেকেই তাদের কথা জেনে গিয়েছিল। বনি ও ক্লাইডের একে অপরকে জীবন বাজি রেখে বাঁচানোর কাহিনিগুলো লোকমুখে ছড়াতে ছড়াতে প্রেমকাহিনির রূপধারণ করছিল। পুলিশ ও গোয়েন্দারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে জঘন্য এই দলটিকে খুঁজে যাচ্ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ তাদের খোঁজ পেয়ে যায় এবং পর্যটন কেন্দ্রটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। ক্লাইড ও তার সঙ্গীরা প্রায় ধরা

পড়েই যাচ্ছিল এবং পালানোর জন্য মরণপণ চেষ্টা করছিল। পালানোর পথ সৃষ্টির জন্য তারা অনবরত গুলি করে যাচ্ছিল। পুলিশের সাথে গোলাগুলির একপর্যায়ে রিকি মারা যায় এবং বাকের কপাল ঘেঁষে গুলি ছুটে গিয়ে তাকে গুরুতর আহত করে। এমন সময়ে কাচের টুকরার আঘাতে ব্লানচের চোখ ক্ষতবিক্ষত হয় এবং সে অন্ধ হয়ে যায়। তবুও তারা কিছুক্ষণের জন্য পুলিশের চোখে ধুলা দিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। ওই সময় তারা সবাই অসম্ভব ক্ষুধার্ত ছিল। শুধু তাই নয় বাক ও ব্লানচের মুমূর্ষু অবস্থা ও বনির অসুস্থতা ও দুর্বলতা ক্লাইডকে বাধ্য করল ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি থামিয়ে কিছু খাবার কিনতে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ তাদের খুঁজে পায় এবং আবারও শুরু হয় গোলাগুলি। বাকের ঘাড়ে, কোমরে ও পিঠে গুলি লাগায় সে মাটিতে পড়ে যায়। অধিক রক্তক্ষরণ তাকে অত্যন্ত দুর্বল করে ফেলেছিল। তার স্ত্রী ব্লানচের কাঁধে গুলি লাগলে সে পড়ে যায়। পুলিশ কিছুক্ষণ এলোপাথারি গুলি চালিয়ে যখন থামে ততক্ষণে ক্লাইড বনিকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। ক্লাইডের বন্ধু পায়ে গুলি লাগা অবস্থায় পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে। পুলিশ এগিয়ে গিয়ে দেখে যে আহত বাক যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে তার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের ওই অবস্থায় গ্রেপ্তার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায়ই ছয়দিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যুবরণ করে। অন্ধ ব্লানচেকে দশ বছরের কারাদণ্ড ও রে কে পনেরো বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বনি ও ক্লাইডকে গ্রেপ্তার করার জন্য খোঁজাখুঁজি ও তদন্ত অব্যাহত রাখা হয়। এরই মধ্যে বনি ও ক্লাইডের একমাত্র সঙ্গী জোনস ধরা পড়ে। কিন্তু তবুও বনি ও ক্লাইডের কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

পরবর্তী তিনমাস ধরে বনি ও ক্লাইড সুকৌশলে পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্য তাদের শুভ ছিল না। পুলিশের ফাঁদে তাদের পা দিতেই হলো। ১৯৩৪ সালের ২ মে'র একটি সুন্দর সকালে বনি ও ক্লাইডের প্রিয় ফোর্ড ভি-৮ সেডান গাড়িতে আতর্কিত হামলা চালায় ছয়জন দক্ষ পুলিশ অফিসার। আকস্মিক গুলি করা শুরু হলে তারা কিছুই করতে পারে না এবং কিছু বুঝে উঠার আগেই ৮৭ টি বুলেটের আঘাতে ঝাঝরা করে দেওয়া হয় তাদের গাড়ি। তৎক্ষণাতই তারা মৃত্যুবরণ করে এবং সেখানেই ইতি হয় বনি ও ক্লাইডের প্রেমকাহিনি। গুলি করা শেষে গাড়ির মধ্যেই তাদের ক্ষতবিক্ষত বিকৃত ও রক্তাক্ত লাশ পাওয়া যায়। নিষ্ঠুর এই প্রেমিক জুটির জীবনের শেষ দিনে ক্লাইডের বয়স ছিল ২৫ বছর এবং বনির বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলেও সত্যি হলো এই যে বনি ও ক্লাইডের মতো নৃশংস খুনির রোমাঞ্চকর ও মোহময় প্রেমকাহিনি রূপকথার মতো সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। সবার আলোচনার বিষয় ছিল তারা, ও তাদের কার্যকলাপ যেন

তারা কোনো জনপ্রিয় তারকা। তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ডালাসে সম্পন্ন হয়েছিল। অনেকেই তাদের কফিন থেকে ফুল তুলে নিয়ে যাচ্ছিল উপঢৌকন বা স্মৃতি হিসেবে। সময়ের স্রোতেও মানুষের মন থেকে তাদের স্মৃতি মুছে যাচ্ছিল না। বনি ও ক্লাইড প্রায় সবাইকে তাদের নিষ্ঠুর ও রূঢ় কার্যকলাপ এবং একের পর এক খুনের ভয়ে অস্থির করে রেখেছিল। কিন্তু অনেকেই আবার তাদের আদর্শ প্রেমিক জুটি হিসেবে মনে রেখেছে। নিষ্ঠুরতা ও ঘৃণার মাঝেও এই প্রেমকাহিনি তাদেরকে অমর করে রেখেছে।

দ্য ফল রিভার অ্যাক্স মার্ডারস

Lizzie Borden took an axe
And gave her mother forty whacks.
When she saw what she had done,
She gave her father forty one.

অমর গুজব এই ছড়াটি অনুসারে লিজি বোর্ডেন (Lizzie Borden) একটি ভারী কুড়াল তুলে নেয় এবং তার মায়ের শরীরে দ্রুত একের পর এক আঘাত করে। সে অনবরত আঘাত করে থামতে বাধ্য হয়, যখন তার হঠাৎ মনে হয়, কেউ দেখে ফেলেছে। তার এই অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রোশ থেকে তার বৃদ্ধ বাবাও নিস্তার পেল না। তার মায়ের রক্তে রঞ্জিত কুড়ালটি দিয়ে একাধিক আঘাত করে লিজি তার বাবাকেও হত্যা করে। যদিও সত্যি সত্যিই ৮১ টি আঘাত সে করেনি। তবে মোট আঘাতের সংখ্যা ৪০ টির কমও ছিল না। ভয়ংকর ও জঘন্য এই হত্যাকাণ্ড করার পরও আমেরিকান বিচারপতিদের মনে হয়েছিল এই ৩২ বছর বয়স্কা চিরকুমারীর পক্ষে এমন নির্মমভাবে অ্যান্ড্রু জে বোর্ডেন (Andrew J. Borden) এবং তার স্ত্রী অ্যাবি ডারফি গ্রে (Abby Durfee Gray) কে হত্যা করা সম্ভব না। এ মামলা প্রায় দশ দিন ধরে চলে এবং শেষপর্যন্ত লিজিকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করে বিচারপতির রায় সবার সমর্থন ও প্রচুর প্রশংসা কুড়ায়। এ মামলার রায় নিয়ে অনেকেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোর্টের বিরুদ্ধে কারো কিছুই বলার ছিল না।

বোর্ডেন পরিবার ম্যাসাসুটসের (Massachusetts) সুতা উৎপাদনকারী শহর ফল রিভারের (Fall River) বাসিন্দা ছিল। ৯২ সেকেন্ড সড়কের একটি সুন্দর ছিমছাম বাড়িতে বসবাসকারী বোর্ডেন পরিবার কোনো কালেই সুখী পরিবার বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। প্রত্যেকটি সদস্যেরই ছিল আলাদা বিষাদময় একটি জগৎ, যেখানে একে অপরের প্রতি অনুভূতির কোনো স্থান ছিল না। লিজির বাবা অ্যান্ড্রু ছিল একজন কঠোর নীতিবান চরিত্রের ব্যক্তি। যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অর্থ উপার্জন ও তা সঞ্চয় করে রাখা। সে প্রায় পাঁচ-ছয় লাখ ডলার

জমিয়েছিল বিচক্ষণ ব্যবসায়িক লেনদেন করে। তার ব্যবসায়ী জীবন সে শুরু করে ঠিকাদারি ব্যবসা দিয়ে। এর পর সে কয়েক বছর জমির দালালি করে প্রচুর টাকা আয় করে এবং শেষে ব্যাংকার হিসেবে চাকরি করে। তার প্রথম স্ত্রী সারাহ মোরসে বোর্ডেন (Sarah Morse Borden) ১৮৬২ সালে মারা যায়। লিজি ও তার বড় বোন এমা (Emma) তারই সন্তান ছিল। লিজির বয়স যখন মাত্র দুই বছর, তখনই সারাহ্‌র মৃত্যু হয়। লিজির নাম প্রথমে লিজি অ্যান্ড্রু (Lizzie Andrew) রাখা হয়েছিল, কারণ অ্যান্ড্রু পুত্রসন্তান কামনা করেছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন আগে সে লিজির নাম পরিবর্তন করে রাখে লিজি বোর্ডেন। সারাহ্‌র মৃত্যুর বছর দুয়েক পর মেয়েদের কথা ভেবেই অ্যান্ড্রু দ্বিতীয় বিয়ে করে। অ্যাবি, অ্যান্ড্রুর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিল খুবই সহজ সরল, গোলগাল দেখতে, সাধারণ একজন মহিলা। তার বয়স ছিল তখন ৩৭ বছর। তার জীবনের একমাত্র দুঃখ ছিল যে, সে কখনো মা হতে পারবে না। হয়তো এ কারণেই অ্যাবি এমা ও লিজিকে অপত্য স্নেহ করত, নিজের মেয়ের মতোই তাদের যত্ন নিত। এমা তাকে অ্যাবি নামে ডাকত, কিন্তু লিজি ছোটবেলা থেকেই তাকে সহ্য করতে পারত না। লিজি তাকে মিসেস বোর্ডেন বলে ডাকত এবং একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তার সাথে কথা বলত না, এমনকি লিজি অ্যাবির সাথে একই টেবিলে খেতেও বসতে চাইত না। লিজির এসব আচরণেও অ্যাবির ভালোবাসা লিজির প্রতি একটুও কমেনি বরং সে সবসময় লিজিকে খুশি রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করত।

অ্যান্ড্রুর যদিও ধন-সম্পদের কোনও অভাব ছিল না, কিন্তু তারা শহরের অনেক কারখানা-শ্রমিকের চেয়েও মানবেতর জীবনযাপন করত। তাদের বাড়ির জীর্ণদশার একটি কারণ ছিল অ্যান্ড্রুর কৃপণতা। কিন্তু মূল কারণটি ছিল তার মেয়েদের সংসার ও পরিবারের প্রতি অবহেলা। বাড়িটির বসবাস যোগ্যতার একমাত্র কারণই ছিল অ্যাবি। স্ত্রীর চেয়ে গৃহিণীর গুণাবলিই তার মধ্যে ছিল বেশি। সাদা কাঠের অপরিষ্কার-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বাড়িটির কাঠামো ছিল সুন্দর। সামনে ও পিছনে ছিল দু'টি হাতলওয়ালা সিঁড়ি। ঘোরানো সিঁড়িগুলোই ছিল বাড়িটির আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সখ্য না থাকায় তারা পারতপক্ষে একে অপরের সামনে পড়তে চাইত না। মেয়েরা সামনের সিঁড়ি ব্যবহার করত এবং অ্যান্ড্রু ও অ্যাবি সাধারণত ভেতর দিয়ে পেছনের সিঁড়ি ব্যবহার করত। দোতলার বেশিরভাগ ঘরই বন্ধ থাকত। পুরো বাড়িতে সিঁড়িগুলোর অবস্থাই সবচেয়ে ভালো ছিল, কেননা এগুলোই সবচেয়ে কম ব্যবহার করা হতো।

সৎ মা অ্যাবির প্রতি লিজির আক্রোশ ও তার অসহায় দুস্থ জীবনযাপনের প্রতি বিরক্তি থেকে তার ভেতরে দিনে দিনে তিল তিল করে রাগ জমা হচ্ছিল। লিজি তার বাবাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত। কিন্তু যখন লিজির বাবা অ্যাবির বোন, মিসেস হোয়াইটহেড (Mrs. Whitehead) কে যে বাড়ি থেকে

উচ্ছেদ করা হয়েছিল সেই বাড়িটি পুনরায় কিনে নিতে বড় অংকের টাকা দিয়ে সাহায্য করে, তখন লিজির রাগের সীমা রইল না। এ রকম দানের কৃতিত্ত্ব অ্যান্ড্রু সব সময় অ্যাবিকেই দিত। যার কারণে লিজি ধরে নিল যে, অ্যাবি শুধু তার বাবার সম্পত্তির লোভেই এই পরিবারে এতদিন রয়েছে। রাগে অন্ধ হয়ে সে অ্যাবির শোয়ার ঘরে ঢুকে ভাংচুর করে এবং বলে বেড়ায় যে, বাড়িতে চোর এসে অ্যাবির ঘরে হামলা করেছে। অ্যান্ড্রু খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি আসে এবং পুলিশকে ব্যাপারটা জানায়। পুলিশ তদন্ত করে খুব শীঘ্রই বের করে যে, এ ঘটনার জন্য আর কেউ নয়, স্বয়ং লিজিই দায়ী। তদন্তের আলোকে পরিষ্কার হলো যে, লিজিই অ্যাবির ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ভাংচুর করে। লিজি প্রায়ই ছোটখাটো ঘটনায় রাগ করে জিনিসপত্র ভাংচুর করত, পরিবারের লোকজন যাকে বলত 'লিজির আজব ব্যবহার'। লিজিদের পারিবারিক ডাক্তার ঘটনাটিকে মৃগীরোগের প্রভাব বলে ব্যাখ্যা করলে তারা লিজির এমন ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই নিত।

লিজি ছিল অত্যন্ত সাধারণ, নম্র-ভদ্র ও অন্তর্মুখী একটি মেয়ে। তার বন্ধুবান্ধব বলতে তেমন কেউ ছিল না। লিজি সামাজিক কাজকর্মে ছিল নিবেদিত প্রাণ এবং এ কারণে সবাই তাকে খুব পছন্দ করত। সে 'উইমেনস ক্রিশ্চান টেম্পারেন্স ইউনিয়নের (Women's Christian Temperance Union, এটি একটি ক্রিশ্চান মহিলা সংস্থা– যারা নৈতিকভাবে মদ্যপান ও কাম-লালসাকে বর্জন করে) একজন সদস্য ও স্থানীয় 'ক্রিশ্চান এন্ডেভ্যর সোসাইটির' (Christian Endeavour Society, নিবেদিত প্রাণ ক্রিশ্চানদের সমিতি) কোষাধ্যক্ষ। এছাড়াও প্রতি রবিবার স্থানীয় কনগ্রেগ্যাশনাল (Congregational) গির্জায় সে চীনা ভাষার একটি ক্লাস নিত। দিনের বেশিরভাগ সময়ই সে একা একা থাকত এবং একাকিত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকত– যেমন মাছ ধরা অথবা তার ঘরের জানালার ধারে বসে বসে চিন্তা করত। তার চিন্তা করার বিষয়েরও কোনো অভাব ছিল না।

১৮৮২ সালের গ্রীষ্মে ফল রিভারে অত্যন্ত গরম পড়ে এবং এক পর্যায়ে তা হিটওয়েভের রূপ ধারণ করে। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে সবারই দৈনিক জীবনে কিছুটা পরিবর্তন আসে এবং অভাবের তাড়নায় এ সময় চুরি– ডাকাতি বেড়ে যায়। মে মাসে লিজিদের বাড়িতে দুই দুই বার অতর্কিত হামলা হয়। আততায়ীরা লিজিদের গেস্টহাউসের দরজা ভেঙে ভেতরে আসে এবং কিছু জিনিসপত্র ভাংচুর করে। দ্বিতীয়বার একইভাবে আবারও গেস্ট হাউসেই হামলা হয় এবং লিজির কিছু কবুতর চুরি হয়। কবুতর চুরি করার উদ্দেশ্যে এ হামলাগুলো হচ্ছে ধারণা করে অ্যান্ড্রু সব কবুতরই মেরে ফেলে। এ ঘটনা লিজিকে গভীরভাবে আহত করে। আগস্টের দিকে ফল রিভারের গরম যখন অসহনীয় হয়ে পড়ল, লিজির বোন এমা বাড়ি থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে ফেয়ারহেভেন (Fairheaven) গ্রামে তার

বান্ধবীর বাড়িতে কিছুদিনের জন্য থাকতে গেল। লিজি বাড়িতে থেকে গেল ক্রিশ্চান এন্ডেভ্যর সোসাইটির একটি জরুরি মিটিংয়ের জন্য। এমা যাওয়ার পর লিজি আরও একা হয়ে গেল। লিজির বাবার ব্যবসা এবং অর্থ উপার্জনের পথে অসহনীয় আবহাওয়ার কোনো প্রভাবই পড়েনি, এমনকি যখন আগস্টের ৪ তারিখকে ওই বছরের সবচেয়ে বেশি গরম দিন বলে ঘোষণা করা হলো, তখনো বোর্ডেন পরিবারের কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়নি। সেদিন অ্যান্ড্রু তাদের একমাত্র গৃহপরিচারিকা ব্রিজেটকে (Bridget) খাসির মাংসের স্ট্যু রান্না করতে বলেন। ব্রিজেট সেদিন একই মাংস বিভিন্নভাবে রান্না করে এবং লিজি দুপুরে ও রাতে তা পরিবেশন করে। কিন্তু বিকাল থেকেই তারা সবাই অসুস্থ হতে শুরু করে। রাতে তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। আশ্চর্যজনকভাবে লিজি বাদে সবারই ফুড পয়জনিং হয়েছিল, অথচ সে সবার সাথে একই খাবার খেয়েছিল।

অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও অ্যান্ড্রুকে পরদিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হয়, কারণ তার একটি জরুরি ব্যবসায়িক কাজ ছিল। সে সকালে উঠে নাস্তার পর বারান্দায় বসে জন মোরসে (John Morse), তার প্রথম স্ত্রীর ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। জনের সাথে একটি নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছিল সে। জন ঐ শহরেই একটি হোটেলে উঠেছিল। অ্যান্ড্রুকে বারান্দায় চা দিয়ে অ্যাবি ঘরগুলো ঝাড়ামোছা করতে গেল। ব্রিজেটের অবস্থা তখনো বেশ খারাপ ছিল এবং বার বার বমি করছিল। সে জানালা পরিষ্কার করছিল। লিজি অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক দেরিতে তার ঘর থেকে বের হয়, কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করার পর তাকে রান্নাঘরে কাপড় ইস্ত্রি করতে দেখা যায়। সকাল সাড়ে ৯ টার পর পরই যখন অ্যাবি তাদের বাড়ির দোতলার অতিরিক্ত একটি ঘর পরিষ্কার করছিল সে কিছুর আওয়াজ পায়। গেস্ট হাউসের হামলার ঘটনা স্মরণ করে অ্যাবি একটু ভয়ও পায়। কাজ বন্ধ করে এগিয়ে গিয়ে কাউকেই দেখতে না পেয়ে দুই-একবার লিজি ও ব্রিজেটের নাম ধরে ডাক দেয়। সে তখনো জানত না, লিজি ঘুম থেকে উঠেছে কিনা। সেই ঘরটির কার্পেট ঝাড়ার সময় যখন অ্যাবি হাঁটু গেড়ে বসে সে তার মাথার পিছনে একটি প্রবল ধাক্কা অনুভব করে। ধাক্কা সামলাতে না পেরে সে ঘুরে পড়ে যায়। ধাক্কাটি আর কিছুই না, ভয়ানক একটি ভারী কুড়াল দিয়ে করা আঘাত, যা তাকে সাথে সাথেই নিহত করে। রক্তে ঘরের কার্পেট ভিজে যায়। অ্যাবির মাথায় আরও ১৮টি আঘাত ও সারা শরীরে অসংখ্য নির্মম আঘাতে সারা ঘর, মেঝে, দেওয়াল রক্তে ভরে যায়। এ সময় লিজির বাবা কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন।

১১টার আগেই অ্যান্ড্রু বাড়িতে ফেরত আসে এবং দেখে যে, দরজায় লক করা এবং ভেতর থেকেও আটকানো। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করার পর ব্রিজেট এসে দরজা খুলে দেয়। দরজা ভেতর থেকে দু'টি ছিটকিনি দিয়ে আটকানো দেখে

সে অবাক হয়ে যায়। অ্যান্ড্রু ঘরে ঢুকে ব্রিজেটকে দরজা খুলতে দেরি করায় বকাঝকা করছিল, এমন সময় ব্রিজেট পেছন থেকে এটি হাসির আওয়াজ পায়। ঘুরে দেখে যে, লিজি হাসিমুখে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। সে তার বাবাকে একটু বিশ্রাম নিতে বলল। ৭০ বছর বয়স্ক অ্যান্ড্রু হিটওয়েভের অসহ্য গরমে বাইরে থেকে এসে অনেক ক্লান্ত ছিল। সে সোফায় হেলান দিয়ে বসার পর লিজি তার আশপাশে ঘুরঘুর করতে থাকল। এরপর বলল যে, অ্যাবি বাড়িতে নেই, সে নাকি কোনো এক বন্ধুর অসুস্থ হওয়ার খবর শুনে তড়িঘড়ি করে বের হয়ে গেছে এবং কখন ফিরবে তা বলেনি। এরপর সে তার বাবাকে কিছু নরম কুশন এনে দিয়ে আরাম করে বসতে বলে। অ্যান্ড্রু ক্লান্তির কারণে অনেকটা ঝিমাতে শুরু করে। লিজি ব্রিজেটের সাথে শহরের কাপড়ের দোকানের মূল্য হ্রাস নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে। ব্রিজেট অনেক অসুস্থ বোধ করছিল দেখে লিজি তাকে তার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলে। ব্রিজেট তার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলে লিজি দোতলায় তার ঘরের উদ্দেশে রওনা হয়। খুব বেশি হলে ১০ কি ১৫ মিনিট পরই ব্রিজেট দৌড়ে নিচে নামতে বাধ্য হয় লিজির চিৎকার শুনে। তখন ঘড়িতে সোয়া এগারোটা বাজছিল। লিজি চিৎকার করে বলছে, "ব্রিজেট, তাড়াতাড়ি নিচে এসো, বাবা মারা গেছে, কেউ এসে বাবাকে মেরে ফেলেছে।" ব্রিজেট তাড়াতাড়ি এসে অ্যান্ড্রুকে দেখতে লিভিং রুমে ঢুকতে গেলে লিজি তাকে বাঁধা দেয় এবং তাকে বাইরে পাঠায় তাদের পারিবারিক ডাক্তার বোয়েনকে (Bowen) ডেকে আনতে । কিন্তু সে রোগী দেখতে বাইরে যাওয়ায় ব্রিজেট ফিরে আসে। তখন লিজি তাকে আবারও বাইরে পাঠায় তার বান্ধবী এলিস রাসেলকে (Alice Russell) ডেকে আনতে। এটুকু সময়ের মধ্যেই ব্রিজেটের দৌড়াদৌড়ি প্রতিবেশীদের নজর কাড়ে ও অনেকে অ্যান্ড্রুর মৃত্যু সংবাদ পায়। লিজিদের পাশের বাড়ির মিসেস অ্যাডেলেইড চার্চিল (Mrs. Adelaide Churclill) অ্যাবির সাথে দেখা করতে তাদের বাসায় এসে লিজিকে অত্যন্ত বিমর্ষ ও উদ্ভ্রান্ত দেখে জিজ্ঞেস করে যে, কী হয়েছে? লিজি তাকে বলে, "কে যেন এসে বাবাকে খুন করে গেছে"।

অ্যান্ড্রু ও তার স্ত্রীর মৃত্যুর ধরন একদম একই রকম। দু'জনকেই ভারী কিছু দিয়ে অনবরত আঘাত করা হয়েছিল। তবে তার মাথা প্রায় সম্পূর্ণই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রায় ১০-১২টি আঘাত করে। তাকে পেছন থেকে আঘাত করা হয়েছিল। তার চেয়ারটি দেওয়ালের সাথে রাখা হয়েছিল। যার ফলে পেছন থেকে আঘাত করাটা খুবই কঠিন ছিল। পুলিশ ধারণা করল যে, এটি পরিকল্পিত ঘটনা– যার ফলে এমন কষ্টসাধ্য অবস্থায় খুনটি প্রায় নিঃশব্দে সংঘটিত হয়েছে। ঘরের দেওয়াল, কার্পেট ও আসবাবপত্র রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডা. ব্রাউন এসে মৃতদেহ নিরীক্ষা করেন। তিনি জানান যে, প্রথমে মূলত ঘাড়, মাথার তালু ও পরে চোখে মুখে ও কানে ভয়ংকরভাবে আঘাত করা হয়। তিনি এ

ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, প্রথম আঘাতেই অ্যান্ড্রু মৃত্যুবরণ করে। তিনি তার বন্ধুর এ হাল আর সহ্য করতে পারছিলেন না। রক্তাক্ত ও বিকৃত মৃতদেহটি একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন তিনি।

মিসেস রাসেল ও মিসেস চার্চিল লিজিকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন এবং তার সেবাযত্ন করতে লাগলেন। তবে তাকে দেখে মনে হলো না যে, তার কোনো রকম সেবাযত্ন, চোখে মুখে পানি দেওয়া বা হাত-পা ঘষে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে। সে মোটেও কাঁদছিল না এবং তার মৃগীও হচ্ছিল না। তাছাড়া সে বার বার তাদের বলছিল যে, সে অসুস্থ বোধ করছে না। এমনকি পুলিশ এসে জবানবন্দি নেওয়ার আগে যখন তার বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ ছিল, সে তাও নেয়নি।

প্রথমেই সন্দেহ গিয়ে পড়ল জন মোরসের ওপর। কেননা, সে বাড়িতে আসার পর থেকেই অদ্ভুত আচরণ করছিল। বাড়ির প্রতিবেশী ও অন্যান্য মানুষের ভিড় দেখেও সে বিচলিত হয়নি এবং খুব স্বাভাবিকভাবে ধীর গতিতে ভিতরে প্রবেশ করে। শুধু তাই নয়, প্রথমেই ঘরে না ঢুকে সে বাগানে হাঁটাহাঁটি শুরু করে। এক্ষেত্রে তার ওপর সন্দেহ পড়াটা অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। কিন্তু তার খুব স্পষ্ট অ্যালিবাই (Alibi অপরাধ সংঘটনকালে অন্যত্র থাকার অজুহাতে রেহাই পাবার দাবি) ছিল বলে সে শেষপর্যন্ত কিছুটা রক্ষা পায়। সে ঐ সময় ঘরে ছিল না এবং তাকে ঐ সময় বাড়ির আশপাশেও কেউ দেখেনি। পরবর্তী সন্দেহ গিয়ে পড়ে লিজির ওপর। তার আচরণ সবার কাছেই প্রচণ্ড অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। তার কথাবার্তা বেশ অসংলগ্ন ছিল, যা সন্দেহের উদ্রেক করে। প্রথমে তাকে ব্রিজেট জিজ্ঞাসা করলে সে বলে যে, "আমি বাগানে হাঁটছিলাম, তখন একটি গোঙানোর আওয়াজ শুনে ভেতরে আসি।" আবার মিসেস চার্চিলকে বলে যে, সে স্টোর রুমে গিয়েছিল লোহার রড আনতে। পুলিশকে বলেছিল যে, সে স্টোর রুমের চিলেকোঠায় লোহার রড খুঁজছিল এবং খুঁজে না পেয়ে সেখানে বসেই বিশ্রাম নিচ্ছিল ও ফল খাচ্ছিল। তার কথা শুনে পুলিশ চিলেকোঠায় যায়, কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় জিনিস থাকতো দূরের কথা, কোনো ভাঙা জিনিসও ছিল না। সম্পূর্ণ খালি ঘরটিতে ধুলার পুরু আস্তরণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, এমনকি কোনো পায়ের ছাপ পর্যন্তও না। এরপর মিসেস চার্চিল দৌড়ে এসে পুলিশকে আরও একটি তথ্য জানায়, যা এই তদন্তকে আরও কঠিন করে তুলে। লিজিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তার মা অর্থাৎ অ্যাবি কোথায়– তখন তার উত্তর ছিল, "আমি অবশ্যই জানি না সে কোথায়। সকালে হঠাৎ চিঠি পায় যে, তার কোন নিকটাত্মীয় অসুস্থ এবং তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছে তা না জানিয়েই বেরিয়ে যায়। সে বেঁচে আছে কিনা সেটাও আমি জানি না, তাই কখন ফিরবে

বলতে পারছি না।" এ কথা শুনে তারা কিছুক্ষণ অ্যাবিকে খোঁজাখুঁজি করে। পরে অ্যান্ড্রুর লাশ ও পুলিশ নিয়ে ব্যস্ততায় তারা প্রায় অ্যাবির কথা ভুলেই যায়। পুলিশ স্টোর রুমের চিলেকোঠা দেখতে গেলে সে ব্রিজেটকে নিয়ে এমনিই বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। অর্ধেক যাওয়ার পর তার চোখ যায় দোতলার অতিথি ঘরের খোলা দরজার দিকে এবং সেখানে রক্তের ছাপ দেখে সে দৌড়ে যায়। রক্তে ভেসে যাওয়া ঘরটিতে অ্যাবির রক্তাক্ত ও বিকৃত লাশ দেখে সে সাথে সাথে দৌড়ে এসে পুলিশকে ব্যাপারটি জানায়।

এরপর কিছু প্রশ্ন সামনে আসে, যা তদন্তের জটিলতা বাড়িয়ে দেয়। লিজি কেন তার বাবা আসার সময় দরজা খুলতে বেরিয়ে আসেনি বা তার আসার সাথে সাথে এগিয়ে আসেনি? কেনইবা সে প্রুসিক এসিড (Prussic) ও লিথাল পয়জন (Lethal Poison) কিনছিল? এবং কেন তার আগের রাতে সে মিসেস রাসেলের বাসায় গিয়ে বাড়ির সবার ফুড পয়জনিংয়ের কথা বলছিল? সে মিসেস রাসেলকে এও বলে যে, সে তার বাবার সাথে অন্য মানুষের ব্যবসায়িক ঝগড়া নিয়ে চিন্তিত এবং তার ভয় হচ্ছে যে, তার বাবার শত্রুরা আবার প্রতিশোধ না নেয়। পুলিশ এসব প্রশ্নকে মাথায় রেখে ঘটনা সাজায় এবং লিজির জবানবন্দির সাথে এর সামঞ্জস্য খুঁজতে থাকে। তারা অন্তত এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, খুনগুলো পরিবারের কেউই করেছে। প্রতিবেশীরা জানায় যে, সাড়ে ৯টার দিকে তারা একটি ছেলেকে বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখলেও তাকে ভেতরে যেতে দেখেনি। পুলিশ প্রথমে ধারণা করল যে, হয়তো বাইরে থেকে কোনো খুনি এসে খুন করছে। কিন্তু এটাও সম্ভব না যে, খুনি প্রায় ৯০ মিনিট বাড়িতে লুকিয়ে থেকে লিজি ও ব্রিজেটের নজর বাঁচিয়ে খুন করে পালিয়ে যাবে। ব্রিজেটের ওপর সন্দেহ থাকলেও প্রমাণিত হয় যে, সে খুন করেনি। লিজিদের প্রতিবেশী এক বৃদ্ধা তাকে সর্বক্ষণই উপরের জানালাগুলো পরিষ্কার করতে দেখছে এবং এও বলে যে, ফুড পয়জনিংয়ের দরুন তাকে কয়েক দফা বমি করতেও দেখা গেছে। তাছাড়া তার নিজের মালিককে খুন করার কোনো কারণও পাওয়া যায়নি। সেই তুলনায় লিজির খুন করার কারণেরও কোন অভাব ছিল না। পারিবারিক কলহ, টাকা ও সম্পত্তি নিয়ে মনোমালিন্য এবং সৎমায়ের প্রতি তার সীমাহীন ঘৃণার কথা কোনো গোপন বিষয় ছিল না, এলাকার সবাই এসব জানত। পুলিশ স্টোর রুমে একটি সদ্য পরিষ্কার করা ভারী কুড়াল পায়, তখনো সেটি পানিতে ভেজা ছিল। যদিও কোনো প্রমাণ ছিল না যে, এটিই খুনের মূল হাতিয়ার। তবুও তারা পরীক্ষা করার জন্য কুড়ালটি নিয়ে যায়। লিজিকে খুনি হিসেবে গ্রেফতার করার মতো শক্ত প্রমাণ না পেয়ে পুলিশ তাকে এলাকা ছেড়ে কোথাও না যাওয়ার নির্দেশ দেয়। যখন তাকে নির্দেশের কারণ হিসেবে বলা হয় যে, তাকেও আসামি হিসেবে সন্দেহ করা

হচ্ছে। তখন সে প্রচণ্ড রেগে যায় এবং পুলিশ কর্মকর্তার সাথে বেশ রূঢ়ভাবে কথা বলে। এরপর পুলিশ কিছুদিন তদন্ত চালিয়ে লিজির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জোগাড় করে। কিন্তু আইনত অনুসন্ধান শেষ হওয়ার আগে তা ব্যবহার করে লিজিকে গ্রেফতার করে না। কেননা একবার লিজিকে গ্রেফতার করা হলেই সে আইনের আশ্রয় নিতে পারবে, তখন যথার্থ প্রমাণ না পাওয়া গেলে লিজিকে দোষী প্রমাণিত করা মুশকিল হয়ে যাবে। তাই পুলিশ কিছুদিন অপেক্ষা করল।

অ্যান্ড্রু ও অ্যাবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রায় চার হাজার লোক অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের প্রায় গুঁড়িয়ে যাওয়া খুলি দেহ থেকে আলাদা করে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মস্তকহীন দেহ দুঁটি সম্মান ও সবার সহানুভূতিসহ সমাধিত করা হয়। এর দু'দিন পরই আইনত অনুসন্ধান শুরু হয়। লিজিকে অত্যন্ত গোপনে পাবলিক প্রসিকিউটর জিজ্ঞাসাবাদ করে। অত্যন্ত কঠিন ও প্যাঁচালো জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও লিজি কঠোর ও রূঢ়ভাবে তার ওপর চাপানো সকল দোষের প্রতিবাদ করতে থাকে। তখন সে বলা শুরু করে যে, তার বাবা ফেরার সময়, ১১টার কিছু আগে সে স্টোর রুমের চিলেকোঠায় নয়, রান্নাঘরে ছিল। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কী কারণে সে ঘটনা বদলাচ্ছে এবং তখন কেন মিথ্যা বলছিল, সে উত্তর দেয়, "আমি তখন ভেবেছিলাম যে, আমি চিলিকোঠায় ছিলাম। কিন্তু এখন আমার মনে পড়ছে, আমি রান্নাঘরেই ছিলাম।" আদালত নিশ্চিত ছিল যে, লিজিই আসল অপরাধী। একই কথা প্রকাশ পাচ্ছিল খবরের কাগজগুলোতে, যারা নিত্যই নানারকম কুৎসা রটনা করছিল ও আবেগপ্রবণ সত্য-মিথ্যা ইচ্ছেমতো লিখেই যাচ্ছিল। কিন্তু এসবের ফলে ঘটনার মোড় কিছুটা বদলে গেল। বিচারপতি অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে চিঠি দিলেন এই বলে যে, লিজি বোর্ডেনের অপরাধ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন। তার ভয়টি শেষপর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হলো। পত্র-পত্রিকায় লিজিবিরোধী বিভিন্ন মতামত ও তার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণ অমূলক এই অপরাধ নিয়ে অনবরত লেখালেখির ফলে সাধারণ জনগণের মন গলে যায়। তাদের মনে হতে থাকে একজন শান্ত-শিষ্ট ও নিষ্ঠাবান ধর্মভীরু মেয়ের পক্ষে কীভাবে এমন ভয়াবহ ও রক্তলোলুপ খুন করা সম্ভব হতে পারে? ফলে রিভার ও অন্যান্য স্থান থেকে লিজির জন্য অসংখ্য ফুল ও সৌভাগ্যবাণী আসা শুরু করল। হঠাৎই জনগণের চোখে দেশ ও দেশের আইন ব্যবস্থা খলনায়কে পরিণত হলো লিজিকে বিচারবদ্ধ করার কারণে।

খুনি : লিজি বোর্ডেন

এসব ছাড়াও লিজির নিজের পক্ষে আরও অনেক কিছু ছিল। তার যেহেতু টাকার অভাব ছিল না, তাই সে ম্যাসাসুটসের সেরা আইনজীবীকে তার মামলায় লড়তে নিযুক্ত করল। তার আইনজীবী জর্জ রবিনসন (Georg Robinson) পূর্বে ম্যাসাসুটসে গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সরকার পক্ষের তিনজন আইনজীবীর মধ্যে একজনের রবিনসনের গভর্নর থাকাকালীন সময়ে কিছু পাওনা ছিল, যা সে এই মামলায় রবিনসনকে জিততে সাহায্য করে পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। আদালতে লিজির এসিড ও বিষ কেনার কথা এই কেসের সাথে সম্পর্কহীন ও অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা এটিও বলে যে, পুলিশের রিপোর্ট লেখা লিজির জবানবন্দির অধিকাংশই আদালতে প্রমাণ হিসেবে মেনে নেওয়ার অযোগ্য এবং তারা এই অনুসন্ধানকে অযোগ্য বলে ঘোষণা দেন।

এখানেই আদালতের নাটক শেষ নয়। লিজির বান্ধবী মিসেস রাসেল ও ব্রিজেট আদালতে তাদের সুর পাল্টে লিজির পক্ষে কথা বলে, এমনকি লিজি ও তার সৎ মায়ের দ্বন্দ্ব কলহের কথা একদমই চেপে যায়। মিসেস রাসেল আদালতে সাক্ষ্য দেয় যে, লিজির পুড়িয়ে ফেলা কাপড়গুলোতে কোনো রক্তের দাগ ছিল না বরং লিজি তার পিতা-মাতার বিয়োগে নিজেকে সামলাতে না পেরে এ কাজ করেছিল। লিজিও আদালতে তার কাজ খুব ভালোমতোই সম্পন্ন করে। শুনানির মাঝপথে হঠাৎই সে মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ভান করে এবং এমনভাবে আর্তনাদ করে, যেন তাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আদালতে সে আসত শান্ত, নম্র ভঙ্গি এবং অত্যন্ত পরিষ্কার কাপড় পরে। যার ফলে রবিনসনের জন্য লিজির পক্ষে কিছু বলা বা প্রশ্ন করা খুবই সহজ ছিল। সে জুরিকে প্রশ্ন করে, লিজি বোর্ডেনকে অপরাধী বলতে হলে আপনাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি দানবতুল্য কোনো ব্যক্তি। ভদ্রমহোদয়গণ, লিজি বোর্ডেনকে দেখে কি আপনাদের তা একবারও মনে হয়?" তার প্রশ্নের উত্তরে জুরি সায় দেয় যে, লিজি মোটেও হিংস্র শয়তানতূল্য নয়। দশ দিন পর লিজির শুনানি শেষ হয় এবং লিজি খুব শীঘ্রই তার জয় উপলক্ষে অত্যন্ত ব্যয়বহুল পার্টির আয়োজন করে। পত্র-পত্রিকায় লিজির মামলার বিবরণ ও পার্টিতে বন্ধু-বান্ধবের সাথে তার হাস্যমুখরিত চেহারা ছাপা হয় কিছুদিন। ধীরে ধীরে সবাই ভুলে যায় এই কাহিনি। চাপা পড়ে যায় আরও একটি অপরাধ। লিজি তার নিহত বাবার সম্পত্তি লাভ করে অত্যন্ত ধনী হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সে ফল রিভারেই থেকে যায়। সে নতুন বড় একটি বাড়ি কিনে তার বোন এমার সাথে ফল রিভারে সম্ভ্রান্ত এলাকায় বসবাস শুরু করে। কিন্তু দুই বোনের মধ্যে প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে মনোমালিন্য ও কলহ দেখা দিলে এমা তাদের পুরানো বাড়িতে চলে যায়। তাদের গৃহপরিচারিকা ব্রিজেট, যাকে অনেকেই সন্দেহ করে যে, সে লিজিকে

সকল প্রমাণ লুকাতে সাহায্য করেছিল– সেও লিজির সাথে থাকেনি। চমকপ্রদ অংকের টাকা নিয়ে সে প্রথমে আয়ারল্যান্ডে ফিরে যায়। পরবর্তীতে সে আমেরিকা চলে যায় এবং ১৯৪৭ সালে ৮২ বছর বয়সে মনট্যানা (Montuna) শহরে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। একা থাকতে থাকতে লিজি প্রায় সন্ন্যাস গ্রহণের মতোই নিঃসঙ্গ ভালোবাসাহীন জীবনযাপন শুরু করে। ১৯২৭ সালে ৬৭ বছর বয়সে তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত তার সম্পর্কে নানান গুজব চলতেই থাকে। তার চেয়ে ৯ বছরের বড় বোন এমা এর কিছুদিন পরেই মারা যায়। তাদের দু'জনকে পারিবারিক কবরস্থানে তাদের জন্মদাত্রী মা-বাবা, সৎমা এবং শিশুকালে মৃত বোন এলিসের পাশে সমাধিত করা হয়।

লিজির আত্মা কি তার কবরে ১৮৮২ সালের আগস্টের সেই অসম্ভব গরম সকালে তারই নির্মম হিংস্রতা ও রক্ত লোলুপতার শিকারের পাশে শান্তিতে থাকতে পারবে? নিজের বাবাকে খুন করেও সকল অপরাধের ঊর্ধ্বে থাকা লিজির ধর্মভীরুতা কি তাকে পরকালে কোনো সাহায্য করবে? এর উত্তর কারও জানা নেই। তেমনি কেউই সেদিন নিশ্চিতভাবে লিজিকে সন্দেহ করেনি। এই মামলাটি ছিল সেকালের অন্যতম ষড়যন্ত্রমূলক এবং অমীমাংসিত রহস্য। লিজি বোর্ডনের কাহিনি নিয়ে পাঁচটি মঞ্চ নাটক, একটি ব্যালে পারফরম্যান্স ও অনেক বই লেখালেখি হয়। গুজব ও ভিন্ন ভিন্ন মতামত আজও বাতাসে গুঞ্জরিত হয় যে, লিজি তার অনেক কাপড় পুড়িয়ে ফেলেছিল এবং সে ছিল অত্যন্ত ধূর্ত ও সুপরিকল্পক খুনি। বার বার তার কাছ থেকে নিশ্চিত হয়েছে যে, তার দেহে ও কাপড়ে কোনো রক্তের ছাপ নেই। লিজির বন্ধুসমাজের অস্তিত্ব তখনো ছিল তার পৈশাচিকতাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে, যারা আজও তাকে নির্দোষ নিষ্পাপ বলে।

আর একটি মতবাদের মাধ্যমে বলা যায় যে, হয়তো তার দিক থেকে সে আসলেই নির্দোষ ছিল। আমেরিকান লেখিকা ভিক্টোরিয়া লিঙ্কন (Victoria Lincon) তার একটি আলোচিত বই 'এ প্রাইভেট ডিসগ্রেসে' (A Private Disgrace) এ ব্যাপারে তার মতামত প্রকাশ করেন। তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ে যুক্তিপ্রমাণ দেখান যে, লিজি যখন খুনগুলো করে তখন সে টেমপোরাল এপিলেপ্সিতে (Temporal Epilepsy মৃগীরোগ সংক্রান্ত) আক্রান্ত ছিল যা তার পরিবারের কাছে লিজির আজব ব্যবহার বলে পরিচিত ছিল। তিনি বলেন যে, লিজি বছরে চার-পাঁচবার এমন তীব্র এপিলেপ্সির আঘাতে আক্রান্ত হতো। তিনি এও বলেন যে, প্রতিটি আঘাতের সময় কিছু নির্দিষ্ট পর্যায়কালের জন্য অটোমেটিক অ্যাকশন বা স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া উদ্ভব হয়। এর কারণে কোনো রোগী সে নির্দিষ্ট পর্যায়কালকে সম্পূর্ণ ভুলে যায় এবং কোনো রোগী তা আবছা আবছাভাবে স্মরণ করতে সক্ষম হয়। লেখিকা লিজির খুন করার কারণ হিসেবে মৃগীরোগীর এই অটোমেটিক অ্যাকশনকে দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, একই কারণে লিজি

বিভ্রান্তিমূলক জবানবন্দি দেয় এবং কিছু মনে না রাখার কারণেই আদালতে এতটা শান্ত ও ঠান্ডা মাথায় মামলা লড়তে পেরেছিল। মিস লিঙ্কন তার বইতে সেই নির্দিষ্ট দিনে লিজির এপিলেপ্সি অ্যাটাকের কারণও ব্যাখ্যা করেন। ৪ আগস্ট ৯২ সেকেন্ড স্টিটের ঐ বাড়িতে একটি চিঠি সত্যি এসেছিল। কিন্তু সেই চিঠি লিজির ভাষ্যমতে অ্যাবির কোনো অসুস্থ বন্ধু বা আত্মীয়ের কাছ থেকে আসেনি। চিঠিটি ছিল অ্যান্ড্রুর সকল সম্পত্তি অ্যাবির নামে হস্তান্তর করা প্রসঙ্গে। সম্পত্তি নিয়ে প্রথম ধাক্কাটি লিজিকে বর্বর ও ধ্বংসাত্মক করে তুলছিল, যার ফলে সে ভাংচুর করে। একই কারণে দ্বিতীয় ও প্রবল ধাক্কাটিই কি তাকে হিংস্র খুনিতে পরিণত করে?

দ্য মুরস মার্ডারারস

সেটি ছিল জনপ্রিয় ব্যান্ড 'দ্য বিটলস' (The Beatles) এর পাগল করা সঙ্গীতে আন্দোলিত ষাটের দশক, যাকে অনেকেই বলে থাকেন সুইঙ্গিং সিক্সটিস (Swinging Sixties)। বিটলসের হাওয়ায় তরুণ প্রজন্মে দেখা যেত বুনো উগ্র ফ্যাশন এবং বিটলসের প্রতি অভূতপূর্ব ও গভীর ভক্তি। একদিকে তরুণ-প্রজন্মের বুনো আলোচঞ্চল জীবনযাপন ও অপরদিকে কর্মব্যস্ত মানুষের স্বল্প অবসরের ক্লান্তি মাখা জীবন নিয়েই ছিল ষাটের দশকের ব্রিটেন। এসময়েই ব্রিটেনকে রক্তে রঞ্জিত করা ভয়ংকর লোমহর্ষক কিছু খুনের ঘটনা সবার শান্তিপূর্ণ জীবনে ছন্দপতন ঘটায়। বলা হয় যে এগুলো ছিল সেই শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর ও নৃশংস খুন যা সংঘটিত হয় অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায়। এ ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে গভীর ভীতি সঞ্চার করে যার ক্ষত হয়তো পরবর্তী বিশ বছরেও ঠিকমতো সারেনি। পদে পদে তাদের মনে করিয়ে দিয়েছে সেইসব ভয়ংকর ঘটনার কথা। এসব নৃশংস খুনের মূল হোতা, নিষ্ঠুর বিবেকহীন মিরা হিন্ডলি (Myra Hindley) এবং আইয়্যান ব্র্যাডি (Ian Brady) কে সে দেশের মানুষ কখনো ভুলতে পারবে না। তাদের কর্মকাণ্ড যেন আজও দেশটিকে শিহরিত করে তোলে।

২৭ বছর বয়সী মজুদ রক্ষক (Stock Clerk) এবং ২২ বছর বয়সী টাইপিস্টের নিষ্ঠুর ও বর্বর আঘাতে সংঘটিত হয়েছিল সে সময়ের সবচেয়ে লোমহর্ষক খুনের অধিকাংশগুলি। এর আগে এমন ঘটনা কোনো ব্রিটিশ জুরির সামনে বর্ণিত হয়নি, এর আগে কখনো তাদের এমনভাবে ভয়ার্ত ও শিহরিত করেনি কোনো খুনের বর্ণনা যা এরা দুজনে মিলে সংঘটিত করেছে। ষাটের দশকের ব্রিটিশরা তাদের রক্ত-পিপাসা দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হতবাক হয়ে তারা শুনছিল যে কীভাবে খুনিরা ছোট ছোট ফুলের মতো শিশুকে প্রলুব্ধ করে অপহরণ করেছিল, নিষ্ঠুরভাবে তাদের ধর্ষণ করে এবং তাদের খুন করে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ছোট্ট মৃতদেহগুলোকে পতিত, বর্জিত পেনাইন জলাভূমিতে (Penine moors) মাটিচাপা দিয়ে রেখেছিল।

এই জুটির ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড চলছিল যখন তাদের উপর সর্বোচ্চ শাস্তির আদেশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের দোষী প্রমাণ করা সম্ভব হয় যখন ততদিনে এ শাস্তির কথা সকলে ভুলেই গিয়েছিল। তাদেরকে প্রথমে ১০ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে পরবর্তীতে জনগণের চাপে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় সে কথায় পরে আসছি।

বেশ কয়েক বছর পর লর্ড লংফোর্ড (Lond Longford) নামক একজন সংস্কার সাধক মিরা হিন্ডলির মুক্তির বিষয়ে আলোচনা তোলে। সে দাবি করে যে পিঙ্গল চোখের এই নিষ্ঠুর, ধৃষ্ট স্বর্ণকেশী নারী তার প্রেমিকের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে কিছু অপরাধ সাধন করে থাকলেও তার মধ্যে নতুন জীবন শুরু করার মতো পরিবর্তন এসেছে। সে দৃঢ়ভাবে বলে যে মিরা হিন্ডলি এখন আর মানুষের জন্য বিপদজনক খুনি নয়, সে সাধারণ মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করার মতো মানসিক পরিস্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছে। মিরা হলোওয়ে কারাগারে (Holloway Prison) দশ বছরের নিঃসঙ্গ ও শান্তিপূর্ণ জীবনে যথেষ্ট ধার্মিক হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা-সাহিত্যের (Humanities) উপর একটি ডিগ্রিও নিয়েছিল। লর্ড লংফোর্ড হিন্ডলির মতো নিষ্ঠুর মানসিকতার মানুষের মুক্তির পক্ষে কথা বলছিল কারণ সে বিশ্বাস করত যে শুধু শাস্তিই মানুষকে শোধরাতে পারে না, মুক্তিও দরকার। তার প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালে হিন্ডলি প্রায় দশ বছর পর মুক্তির স্বাদ পায়। তার কারাজীবনের দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর হোম সেক্রেটারির অনুমোদিত একটি লাইসেন্স দেওয়া হয়। তৃতীয়বারের প্রচেষ্টায় এই লাইসেন্সটি বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব হয়। একজন কারারক্ষকের কড়া পাহারায় তাকে কারাগারের বাইরে পা রাখার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাকে ভোরবেলায় লন্ডন পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এ ঘটনা সারা শহরে ছড়িয়ে যায় ও জনগণের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় শুরু হয়ে যায়। লন্ডনের মানুষের পক্ষে মিরা ও তার প্রেমিক আইয়্যানের নিষ্ঠুর লোমহর্ষক খুনগুলো ভুলে যাওয়া অথবা তাদের ক্ষমা করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না । দশ বছর আগের ঘটনা মনে পড়ায় জনগণ প্রতিবাদী কণ্ঠে গর্জে ওঠে এবং তারা এই খুনিদের যথাযোগ্য শাস্তির জন্য আন্দোলন শুরু করে।

দশ বছর আগে ১৯৬৫ সালে মিরা ও আইয়্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডেভিড স্মিথ (David Smith) নামক একজন ব্যক্তি, যে ছিল মিরার ভগ্নীপতি, শেষ পর্যন্ত এই নীতিভ্রষ্ট বিকৃত জুটির আসল রূপ জানতে পেরে পুলিশকে তা জানিয়ে দেয়। ১৯৬৫ সালের ৭ অক্টেবর সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ডেভিড পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে। সে মিরার বাড়িতে আসছিল অত্যন্ত খুশিমনে। আগের রাতে তার স্ত্রীর সন্তান হওয়ার সুসংবাদ জানিয়ে মিরাকে চমকে দিতে কোনো খবর না দিয়েই সে চলে এসেছিল, ভেবেছিল মিরা ও আইয়্যানকে সাথে করেই নিয়ে

যাবে। কিন্তু তা আর হলো না। ম্যানচেস্টারের হ্যাটার্সলি কাউন্সিল এস্টেটের ১৬ নং ওয়ার্ডেল ব্রুক অ্যাভিনিউতে (16 Wardle Brook Avenue Hattersley Council Estate Manchs) অবস্থিত মিরার বাড়িতে ঘটে যাওয়া ঘটনা তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব ছিল। সে দেখে আইয়্যান ও মিরা কোন মানবদেহকে টুকরা টুকুরা করে কেটে একটি বাক্সে ভরছে। মিরা ও আইয়্যানের পৈশাচিকতা দেখে হতভম্ব হতবিহ্বল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডেভিড একটি টেলিফোন বুথে গিয়ে নিকটবর্তী স্ট্যালিব্রিজ (Stalybridge) পুলিশ স্টেশনে ফোন করে।

দুই নিষ্ঠুর খুনি মিরা ও আইয়্যান

কাঁপা কাঁপা স্বরে কোনও মতে তার দেখা ঘটনা বর্ণনা করে সে। মুহূর্তের মধ্যেই পুলিশের গাড়ি আসে এবং একজন তরুণ অফিসার ডেভিডকে টেলিফোন বুথটির পাশে ফুটপাথে ভয়ে কুঁকড়ানো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। সে এতটাই ভীত ছিল যে প্রায় ছুটে গিয়েই সে অফিসারের গাড়ির ভিতরে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। ডেভিডের মুখে তার ভয়ে ত্রাসে বিহ্বল হয়ে যাওয়ার কারণ শোনার পর তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়। চারিদিকে পুলিশ পাঠানো হয় মিরা ও আইয়্যানকে খুঁজে বের করতে। শত শত পুলিশ ও গোয়েন্দা শহরের সবগুলো পরিত্যক্ত জলাভূমিতে খোড়াখুড়ি করে লাশের খোঁজ শুরু করে। সেখানে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় ১০ বছর বয়স্ক মেয়ে লেসলি অ্যান ডাউনি (Lesley Ann Downey)

এবং জন কিলব্রাইড (John Kilbride) নামক ১২ বছর বয়স্ক একটি ছেলের লাশ। মা বাবার আদরের জন হারিয়ে গিয়েছিল ১৯৬৩ সালের ২৩ নভেম্বর এবং ছোট্ট লেসলি তার পরের বছর বক্সিং দিবসে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪) হারিয়ে গিয়েছিল।

মিরা ও আইয়্যানকে গ্রেপ্তার করার জন্য অনেক সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করা হয় কারণ তারা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় যে তাদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশ আসছে তাহলে তারা পালিয়ে যাবে। তাদের বাড়ি থেকে পরিত্যক্ত জলাভূমিগুলো বেশি দূরে ছিল না এবং সেখানে পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকলে তাদের ধরা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেজন্য একজন দক্ষ পুলিশ সুপারেন্টেন্ডেন্ট একটি সাদা কোট পরে রুটির ঝুড়ি নিয়ে রুটি বিক্রেতার ছদ্মবেশে ওয়ার্ডল ব্রুক অ্যাভিনিউয়ের সেই অভিশপ্ত, হাজারো পাপের নীরব সাক্ষী বাড়িটির দরজায় কড়া নাড়েন। বাড়িটি ছিল মিরার দাদির, যা তিনি তাকে উইল করে দিয়ে যান। দরজায় আওয়াজ পেয়ে মিরা এগিয়ে আসে দরজা খুলতে। দরজা খোলার পর পুলিশ অফিসার দেখতে পান যে আইয়্যান বসার ঘরের ডিভানে হেলান দিয়ে বসে তার কর্মচারীদের উদ্দেশে চিঠি লিখছে। তাদের গ্রেপ্তারের পর চিঠিটি পড়ে অফিসার জানতে পারেন যে, আইয়্যান তার কর্মচারীদের লিখেছিল যে অসুস্থ থাকার কারণে সে দুদিন অফিসে আসবে না এবং পূর্বের মতো তারা যেন সব কাজ সামলে নেয়। বোঝা যায় যে এভাবে কর্মচারীদের মিথ্যা কথা বলে সে এর আগেও দিনভর কবর খুঁড়েছে যা তার সেদিনের পরিকল্পনা ছিল। অফিসারটি রুটি সাধতে সাধতে তাদের ঘরে ঢুকে পড়লে আইয়্যান ও মিরা হাহা করে তেড়ে আসে ও রূঢ়ভাবে তাকে বিদায় করে দেয়। তাদের বসার ঘরের টেবিলের উপর সে কিছু কাচের বোতল দেখতে পায় যেগুলো তার কাছে রক্তভর্তি বলে মনে হয়। অফিসারটি বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই প্রায় পঞ্চাশ জন পুলিশ বাড়িটিতে আক্রমণ করে তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করে এবং আলাদা কারাগারে বন্দী করে রাখে।

এরপর পুলিশ তদন্তে মনোনিবেশ করে ও পরিত্যক্ত জলাভূমি থেকে দুটি বাচ্চার লাশ খুঁজে বের করে। ১২ বছর বয়সী ছেলে জন এর লাশ পাওয়া যায় জলাভূমির মাঝের দিকে। কাছেই একটি রাস্তা ছিল যা এই জলাভূমিটিকে সমান দুইভাগে ভাগ করে। রাস্তাটি থেকে কয়েক গজ দূরে লেসলির মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়। এরপর তাদের বাড়িতে আরও একটি লাশ পাওয়া যায়, যা সম্ভবত সেদিন কবর দেওয়ার কথা ছিল। বাড়িটিতে রক্তভর্তি প্রচুর এসিডের বোতল পাওয়া যায় যা দেখে প্রত্যেকটি তদন্তকারী অফিসারেরই শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। জানা যায় তারা গাঢ় এসিডে বাচ্চাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে ফেলত। এছাড়াও মিরার শোবার ঘরের আলামরিতে কয়েকটি ক্যাসেট ও ছবি

পাওয়া যায়। ছবিগুলো দেখে যে কেউ ভয়ে আতঙ্কে মুখ ঢেকে ফেলবে কেননা সেগুলো ছিল ছোট ছোট শিশুদের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহের ছবি। শুধু তাই নয় দুটি কবরের উপর পা রেখে গর্বিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মিরার একটি ছবিও পাওয়া যায়। এই ছবি ও ক্যাসেটগুলোই মিরা এবং আইয়্যানের বিচারের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।

এরপর প্রায় ৬ মাস পর চেস্টার অ্যাসাইজেসে (Chester Assizes) তাদের শুনানির দিন এল। বিচারকগণ, সেখানে উপস্থিত সকল মানুষ তাদের কার্যকলাপ শুনে ঘৃণা ও আতঙ্কে শিহরিত হয়েছিল। তাদের পৈশাচিক অত্যাচারের বর্ণনা পুরো দেশকে কাঁপিয়ে তোলে। মিরা ও আইয়্যানের শখ করে তুলে রাখা শিকারদের অত্যাচারিত ছবি তাদেরকে দোষী প্রমাণিত করে। সবচেয়ে ভয়ংকর জিনিস ছিল সেই ক্যাসেটগুলো। সেগুলো প্রত্যেকটি শিশুর জীবনের শেষ মুহূর্তের মরণপণ চিৎকার ও আর্তি রেকর্ড করা ছিল। তদন্তকারী অফিসাররা জানান যে সবগুলো ক্যাসেট শুনতে তাদের প্রায় ১৮ দিন লেগেছে। আদালতে শুধু লেসলি অ্যান ডাউনির শেষ আর্তনাদের রেকর্ড শোনানো হয়। এটিই হয়তো ব্রিটিশ কোর্টের সামনে প্রকাশিত সবচেয়ে ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর প্রমাণ। যখন প্রসেকিউটর (Prosecutor) অ্যাটর্নি জেনারেল স্যার এলউইন জোনস (Sir Eluyn Jones) ছোট্ট লেসলি অ্যানের ক্যাসেটটি চালু করলেন উপস্থিত সকলেই কষ্টে, আতঙ্কে মাথা নিচু করে ছিলেন। ছোট্ট নিষ্পাপ শিশুটির মৃত্যুর আগ মুহূর্তে যন্ত্রণার কান্না ও বাঁচার জন্য শেষ আকুতি শুনে কেউই চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। বেশিরভাগ মানুষই শুনানির শেষ পর্যন্ত হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। এমনকি শুনানি শেষ হওয়ার পরও তারা এই ঘটনা মনে করে বার বার আতঙ্কিত ও চমকে উঠছিল।

যখন আইয়্যানকে তার বক্তব্য বলতে দেওয়া হয় সে খুব স্বাভাবিকভাবে বলে যে, "আমি লজ্জিত।" মিরার মধ্যে তার পাপের সঙ্গী আইয়্যানের মতো রূঢ়তা ছিল না কিন্তু সে লেসলি অ্যানের রেকর্ডটি শোনার আগ পর্যন্ত যথেষ্ট শক্ত ছিল। যখনই তার সকল অপরাধ প্রমাণিত হয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তখন সে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, "আমি নিষ্ঠুর ছিলাম। আমি তখন অনেক নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিলাম।"

১৯৬৬ সালের ৬ মে শুক্রবার খুব সম্ভবত দুপর ২:৪০ মিনিটের দিকে শতাব্দীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও অমানুষিক বর্বর খুনের শুনানি শেষ হয়। প্রায় দুই দশক এই শুনানিকে শতাব্দীর সেরা শুনানিও (The Trial of the Century) বলা হয়ে থাকে। আইয়্যানকে এসব ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত নিষ্ঠুর খুনের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সেসময় মিরা কাঠগড়ায় জীবনে প্রথমবারের মতো একদম

একা, নিঃসঙ্গ অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। বিচারপতির রায় যখন তার কানে পৌঁছে এবং সে জানতে পারে যে তাকে ১০ বছর কারাভোগের পর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, চিৎকার দিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। যদিও লর্ড লংফোর্ড তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রমাণ করে নতুন জীবনের স্বাদ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু জনতার প্রতিবাদে ও তার অপরাধের সেই ভয়ংকর সাক্ষ্য প্রমাণগুলোর পুনরায় প্রকাশের পর তার পূর্বের শাস্তিই বহাল থাকে ও শেষ পর্যন্ত তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

দ্য ভয়েজ অব টেরর

১৩ জুলাই, ১৮৯৬-এর ঝড়ের রাতে 'হার্বার্ট ফুলার' (Herbert Fuller) নামক জাহাজের একজন যাত্রী লেস্টার মংকস (Lester Monks) তার কেবিনের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। তার হাতে গুলিভরা রিভলভার এবং সে ক্যাপ্টেনের কেবিনের দিকে এগিয়ে যায়। সতর্কভাবে পা ফেলে সে ক্যাপ্টেনের কেবিনে প্রবেশ করে। আর্তচিৎকারের মতো একটি আওয়াজ এই ঝড়ের রাতে বাতাসের গুঞ্জন ভেদ করে তার ঘুম ভাঙিয়েছে। প্রথমে ধারণা করল, আওয়াজটি হয়তো পাল টানার দড়িগুলোর কাছ থেকে আসছে। তবে ভালোমতো ঘুম ভাঙার পর সে বুঝতে পারল, আওয়াজটি শুধুই আওয়াজ নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। একজন মহিলা প্রাণপণে চিৎকার করছে। চিৎকার শুনে মংকস রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে দেখল, ক্যাপ্টেনের ঘরের হালকা খাটিয়াটি পড়ে আছে কাত হয়ে। তার পাশের সুইমিংপুলটি রক্তে লাল, ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ তাতে ভাসছে। যেন রক্তের সাগরে মৃত্যুবরণ করেছে ক্যাপ্টেন চার্লস ন্যাশ (Captain Charles Nash)। পুলটির পাশেই নিষ্প্রাণ অবস্থায় পড়ে আছে তার স্ত্রী লরা ন্যাশ (Laura Nash)। দেখে মনে হচ্ছিল, তাদের ভয়ংকরভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। লরার খুলি প্রায় গুঁড়িয়ে গেছে এবং তার চোয়াল অত্যন্ত ভয়ংকরভাবে ভাঙা।

মংকস জাহাজের কম্প্যানিয়নওয়ে দিয়ে দৌড়ে গেল প্রথম সহকারী (First mate) ক্যাপ্টেন থমাস ব্রামের (Thomas Bram) খোঁজে। সে ডেক সহকারীকে (Second mate) ডেকে ঘটনাটি জানানোর কথা বললে থমাস সঙ্গে সঙ্গে না করে। দ্বিতীয় সহকারী অগাস্ট ব্লমবার্গের (August Blomberg) সঙ্গে থমাসের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না, সে কর্মচারীদের তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে বলে মংকসকে জানায় থমাস। মংকস তবুও অগাস্টকে জানাতে চাইলে সে লাফিয়ে পড়ে তার রাস্তা আটকে দাঁড়ায় এবং একপর্যায়ে তার পা জড়িয়ে ধরে নিরাপত্তার জন্য কাঁদতে থাকে। এ ঘটনায় মংকস হতবাক হয়ে যায় এবং কী করবে বুঝতে পারে না। তার হঠাৎ মনে হয়, অগাস্টই হয়তো খুনি, রাতে তাকে না ঘাটানোই ভালো। সে থমাসকে বলে, ভোরে সবাই ঘুম থেকে

ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যেন এ ব্যাপারে সবার সঙ্গে আলাপ করা হয়। থমাস মংকসকে তার কেবিন পর্যন্ত দিয়ে আসে।

ভোরবেলা তারা জাহাজের আরেক কর্মকর্তা জনাথন স্পেন্সারকে (Jonathon Spencer) নিয়ে অগাস্টের কেবিনে যায়। তারা কেবিনের দরজা হাট করে খোলা অবস্থায় পেয়ে অবাক হয়। কেবিনের ভেতরে যেতে না যেতেই একটি ভয়ংকর দৃশ্য দেখে তারা আঁতকে ওঠে। অগাস্টের শরীর রক্তাক্ত, তার নিস্প্রাণ দেহ তার খাটে এবং মেঝেতে পড়ে আছে তার দুটি আঙুল। কে যেন ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছে অগাস্টকে। তার মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গভীর ক্ষত। ক্যাপ্টেন ও দ্বিতীয় সহকারীর অবর্তমানে থমাস জাহাজের নির্দেশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করল।

এরপর আশ্চর্যজনকভাবেই সে তাদের ডেকের ওপর অবস্থিত রক্তে ভিজে আঠালো হয়ে থাকা নতুন কুড়ালটির কাছে নিয়ে গেল। শুধু তা-ই নয়, সে গলা থেকে একটি অদ্ভুত আওয়াজ বের করে সেই রক্তাক্ত কুড়ালটি উঠিয়ে জাহাজের ওপর নিক্ষেপ করল।

এ ঘটনা উপস্থিত সবাইকে অবাক করে দিল। থমাসের আচরণ কারো কাছেই স্বাভাবিক বলে মনে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী ও যাত্রীদের একটি ছোট সভা ডাকা হলো। থমাস প্রস্তাব দিল, তিনটি মৃতদেহই সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হোক। প্রায় সবাই কথাটি শুনে মর্মাহত হয়েছিল ও হকচকিয়ে থমাসের দিকে তাকিয়ে ছিল। এ সময় কেউ এ ধরনের কথা বলতে পারে তা থমাসকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করত না। সবাই তার কথা উপেক্ষা করল এবং সঠিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করার কথা বলতে লাগল। থমাস সেসব কথা কানে না তুলে কথা বলেই যেতে লাগল। সে দাবি করল, ক্যাপ্টেন ও তার স্ত্রীকে অগাস্টই খুন করেছে এবং খুনের সময় ধস্তাধস্তিতে লাগা আঘাতের কারণে রক্তপাত হয়ে নিজেও মৃত্যুবরণ করেছে। এরপর সে জাহাজটি দক্ষিণ আমেরিকার ফ্রেঞ্চ গুয়ানাতে (French Guana) নেওয়ার প্রস্তাব দিলে যাত্রীরা প্রায় ক্ষেপে ওঠে তার ওপর। সারা জাহাজে আতঙ্কের হাওয়া বইতে শুরু করে। জাহাজটি ৩ জুলাই বোস্টন (Boston) থেকে কাঠভর্তি কার্গো (Cargo) এবং বেশকিছু যাত্রী নিয়ে আর্জেন্টিনার উদ্দেশে যাত্রা করে। এ ঘটনার পর গন্তব্যে পৌঁছতে তাদের ছয় দিন লাগে। এ ছয় দিন জাহাজের সবার ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল, এমনকি কেউ রাতে বিছানা ছেড়ে বাইরে বের হতো না।

থমাস সবাইকে বলে বেড়াতে লাগল যে, কর্মচারীদের একজন, চার্লি ব্রাউন (Charly Brown) খুবই সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক আচরণ করছে। চার্লির আচরণের পরিবর্তন দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল। সে খুনি হতেও পারে ভেবে নিরাপত্তার জন্য তাকে একটি কেবিনে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হলো। চার্লিকে

আটক করার পর সে যেন আরও চিন্তামুক্ত হলো, তাকে বরং আগের চেয়ে ভালো মনে হতে লাগল। আর্জেন্টিনা পৌঁছার আগের রাতে তাকে খাবার দিতে এলে সে জাহাজের অন্য কর্মকর্তা জনাথনের সঙ্গে দেখা করতে চায় এবং অনুরোধ করে থমাস যেন তা না জানে। তার অনুরোধ রক্ষা করে জনাথন তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সে তখন জানায় যে, সেই রাতে থমাসের কথা অনুযায়ী সে তার বিছানায় ছিল না ঠিকই, কিন্তু সে জাহাজের হালের কাছে দাঁড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ করছিল। থমাস তাকে বাথরুমে যাওয়ার কথা বলে এই দায়িত্ব দিয়ে যায়। দ্বিতীয় সহকারীকে না ডেকে কেন তাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় তা সে প্রথমে বুঝতে পারেনি, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে তার নিজের চোখে একটি ভয়ংকর ঘটনা দেখে। চার্টরুমের ছোট্ট জানালাটি দিয়ে সুইমিংপুলের পাশের ছোট্ট বাতিটির সাহায্যে সবই দেখা যাচ্ছিল। তার চোখে প্রথমে চকচকে কিছু ধরা পড়ে, একটু পরেই সে বুঝতে পারে যে, চকচকে বস্তুটি জাহাজের কাজে ব্যবহৃত নতুন কুড়ালটি। এত ভারী কুড়ালটি কে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখার জন্য সে জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে আঁতকে ওঠে। কুড়াল হাতে আর কেউই নয়, স্বয়ং জাহাজের প্রথম সহকারী থমাস হেঁটে যাচ্ছিল। একটু নজর ঘোরাতেই সে দেখতে পায় থামের আড়ালে জাহাজের ক্যাপ্টেনের শরীরের অর্ধেক। দেখার আগ পর্যন্ত সে বিশ্বাস করত না যে, থমাস কুড়াল নিয়ে ক্যাপ্টেনকে খুন করতে যাচ্ছে। হঠাৎই থমাস এগিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেনের গায়ে কোপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি ভয়ার্ত গলায় আর্তচিৎকার শোনা যায়। লরা, ক্যাপ্টেনের স্ত্রী। থামের আড়ালে প্রথমে তাকে না দেখলেও আওয়াজ চিনতে ভুল হয় না চার্লির। থমাস ক্যাপ্টেনকে আরও একটি কোপ দিয়ে নিষ্প্রাণ দেহটি ধাক্কা দিয়ে পুলে ফেলে দেয়। স্বামীকে বাঁচানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লরাও আহত হয়। থমাস এবার এগিয়ে গিয়ে লরার মাথায় আঘাত করে। এমন সময় ডেকের ওপর পাশে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসা দ্বিতীয় সহকারী অগাস্টকে দেখে কুড়ালটি নিয়ে তাকে ধাওয়া করে থমাস। এটুকু বলে চার্লি থেমে যায়। সে কাঁপতে থাকে এবং বলে যে, থমাসের ভয়ে সে এত দিন মুখ খোলেনি। সে জনাথনকে অনুরোধ করে পরের দিন সকালে তারা যখন হ্যালিফ্যাক্স (Halifax) বন্দরে পৌঁছাবে তখন যেন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জনাথন চার্লিকে আশ্বস্ত করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং পরের ঘটনা চিন্তা করতে থাকে। অগাস্টকে ধাওয়া করার পর নিশ্চয়ই সে নিজের ঘরে গিয়েছিল প্রাণ বাঁচাতে, সেখানেই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এরপর কেন থমাস কুড়ালটি জাহাজের ওপরেই ফেলে রাখবে আর কেনইবা ডেকের ওপারে থাকবে যেখানে মংকস তাকে খুঁজে পেয়েছিল। এই প্রশ্নের কোনো উত্তর সে খুঁজে পায় না। সে রাতে জাহাজ নির্দেশনার দায়িত্ব নিজে নিয়ে থমাসকে ঘুমাতে যেতে বলে। খুব ভোরে জাহাজ থামার সঙ্গে সঙ্গেই সে সম্পূর্ণ ঘটনা একটি চিঠি আকারে লিখে

হ্যালিফ্যাক্স বন্দরের পুলিশ কর্মকর্তার হাতে দিয়ে আবার জাহাজে ফেরত আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ আসে এবং থমাস কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

থমাসের বিরুদ্ধে এই মামলার শুনানি শুরু হয় ১৮৯৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর। থমাসের সঙ্গে পূর্বে কর্মরত বিভিন্ন জাহাজের কর্মচারীরা বলে যে, সে প্রায়ই রাগের মাথায় জাহাজের কর্মকর্তাদের মারতে উদ্যত হতো এবং প্রায়ই নাকি তাদের খুন করার ইচ্ছা ও পদ্ধতি বর্ণনা করত। তখন তার এসব কথা সবাই উড়িয়ে দিত। সে পূর্বে বেশ কয়েকটি জাহাজ থেকে কার্গো চুরি করে বিক্রি করেছিল। এমনকি থমাস নিজেই কোর্টে দম্ভভরে বলছিল যে, সে দুটি জাহাজ লুট করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যের আলোকে থমাসকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। তবে একই সঙ্গে সে টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডে (technical ground) আরও একটি মামলা জিতে যায়। এ কারণে তাকে আটলান্টায় (Atlanta) অবস্থিত ইউএস পেনিশিয়েনশিয়ারিতে (U.S Penitientiary) যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধী চরিত্র সংশোধন কারাগার) পাঠানো হয়। সেখানে তাকে আজীবনই থাকতে হতো, তবে তা হয়নি রহস্য ঔপন্যাসিক ম্যারি রবার্টস রাইনহার্টের (Mary Roberts Rinehart) অদ্ভুত হস্তক্ষেপ ও মধ্যস্থতার কারণে। মিসেস রাইনহার্ট ছিলেন 'The Bat, The Cat and the Canary' এবং আরও অনেক জনপ্রিয় রহস্য উপন্যাসের রচয়িতা। তার ধারণা ছিল, থমাস কোনো খুনি বা অপরাধী নয়, বরং সে তার সহকর্মচারীদের ষড়যন্ত্রের শিকার। তিনি থমাসের পেনিশিয়েনশিয়ারিতে কঠিন জীবনকাহিনি নিয়ে উপন্যাস লেখেন এবং তাকে একজন নির্যাতিত নির্দোষ ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরেন তার অত্যন্ত জনপ্রিয় উত্তেজনাপূর্ণ রহস্য উপন্যাস 'The After House'-এ। এই উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে (Woodrow Wilson) তার সঙ্গে একমত পোষণ করাতে সক্ষম হন এবং থমাসকে মুক্তি পাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন।

প্রায় ২৩ বছর পেনিশিয়েনশিয়ারিতে সাজা ভোগ করে থমাস ১৯১৯ সালে মুক্তি লাভ করে। তার মুক্তির ব্যাপারে কোনো প্রতিবাদ বা কারো আপত্তি ছিল বলে শোনা যায়নি। হয়তো সবাই তার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা ভুলে গিয়েছিল অথবা ভেবেছিল ২৩ বছর চরিত্র সংশোধনাগারে থেকে তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। তবে তার মুক্তির পর তার বিরুদ্ধে আর কোনো খুন-হামলা বা চুরি-ডাকাতির অভিযোগ আসেনি।

কনভিক্টেড বাই হিজ ক্রুকেড টিথ

আইনের ছাত্র থিওডোর বান্ডি (Theodore Bundy) ছিল সুদর্শন, লম্বা ও আকর্ষণীয় একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক। তার নম্র-ভদ্র আচরণ ও মিষ্টি কথায় মেয়েরা মুগ্ধ হয়ে যেত। তার তীব্র চাহনিতে অনেকেই যেন মূর্ছা যেত। তার সেকেলে আদব-কায়দা বেশিরভাগ মেয়েদের মা-বাবাকে তার ভক্ত বানিয়ে ফেলত। এই সুদর্শন পুরুষটির সাথে যারই পরিচয় হতো সেই তার স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেত। ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করত না যে, এমন দেবদূতের মতো চেহারার পেছনে অন্য কোনো রূপ থাকতে পারে। এই পুরোদস্তুর আমেরিকান যুবক বান্ডিকে বলা হয় আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত গণহত্যাকাণ্ডের হোতা। এই সুদর্শন তরুণ ৩৬ জন তরুণীর পাশবিক ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যার জন্য দায়ী। যুক্তরাষ্ট্রের চারটি অঙ্গরাজ্যে এই ভয়ংকর অপরাধীকে বর্ণনা করা হয় বিখ্যাত উপন্যাস ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড-এর মতো বলে। কেননা তার মনভোলানো রূপের মুখোশেই ঢাকা ছিল ভেতরের ভয়ংকর দানবটি। তার হত্যা করার ধরন ছিল অত্যন্ত পাশবিক। সে সুন্দরী তরুণীদের ধর্ষণ করে, ছুরির আঘাতে তাদের শরীর চিরে, শ্বাসরোধ করে শেষপর্যন্ত তাদের পিটিয়ে মেরে ফেলত। পরবর্তী সময়ে তদন্তে যখন ধরা পড়তে শুরু করে যে ৩৬ টি ঘটনার প্রতিটিতেই বান্ডি আশপাশে ছিল তখনই তার উপর সন্দেহ পড়ে এবং ধরা পড়ে সেকালের সবচেয়ে নিষ্ঠুর খুনিদের একজন।

বান্ডি তার জীবনে তিনবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল এবং তিনটিই ভিন্ন ভিন্ন শহরে ভিন্ন ভিন্ন শুনানিতে। সর্বপ্রথম তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় ১৯৭৮ সালে টালাহেসি ভগিনী সংঘের (Tallahassee Sorority House) দুজন ছাত্রীকে হত্যা করার পর। ঘটনাটি ঘটে সল্ট লেক সিটিতে (Salt Lake City)। ওই শহরের পুলিশপ্রধানের ১২ বছরের মেয়েকে সে অপহরণের পর ধর্ষণ করে হত্যা করে।

বেশ কিছুদিন একই সাথে থাকার পর বান্ডির নজর পড়ে প্রতিবেশীর একমাত্র মেয়ে লিন্ডা ব্রাউনের (Linda Brown) এর উপর। সুন্দরী লিন্ডার নজর কাড়ার

কোনো চেষ্টাই বাদ রাখেনি বান্ডি। সে প্রায়ই তাদের বাড়িতে গিয়ে লিন্ডার মায়ের কাছে রান্নাবান্নায় সহায়ক কিছু চাইত এবং লিন্ডার বাবা-মা খুশিমনেই সুদর্শন নিঃসঙ্গ যুবকটিকে সব ধরনের সহায়তা করত। তারা বান্ডিকে বেশ স্নেহ করত এবং বান্ডি ছিল স্নেহ আদায়ে খুবই পটু। নিয়মিত আসা-যাওয়ার ফলে লিন্ডার সাথে তার বন্ধুত্ব বাড়ে এবং এক পর্যায়ে লিন্ডা তার ফাঁদে পা দিয়ে স্বীকার করে যে সেও বান্ডিকে পছন্দ করে। আইনের ছাত্র সুদর্শন বান্ডির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে লিন্ডার মা-বাবাও তাদের পছন্দকে সায় দেয়। এভাবেই বান্ডির কাজ সহজ হয়ে যায়। কয়েক দিন তারা একসাথে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় এবং একদিন সুযোগ বুঝে বান্ডি লিন্ডাকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। সরল লিন্ডা তার ফাঁদে পড়ে এবং বান্ডি তাকে ধর্ষণ করে ভীষণ অত্যাচার করে খুন করে। লিন্ডার লাশ পাওয়া যায় বেশ কিছুদিন পর। এর কয়েকদিনের মধ্যেই সে তার আরেকজন প্রতিবেশীর ১৮ বছর বয়সী মেয়েকে কেনাকাটার কথা বলে নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। তাকেও একইভাবে ধর্ষণ করে ও তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এত কিছু করেও এই উচ্চশিক্ষিত যুবক নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে ছাড়ত। প্রথমে যখন এসব সন্দেহে তাকে আদালতে হাজির করা হয় সে তার বক্তব্যে বলে, 'আমি কোনোদিন খুন করিনি, কখনো কাউকে অপহরণ করার কথা চিন্তাও করিনি'। সুদর্শন চেহারা, নির্দোষ অভিনয় ও বক্তব্যে এই আইনের ছাত্র সহজেই ছাড়া পেয়ে যায়।

তার অপরাধের রক্তাক্ত রেখার সূত্রপাত তখনই প্রথম নয়। হত্যাকাণ্ডের রাস্তায় বান্ডির প্রথম পদচিহ্ন অঙ্কিত হয় ১৯৭৪ সালে, যখন ছয়জন প্রায় একই রকম বয়সের সুন্দরী তরুণী সিয়াটলে (Seattle) একপ্রকার উধাও হয়ে যায়। জানুয়ারিতে প্রথম তরুণীটি তার শোবার ঘর থেকেই উধাও হয়ে যায়। দুর্ভাগা ওই মেয়েটির কপালে কী ঘটেছে তার একমাত্র সূত্র ছিল তার খাটের পাশে পড়ে থাকা বালিশটি, যার গায়ে রক্ত ছিল। এরপর মার্চ মাসে ১৯ বছরের আকর্ষণীয় রসায়নের ছাত্রী তার নির্মম আঘাতের শিকার হয়। মেয়েটি এভারগ্রিন স্টেট কলেজের (Evergreen State College) ছাত্রী হোস্টেল থেকে কনসার্ট দেখার উদ্দেশে বিকালের দিকে বের হয়। সেদিনের পর তাকে আর কেউ দেখেনি। তৃতীয় মেয়েটি এর পরের মাসে প্রায় একইভাবে সিনেমা দেখতে যাওয়ার পথে হারিয়ে যায়।

তাদের কাউকেই আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। ছয়টি মেয়ের প্রত্যেকেই ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় শ্যামাঙ্গিনী। তাদের মধ্যে একটি ব্যাপারেই মিল ছিল, তা হলো তাদের সবারই কোথাও না কোথাও একজন সুদর্শন তরুণের সাথে পরিচয় হয়েছিল যে নিজেকে টেড (Ted) বলে পরিচয় দিত। এই ছেলেটি কে তা কেউ কখনো জানতে পারেনি। মেয়েগুলোর শেষপর্যন্ত কী হতো তা হয়তো কেউই

জানতে পারত না যদি না বনবিদ্যার কিছু ছাত্র-ছাত্রী শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে নির্জন বনের ভেতর পায়চারি করতে করতে কয়েকটি হাড় ও অন্যান্য দেহাবশেষ খুঁজে পেত। একটি স্যাঁতসেঁতে গর্তের মধ্যে কোনোমতে মাটিচাপা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল ছয়-ছয়টি মেয়ের চোয়ালের হাড়, ভাঙা হাত-পায়ের হাড় ও শরীরের কিছু অংশ। এই হাড়গুলোর প্রাপ্তিতে যেন সারা দেশে আতঙ্কের শিহরণ বয়ে যায়। গোয়েন্দা ও পুলিশের অগ্রগতি ছিল খুবই সামান্য। তারা তদন্ত চালাতে চালাতেই এ ঘটনার সাথে যুক্ত হয় আরও দুটি মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা। তারা কোনো একটি পার্কে পিকনিক করতে গিয়েছিল তবে আর ঘরে ফিরে আসেনি। প্রায় তিন মাস পর তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায় পূর্বের সেই কবর থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে।

আবারও প্রতিবেশী ও বন্ধুরা টেড নামক একজন রহস্যময় আকর্ষণীয় যুবকের কথা বলল। বর্ণনা শুনে জানা গেল পূর্বে নিখোঁজ হওয়া মেয়েদের সাথে জড়িত টেড এবং এই যুবক একই ব্যক্তি। এসব তরুণীদের বান্ধবীদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে তাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সময়ে হঠাৎই কোনো জায়গায় যেমন- দোকানে বা সমুদ্রতীরে বা কোনো পার্টিতে টেড নামের এক সুদর্শন যুবকের পরিচয় হয়। টেড তাদের বান্ধবীদের কারো সাথে তেমন কথাবার্তা বলত না বলে তারা তেমন কিছুই জানত না টেড সম্পর্কে। তা ছাড়াও তারা সে সময়টাও পায়নি। তার আগেই তাদের বান্ধবী নিখোঁজ হয়ে যায়, সেইসাথে টেডও। টেড প্রায়ই তাদের নিয়ে ঘুরতে যেত। বেশিরভাগ সময়ই মেয়েগুলো বলতে পারত না যে তারা কোথায় যাচ্ছে কেননা টেড তাদের আগে থেকে কিছুই বলত না। ফলে নিখোঁজ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে কেউ টের পায়নি যে তারা হোস্টেলে নেই।

বান্ডি বা টেডকে এসব খুনের দায়ে দণ্ডিত করা যায়নি। তবে তাকে ১৭ বছরের একটি মেয়েকে অপহরণের চেষ্টার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন লাঞ্চব্রেকের সময় তাকে আদালতের একটি ঘরে একা আটকে রাখা হলে পাহারাদার না থাকার সুযোগ নিয়ে সে অত্যন্ত চতুরভাবে পালিয়ে যায়। এরই মধ্যে বান্ডির নামে মিশিগানে দুটি হত্যা মামলা ঝুলছিল। সেখানে একজন নার্সকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে হত্যা করে এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তার ১৪ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করে শ্বাসরোধে হত্যা করে। তার এবারের পালিয়ে যাওয়া সারা দেশের পুলিশকে সোচ্চার করে তোলে, গোয়েন্দাদের টনক নড়ে এবং তারা হন্যে হয়ে বান্ডিকে খুঁজতে থাকে, যাকে অনেক দিন ধরেই গণহত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করে আসছিল বিভিন্ন শহরের পুলিশ। কোনোভাবেই এই ভয়ংকর হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সাত মাস নিখোঁজ থাকার পর এই ভয়ংকর খুনি আবারও তৎপরতা শুরু করে।

তার কর্মকাণ্ড আবারও শুরু হয় ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির (Florida State University) এক ছাত্রী হোস্টেলের চারজন ছাত্রীকে একটি গাছের ভাঙা ডাল দিয়ে নির্মমভাবে আঘাত করার মাধ্যমে। দুজন মেয়ে একের পর এক আঘাতে এখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, আর বাকি দুজন গুরুতর আহত হয়। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে সে কী করছিল আর কেনই বা সে মেয়েগুলোকে আঘাত করে, তা ভালোভাবে জানা যায়নি। ধারণা করা হয়, সে হয়তো চারজনের একজনকে অপহরণ বা তেমন কিছু করতে গেলে বাকিরা এসে পড়ে এবং তখন সে মরিয়া হয়ে মাটিতে পড়ে থাকা গাছের ভাঙা ডালটা ব্যবহার করে। জোরালো তদন্তের পর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বান্ডি। এসব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে তার মামলার শুনানির জন্য দেশের সবাই অপেক্ষা করছিল। এটি ছিল আমেরিকার ইতিহাসে অন্যতম উত্তেজনাপূর্ণ মামলা, যা ফ্লোরিডার আইনের অনুমতি সাপেক্ষে জনসাধারণকে সরাসরি সম্প্রচার করে টিভিতে দেখানো হয়। এই মামলায় প্রায় অবাস্তব ঘটনার আনাগোনা ঘটায় তা সারা বিশ্বের সাংবাদিকমহলেও হইচই ফেলে দিয়েছিল।

বান্ডিকে ধরা সম্ভব হয় তাকে খুব ভালোভাবে কেউ চাক্ষুষ দেখে ফেলার পর। শুধু তাই নয়, উপযুক্ত প্রমাণের সহায়তায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। বান্ডির বৈশিষ্ট্য বলতে ছিল তার স্বতন্ত্র তেরছা আঁকাবাঁকা দাঁতগুলো। এই দাঁতের কারণেই বান্ডি শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে যায়। ডেনটিস্টের সাহায্যে এটি প্রমাণিত হয় যে, প্রতিটি মৃতদেহে পাওয়া দাঁতের দাগ ও ক্ষতের সাথে বান্ডির দাঁতের শতভাগ মিল পাওয়া গেছে। বান্ডি এ পর্যন্ত যাদেরই হত্যা করেছে, তাদের হাতে, মুখে, স্তনে ও নিতম্বে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে কামড়ে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। তবে তা জানা যায় তার শেষ খুনগুলোর মাধ্যমে। কারণ প্রতিটি মৃতদেহই খুনের পরপর পাওয়া গিয়েছিল। সেসব মৃতদেহের ক্ষতস্থানে যে দাঁতের ছাপ পাওয়া যায়, তা-ই প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে পুলিশ। ফ্লোরিডায় আহত মেয়ে দুটিকে দেখে সবাই ভেবেছিল, তারা মারা গেছে। কেননা তাদের সারা গা আঁচড়, কামড় ও গাছের ডালের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তে রঞ্জিত ছিল।

অবশেষে সব হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী বান্ডিকে দোষী প্রমাণিত করা হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সে সময় আদালতে বান্ডির মা ও স্ত্রী উপস্থিত ছিল।

বিচারপতির রায় ঘোষণার পর বান্ডির মা চিৎকার করে বিলাপ করেন এবং বলতে থাকেন, তার ছেলে নির্দোষ। ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য খুনি বান্ডি তার হত্যা নেশা শুরু হওয়ার কিছুদিন আগেই মোরমন হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল (Mormon, যুক্তরাষ্ট্রের যে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোক বহু বিবাহ সমর্থন করত)। বান্ডির চরিত্র আজও একটি রহস্য। যারা তাকে কাছ থেকে দেখে এসেছিল সারা জীবন, এমনকি সেদিনও যারা তাকে অত্যন্ত শান্তভাবে ঠান্ডা মাথায় আদালতে

দেখেছিল, বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, এই মানুষটি কোনো নারীকে ভয়ংকরভাবে ধর্ষণ করতে বা পেটাতে পারে অথবা এত হত্যাকাণ্ডের একমাত্র হোতা হতে পারে। তার জন্ম হয়েছিল অবিবাহিত মায়ের ঘরে। তার পর থেকে তার জীবন ছিল অনিন্দ্যনীয়। সে একজন স্কাউট ছিল এবং সিয়াটল ক্রাইম কমিশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামস ডিরেক্টর হিসেবে হোয়াইট কলার ক্রাইমের (White collar crime) বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল। শুধু তাই নয়, সে নারীদের ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচার উপায় বিষয়ক একটি বই লিখতে একজন লেখককে সাহায্যও করেছিল।

এতকিছু প্রমাণিত হওয়ার পরও একজন মানুষ তাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিশ্বাস করত, সে হলো ক্যারোল বুন (Carole Boone), যাকে বান্ডি ফ্লোরিডায় তার তৃতীয় মামলা দায়ের হওয়ার কিছুদিন আগে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে আদালতে বিয়ে করে। ক্যারোল খুব বেশি হলে তার স্বামীর সাথে দুই দিন সংসার করেছে এবং সে প্রতিদিন তার বাড়ি থেকে ১৫০ মাইল গাড়ি চালিয়ে টালাইসিতে আসত, যেখানে বান্ডিকে ডেথ রো সেলে (Death Row Cell) রাখা হয়েছিল। তার স্ত্রী বারবার সাংবাদিকদের বলত টেড মোটেও হিংস্র ধর্ষক বা গণহত্যাকারী হতে পারে না। ওর ওপর জারি করা সব দোষের পেছনে আছে কিছু কুচক্রী মানসিক রোগী। তারা আইন বলবৎকারী হিসেবে কাজ করতে না পেরে তাদের অমিমাংসিত মামলার দোষ চাপাতে একজন অসহায় লোকের খোঁজে ছিল। আমি প্রথম থেকেই টেডকে নির্দোষ বলে বিশ্বাস করি এবং সবসময় করব। আমি যখন প্রমাণগুলো ও প্রত্যক্ষদর্শীদের দেখেছিলাম তখনই আমি তাদের দোষী সাব্যস্ত করে তাদের অভিশাপ দিয়েছি। তবে বিচারপতিদের কথা ভিন্নই ছিল। তাদের কথা হলো, এতগুলো ভয়ংকর নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের দায়ে বান্ডির মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। তার মৃত্যু দেশ ও দেশবাসী সবার জন্যে শান্তিমূলক হবে, কেননা সে বেঁচে থাকলে জেল ভেঙে পালিয়ে সেই সব লোমহর্ষক নিষ্ঠুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে পারবে।

দ্য মনস্টার ইন হিউম্যান শেইপ

গ্রীষ্মের সকাল। দ্রুত পায়ে সকালের রোদ গায়ে মেখে হেঁটে যাচ্ছে সমাজসেবক থমাস রাইলি (Thomas Riley)। তখন ভোর প্রায় ছয়টা বাজছিল এবং সে যাচ্ছিল ওয়েস্ট অকল্যান্ডের (West Auckland) একটি গ্রামে তার সমাজসেবামূলক কাজের জন্য। ডারহ্যাম বিভাগের (County Durham) লোকজনের তখন অত্যন্ত কঠিন সময় যাচ্ছিল। যারা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে জীবনযাপন করতে অক্ষম, তাদের সেবায় নিয়োজিত ছিল রাইলি। এভাবেই নিজেকে সমাজসেবায় ব্যস্ত রেখে সে নিজেকে যান্ত্রিক জীবনের জটিলতা থেকে দূরে রেখেছিল। ফ্রন্ট স্ট্রিটে (Front Street) পা ফেলার পর তার হঠাৎ ১৩নং বাড়ির বিধবা মহিলার কথা মনে পড়ল। মাত্র ছয় দিন আগেই সে রাইলির কাছে এসেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, সে যে গ্রামের সেবামূলক আশ্রমের দায়িত্বে আছে সেখানে তার ৭ বছর বয়সী সৎ ছেলে চার্লস এডওয়ার্ডের (Charles Edward) জন্য কোনো ঘরের ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা। রাইলি জিজ্ঞেস করল যে, হঠাৎ করে সৎ ছেলের জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হলো কি কারণে। উত্তর এল, "যেহেতু ও আমার নিজের ছেলে না, তাই তার লালন-পালন করা আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সে আমাকে বাড়ির একজন সম্মানিত ভাড়াটিয়াকে উঠাতে বাধা দিচ্ছে।" রাইলি ব্যাপারটা হাল্কা করার জন্য ভাড়াটিয়ার পরিচয় নিয়ে একটু মশকরা করে জিজ্ঞেস করল, "সম্মানিত ভাড়াটিয়াটি কী আমাদের এলাকার শুল্ক কর্মকর্তা নাকি? সবাই তো বলে বেড়াচ্ছে যে, আপনারা নাকি বিয়ে করতে যাচ্ছেন?" বিধবা মহিলা বললেন, "হতেও পারে। কিন্তু কথা সেটা নয়। কথা হলো যে, ছেলেটি আমার পথে দাঁড়াচ্ছে, বাঁধা দিচ্ছে আমাকে।"

এসব ভাবতে ভাবতেই রাইলি সেই বিধবার ছোট্ট পাথরের বাড়ির সামনে এসে পড়ল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা বিধবার সাথে চোখাচোখি হতেই সে বুঝতে পারে যে কিছু একটা হয়েছে। বিধবার মুখে দুঃখের ছাপ স্পষ্ট ছিল। রাইলি এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে তার কি হয়েছে। উত্তরে যা শুনল, তার জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। প্রথমে সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল

না যে, সে আসলেই শুনেছে মহিলাটি বলেছে, "আমার ছেলেটি মারা গেছে।" রাইলি সোজা ছুটে গেল পুলিশের কাছে এবং স্থানীয় ডাক্তারকে নিয়ে তারা বিধবার বাড়িতে পৌঁছল। সে তাদের ঘটনা খুলে বলল এবং সেটি ছিল এমন একটি তদন্তের প্রথম ধাপ– যা সেই বিধবা, ম্যারি অ্যান কটনকে (Mary Ann Cotton) ব্রিটেনের দেখা সবচেয়ে নিকৃষ্ট গণখুনি হিসেবে কলঙ্কিত করে দেয়।

ছেলেটির মৃত্যুর ব্যাপারে রাইলির সন্দেহের উদ্রেক হয়, কারণ ছয় দিন আগেই তাকে একদম সুস্থ দেখেছিল সে। ঘটনাস্থলে এসে কাহিনি শুনে ডা. কিলবার্ন (Dr. Kilburn) অত্যন্ত বিস্মিত হন। তাঁর সহকারি ডা. চেম্বারস (Dr. Chambers) সেই সপ্তাহে কমপক্ষে পাঁচবার ছেলেটিকে দেখতে এসেছিলেন। ছেলেটি বলছিল যে, তার পেট ব্যথা করে এবং সব দেখেশুনে তিনি ভেবেছিলেন, এটি হয়তো গ্যাস্ট্রো এনট্রাইটিস (Gastro-enteritis, পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ) লক্ষণ মাত্র। তিনি কখনো চিন্তা করেননি যে, সামান্য লক্ষণ এমন গুরুতর হতে পারে এবং যে কারণে ছেলেটি মারা যাবে। ডা. কিলবার্ন ভাবলেন, ব্যাপারটি একটু গভীরে গিয়ে দেখা উচিত। তিনি ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে ছেলেটির দেহ পোস্টমর্টেম করার অনুমতি চাইলেন। করোনার সাহেব (Coroner; আঘাত বা অপঘাতজনিত মৃত্যুর কারণ তদন্তকারী বিচারক) এ ব্যাপারে সম্মতি দিলেন এবং তিনি পরের দিন ১৮৭২ সালের ১৩ জুলাই, শনিবার দুপুর বেলায় একটি আইনত অনুসন্ধান চালানোর ব্যবস্থা করলেন।

সারাদিন প্র্যাকটিস ও বিভিন্ন রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে পোস্টমর্টেম শুরু করতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। আদালতে রিপোর্ট পেশ করার জন্য মাত্র এক ঘণ্টা হাতে রেখে ডা. কিলবার্ন পোস্টমর্টেম শুরু করেন। তিনি খুব দ্রুত ভাসা-ভাসা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট দেন যে, "আমি এমন কিছু পাইনি, যাতে বিষ প্রয়োগের বিষয় আরোপ করা যেতে পারে। সাধারণভাবেই এই মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে। খুব সম্ভবত গ্যাস্ট্রো-এনট্রাইটিসই এর মূল কারণ।" এরপর জুরি চার্লসের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে ঘোষণা দেয়। তাকে স্থানীয় কবরস্থানেই এক নিঃস্ব হতদরিদ্র ব্যক্তির কবরে সমাধিস্থ করা হয়। ডা. কিলবার্ন থাকে সময় না থাকায় একটি ছোট বোতলে চার্লসের পাকস্থলী থেকে কিছু খাদ্য নমুনা সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। শেষপর্যন্ত বুধবারে তিনি কিছু সময় পেলেন সঠিকভাবে সকল কেমিক্যাল টেস্ট সম্পন্ন করার। যদিও প্রথমে তিনি সন্দেহজনক কিছুই পাননি, তবুও তিনি চার্লসের খাদ্য নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কয়েকটি টেস্টের পরই তিনি ফলাফল দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং বাধ্য হয়ে রিপোর্ট নিয়ে ছুটে গেলেন পুলিশের কাছে। পরীক্ষা করে খাদ্য নমুনায় আর্সেনিকের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। পরদিন সকালেই চার্লসের সৎ মা, বিধবা ম্যারিকে গ্রেফতার করা হলো এবং তার ওপর খুনের মামলা করা হলো।

চার্লসের মৃতদেহ কবর খুঁড়ে বের করা হলো এবং আরও পরীক্ষার জন্য লিডস স্কুল অফ মেডিসিনে (Leeds School of Medicine) পাঠানো হলো। সেখানকার ফরেনসিক মেডিসিন এন্ড টক্সিকোলজির (Forensic medicine and toxicology) ডা. থমাস স্ক্যাটার গুড (Dr. Thomas Scatter good) পরীক্ষা করে ছেলেটির অন্ত্র, যকৃত, ফুসফুস, হৃদপিণ্ড ও বৃক্কে আরও আর্সেনিক আবিষ্কার করলেন।

ইতোমধ্যে থমাস রাইলি কর্তৃপক্ষকে প্রায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছিল যে, চার্লস এডওয়ার্ডের মৃত্যুই এই পরিবারে প্রথম অস্বাভাবিক মৃত্যু নয়। গত দুই বছরে, ম্যারি অ্যান কটন ওয়েস্ট অকল্যান্ডে আসার পর এ পর্যন্ত তাদের পরিবারে চারজনের মৃত্যু ঘটেছে। ম্যারি পেশায় ছিল একজন নার্স। ওয়েস্ট অকল্যান্ডের বাসিন্দা ফ্রেডরিক কটন (Fredrick Cotton) ছিল তার চতুর্থ স্বামী। ফ্রেডরিক কয়লার খনিতে চাকরি করত এবং ম্যারির সাথে বিয়ের সময় তার দু'টি ছেলে ছিল। তার বড় ছেলে ছিল রবার্ট এবং ছোট ছেলে চার্লস। ম্যারির সাথে বিয়ের এক বছর পর, ১৮৭১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরে তাদের বিবাহবার্ষিকীর মাত্র দুই দিন পরই ফ্রেডরিকের মৃত্যু হয়। ৩৯ বছর বয়স্ক সুস্থ সবল মানুষটির মৃত্যুতে সবাই হতবাক হয়। শোকের ভারে হয়তো কারও মাথায় কোনো বিরূপ চিন্তা আসেনি, তাই তখন কোনো পরীক্ষাও করা হয়নি। এরপর ১৮৭২ সালে ১০ মার্চ থেকে ১ এপ্রিলের মধ্যে আরও তিন জনের মৃত্যু হয়। প্রথম জন ছিল ফ্রেডরিকের প্রথম স্ত্রীর বড় ছেলে রবার্ট, দ্বিতীয় জন হিল ম্যারির ১৪ মাস বয়সী শিশুপুত্র এবং শেষ জন ছিল ম্যারির পূর্ব প্রেমিক জোসেক ন্যাট্রাস (Joseph Nattrass)। ম্যারির স্বামী মারা যাওয়ার পর জোসেফ এসে এই পরিবারে যোগ দেয় এবং তাদের সাথে বসবাস শুরু করে। ১৪ মাস বয়সী শিশুটি বাদে বাকি সবারই মৃত্যুর কারণ হিসেবে ধরা পড়েছিল গ্যাস্ট্রিক ফিভার বা আন্ত্রিক জ্বর। শিশুটির মৃত্যুর কারণ হিসেবে ধরা পড়ে যে, তার টিথিং কনভালোশনস (Teething convulsions; দন্তপেশী প্রদাহজনিত রোগ) ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

এসব ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর পরই ফ্রেডরিক, রবার্ট ও জোসেফ– এর মৃতদেহগুলো কবর থেকে বের করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলো। ম্যারি অ্যান কটনকে ডুরহ্যাম কারাগারে রাখা হলো। ডা. স্ক্যাটার গুড মৃতদেহগুলো পরীক্ষা করে সেগুলোতে আর্সেনিকের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন। পত্র-পত্রিকায় এ ঘটনা প্রকাশ পেল এবং চারদিকে ছড়িয়ে গিয়ে সকলের মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে গেল ম্যারি অ্যান কটন। এবার সাংবাদিকেরা তার অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করল।

ম্যারির জন্ম হয় ডুরহ্যামের লো মুরসলেতে (Low Moorsley)। এই গ্রামটি খনির গ্রাম বলেই বেশি পরিচিত। কারণ প্রায় পুরো এলাকাতেই কয়লার খনি ছিল। এখানকার এক সাধারণ খনি মজুরের ঘরে তার জন্ম হয় ১৮৩২

সালে। ম্যারির অতীত থেকে তারা এক ভয়াবহ সত্য উদ্ঘাটন করে যে, আপাত দৃষ্টিতে দয়ালু, ভদ্র ও অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মেয়েটি প্রকৃতপক্ষে একটি পিশাচ। সে যেখানেই গিয়েছে সেখানেই বিষাক্ত ছোবলের মতো মৃত্যু ছড়িয়েছে।

১৮৫২ সালে যখন ম্যারির বয়স ২০ বছর, সে উইলিয়াম মাওরে (William Mowray) নামক এক খনি শ্রমিককে বিয়ে করে। বিয়ের পর পর তারা ডেভনে (Devon) গিয়ে বসবাস শুরু করে। সেখানে তার পাঁচটি সন্তান হয়, এর মধ্যে চার জনই মারা যায়। এরপর তারা উত্তর-পূর্ব দিকে এসে পড়ে। এক শহর থেকে আরেক শহরে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত তারা সান্ডারল্যান্ড (Sunderland) এলাকায় আসে। সেখানে ম্যারি স্থানীয় হাসপাতালে নার্স হিসেবে চাকরি নেয়। এরপর তার আরও তিন জন সন্তান হলেও তারা ছোট অবস্থায়ই মারা যায়। এর কিছুদিন পরই উইলিয়াম মারা যায়। উইলিয়ামের মৃত্যুর কিছুদিন পরই ম্যারি আবার বিয়ে করে। তার দ্বিতীয় স্বামী, জর্জ উড (George Wood) পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল। কিন্তু এর সাথেও ম্যারির সংসার ১৪ মাসের বেশি টেকেনি। বিয়ের ১৪ মাসের মাথায় ১৮৬৬ সালের অক্টোবরে জর্জের মত্যু হয়। এক মাস পরেই ম্যারি হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দিয়ে হাউসকিপার হিসেবে চাকরি নেয় বিপত্নীক জেমস রবিনসনের (James Robinson) কাছে। জেমসের ছিল তিন সন্তান। জেমসের বাড়িতে চাকরি করার সময় সে গর্ভবর্তী হয়ে পড়লে তারা বিয়ে করে ফেলে। কিন্তু বিয়ের কয়েক সপ্তাহ পরেই জেমসের এক বছর বয়সী শিশুপুত্র জন (John) মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনার শোক ঠিকমতো কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ২১ এপ্রিল জেমসের মেজো ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ছয় বছর বয়সী জেমস জুনিয়র (James Jr) কিছুদিনের মধ্যেই সমাধিত হয়। ভাইয়ের পিছে পিছেই বলতে গেলে, পাঁচ দিন পরই ৮ বছর বয়সী এলিজাবেথ (Elizabeth), জেমসের দ্বিতীয় মেয়ে মারা যায়। এর পর ২ মে, ম্যারি ও উইলিয়ামের সংসারের একমাত্র জীবিত সন্তান ইসাবেলা (Isabella) ৯ বছর বয়সে মারা যায়। জেমস ও ম্যারির দু'টি কন্যা সন্তান হয়। প্রথম সন্তান জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায়। এভাবে একের পর এক সন্তানের মৃত্যুতে জেমস অত্যন্ত ভেঙে পড়ে ও ম্যারির সাথে ধীরে ধীরে তার কলহ ও দূরত্ব বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে তারা দু'জন আলাদা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের আলাদা হওয়ার কিছুদিন আগে জেমস তাদের একমাত্র জীবিত সন্তান ও ম্যারির দ্বিতীয় মেয়েকে এক বন্ধুর কাছে দত্তক দেয়। রবিনসন বেঁচে রইল। এর কারণ হয়তো ম্যারির হাজার অনুরোধ করা সত্ত্বেও রবিনসন নিজের জন্য কোনো জীবনবীমা করেনি। স্ত্রীর এই একটি অনুরোধ রক্ষা করা থেকে বিরত থাকাই হয়তো তাকে তখনো জীবিত রেখেছিল। কিন্তু অন্যান্য যারা ম্যারিকে চিনত বা

জীবনের কোন এক মুহূর্তে ম্যারির সাথে পরিচিত হয়েছিল তাদের মতো দুর্ভাগা আর কেউ ছিল না।

জেমসের সাথে ছাড়াছাড়ির পর ম্যারি সবাইকে বলল, তার ভয় হচ্ছে যে, কিছুদিন পর সেও মারা যাবে। সে সবাইকেই বলে বেড়াত, সে দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়ছে এবং খুব শীঘ্রই মারা যেতে পারে। তার পরিচিতরা পরামর্শ দিল, কিছু দিনের জন্য তার মায়ের বাড়িতে থেকে আসতে, হয়তো এতে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি হবে। তাদের কথামতো সে তার মায়ের কাছে গেল। অনেকেই ভাবত যে, ম্যারি অপয়া। কিন্তু কেউ কোনোদিন চিন্তাও করেনি যে, তার হাসিখুশি ৫৪ বছর বয়সী মায়ের কোনো ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু এখানেও মৃত্যুর ছায়া এসে পৌঁছায়। ম্যারি যাবার ৯ দিনের মধ্যেই তার মা মারা যায়। ম্যারি আবারও অন্যত্র চলে আসে। তার বাবা মারা যাওয়ার পর এমনিতেই সকল সম্পত্তি তারই হওয়ার কথা। তার মায়ের মৃত্যুর পর আর কোনো বাধাই রইল না। কিছুদিন পর তার দেখা হয় মার্গারেট কটনের সাথে। দ্রুতই তারা খুব ভালো বন্ধুতে পরিণত হলে মার্গারেট তার ভাই ফ্রেডরিকের সাথে ম্যারির পরিচয় করিয়ে দেয়। ম্যারি কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রেডরিকের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যায় এবং গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তখনো তার তৃতীয় স্বামী জেমস জীবিত ছিল। ফ্রেডরিক ও ম্যারি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্দিষ্ট দিনেই তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু ফ্রেডরিকের বোন মার্গারেটের হঠাৎ মৃত্যুতে বিয়ের অনুষ্ঠানটি ম্লান হয়ে যায়। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, মার্গারেটের উইলে লেখা ছিল, তার ৬০ পাউন্ডের ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি তার মৃত্যুর পর তার ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রীর নামে হস্তান্তরিত হবে। ম্যারির কাছাকাছি আসা ২১ জন ব্যক্তি তাদের জীবন হারিয়েছে প্রায় ২০ বছরেরও কম সময়ে। শুধু তাই নয়, তার ১১টি সন্তানের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত আছে, যাকে অন্য একটি পরিবার দত্তক নিয়েছে। অবাক হওয়ার মতো বিষয় হলো, তার মামলার শুনানির দিন, স্থানীয় পত্রিকার শিরোনাম ছিল, "ওয়েস্ট অকল্যান্ডে গুরুতর বিষ প্রয়োগের নির্মম ঘটনার রহস্যোৎঘাটন।" কিন্তু যখন ১৮৭৩ সালের ৫ মার্চ সকাল ১০টার দিকে ম্যারি তার মামলার শুনানির জন্য কোর্টে প্রবেশ করে, তখন সে শুধুমাত্র একটি খুনের জন্যই দায়ী ছিল। যা তার সৎ ছেলে চার্লস এডওয়ার্ডের খুন।

মামলাটি পরিচালনা করছিলেন স্যার চার্লস রাসেল (Sir Charles Russell)। যিনি পরবর্তীতে লর্ড চিফ জাস্টিস পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি জারি করেন যে, "তথাকথিত ৪০ বছর বয়সী এই বিধবা ম্যারি অ্যান কটন তার সৎ ছেলেকে বিষপ্রয়োগ করেছে, কারণ ছেলেটির নামে ৮ পাউন্ড মূল্যের একটি বিবেচনাপূর্ণ জীবনবীমার ব্যবস্থা করা ছিল। এছাড়া এই ছেলেটি ম্যারি ও তার নতুন প্রেমিক, শুল্ক অফিসার কুইক ম্যানিং (Quick Manning) এর বিয়ের

পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার অতি শীঘ্র বিয়ে করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কেননা সে কুইক ম্যানিং দ্বারা বর্তমানে গর্ভবতী। ম্যারি অ্যান কটন অস্বচ্ছল ও প্রায় কপর্দকহীন হওয়ার পথে ছিল এবং ছেলেটি তার জন্য পথের কাঁটা ও বোঝা দুই-ই হয়ে পড়েছিল। যার কারণে সে গর্হিত অপরাধের পথ বেছে নেয় এবং ছেলেটিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে।

পুলিশ তদন্ত করে ম্যারি অ্যান ডডস (Mary Ann Dodds) নামক এক মহিলা, যে ম্যারির প্রতিবেশী ছিল তার কাছ থেকে বেশ কিছু তথ্য পায়। সে বলে যে, ১৮৭২ সালের মে মাসে, চার্লসের মৃত্যুর প্রায় দুই মাস আগে ম্যারি গ্রামের এক রাসায়নিকের দোকান থেকে এক বোতল আর্সেনিক ও একটি সাবান কিনেছিল। ম্যারি বলেছিল যে, আর্সেনিক ও সাবানের মিশ্রণ তাদের বাড়ির একটি খাটে ব্যবহার করা হবে ছারপোকা মারার জন্য। আদালতে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে যে, "আমি মিশ্রণটির অধিকাংশই বিভিন্ন আসবাবপত্রে ঘষে দিয়েছিলাম, অন্য কাজে ব্যবহার করার কোনো প্রশ্নই আসে না।" দোকানিকে জিজ্ঞসাবাদ করে জানা যায় যে, সেই মিশ্রণে প্রায় এক আউন্সের মতো আর্সেনিক ছিল, যা ৪৮০টি দানা আকারে ছিল। এ রকম তিনটি দানাই একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট। আরও একটি বিষয় হলো যে, এই দোকানটিই সম্ভবত ম্যারির বাড়ি থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী। কাছাকাছি আরও এমন দোকান থাকা সত্ত্বেও ম্যারি দূরে গিয়েছিল আর্সেনিক কিনতে– এটাও সন্দেহের উদ্রেক করে। অন্যদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দেয় রাইলি ও ডা. কিলবার্ন। ম্যারি যে তার সৎ ছেলে থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল তার সাক্ষ্য দেয় রাইলি এবং ডা. কিলবার্ন। ব্যাখ্যা করেন কীভাবে ম্যারি আর্সেনিক কাজে লাগিয়েছিল। এর পরই এই মামলায় তর্ক ও মতের বিরোধিতা শুরু হয়। আদালত চাচ্ছিল ম্যারির পূর্বের অপরাধ ও খুনগুলোর সাক্ষ্যপ্রমাণ আদালতে হাজির করা হোক। অপরদিকে দু'দিন আগে নিয়োগকৃত ম্যারির পক্ষের আইনজীবী থমাস ক্যাম্পবেল ফস্টার (Thomas Campbell Foster) আদালতের দাবির বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, "আমার মক্কেলকে একটি খুনের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং তা হলো কিছু আসবাব ও ওয়ালপেপার থেকে দুর্ঘটনাবশত আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে চার্লসের মৃত্যু। এ ক্ষেত্রে পূর্বে সংঘটিত মৃত্যুর বিষয় আলোচনা করা ন্যায় বিচারকে ব্যাহত করবে বলে আমি মনে করি।" কিন্তু বিচারপতি স্যার থমাস আর্কিব্যাল্ড (Sir Thomas Archibald) পূর্ববর্তী আইনানুগ নজির প্রদর্শন করে তার বিরোধিতা করেন। ঐ মুহূর্তে এই বিচারের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল কী হবে তা সকলেই বুঝতে পারল। প্রতিদ্বন্দ্বী আইনজীবী ম্যারির পক্ষে কোন সাক্ষী হাজির করাতে পারেনি। মামলার শুনানির তৃতীয় দিন সন্ধ্যা ০৬.৫০ মিনিটে জুড়ি প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী পর্যালোচনা চালিয়ে ম্যারি অ্যান কটনকে হত্যার দায়ে দণ্ডিত

করেন। বিচারপতি ম্যারির উদ্দেশে রায় দেন যে, "দেখা যাচ্ছে যে, তুমি এমন একটি অপরাধ সংঘটন করেছ যা সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রবঞ্চনার শ্রেণিভুক্ত। যা একজন মানুষের নৈতিকতা ও ধার্মিক মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। এ কারণে তোমাকে পরকাল পর্যন্ত তোমার অপরাধের কলঙ্ক বয়ে বেড়াতে হবে। বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে খুন জঘন্যতম অপরাধ, যার ফলে মানুষের বিবেকও আতঙ্কিত হতে বাধ্য। এটি এমন গর্হিত অপরাধ, যা ঈশ্বরের দূরদর্শিতা ও সদয় তত্ত্বাবধানে সর্বদাই অপরাধের স্পষ্ট ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অস্তিত্বের ছাপ ফেলে যায়। বিষ প্রয়োগ সর্বদাই গর্হিততম অপরাধের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে এবং আজও এটি একটি অপরাধের একটি অকল্পনীয় মাত্রা।" বিচারপতির কথাগুলো ঠিক ছিল, কিন্তু তাতে হয়তো কঠিনতম বাস্তবতা উপস্থিত ছিল না। ১৮৭০ সালের চিকিৎসা শাস্ত্র ও রসায়ন বর্তমান যুগের মতো এত উন্নত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল না। তখনকার যুগে গ্যাস্ট্রিক ফিভার বা আন্ত্রিক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে খুব সহজেই মারা যেত। কর্মব্যস্ত ডাক্তারদের পক্ষে কোনো জোরদার প্রমাণ বা কোনো জরুরি কারণ ছাড়া প্রতিটি মৃতদেহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এটি হয়তো কারণ ছিল ম্যারির ধরা না পড়ার স্বপক্ষে। যদিও ম্যারির অপরাধ ও হত্যার পাল্লা ছিল অত্যন্ত ভারী, তবুও সে বার বার ঠিকানা, পরিবার বদলাতে থাকাতে সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে যায়। প্রতিবারই যখন পরিবারের কেউ অভিযোগ করত পেট ব্যথার ব্যাপারে, সে সাথে সাথেই স্থানীয় ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসত চিকিৎসা করানোর জন্য। যার ফলে কেউ কখনো তাকে সন্দেহ করেনি। আর একটি কারণ হলো, সে একজন দক্ষ নার্স ছিল এবং প্রতিবেশীদের ছোটখাটো রোগ-শোকের ব্যাপারে সব সময়ই সাহায্য করতে উপস্থিত থাকত। ফলে সবার সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল এবং সবাই তাকে বিশ্বাস করত।

কেউই হয়তো কখনো জানতে পারবে না যে, হতভাগ্য সেই ২১ জনের মধ্যে কাদের জীবনবীমার টাকার জন্য, কাদের সম্পত্তির জন্য এবং কাদের নতুন বিয়ের পথে কাঁটা হয়ে যাবার কারণে ম্যারি আর্সেনিক দিয়ে তিল তিল করে মেরেছে। বেশিরভাগ মানুষ বলে যে, সে হয়তো ২১ জনের সবাইকে খুন করেনি, হয়তো তাদের মধ্যে ১৪-১৫ জনকে বিষ প্রয়োগে খুন করেছে। কিন্তু 'নিউ ক্যাসেল জার্নাল' (New Castle Journal) নামক পত্রিকায় তার ভয়াবহ কাহিনি 'মানুষরূপী এক দানব' (monster in human shape) শিরোনামে বিস্তারিত লেখা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মনে ম্যারির মৃত্যুদণ্ড নিয়ে আশঙ্কা ছিল তখনো। সন্দেহ ছিল একটি নারীর ফাঁসির ব্যাপারে, সন্দেহ ছিল তার আইনি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে, সন্দেহ ছিল পূর্বের মৃত্যুগুলোর সাক্ষ্যপ্রমাণ আদালতে হাজির করা নিয়ে, সন্দেহ ছিল বিচারকালে আসামির প্রতিরক্ষায় কোনো সাক্ষীর অভাব নিয়ে। 'নিউক্যাসেল জার্নাল' পত্রিকাতে যা ছাপা হয়েছিল তা হলো– "সম্ভবত

সবচেয়ে হতবুদ্ধিকর ধারণা এটি যে, একজন মহিলা ভয়ংকর ও বীভৎস না হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের কোনো কাজ করতে পারে। অপরপক্ষে দেখা যায় যে, ম্যারি অ্যান কটনের মধ্যে সেই কার্যক্ষমতা আছে, যার মাধ্যমে সে যখনই চেয়েছে তখনই একজন স্বামী জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছে। সে তার অন্যান্য সন্তানদের এবং তার প্রেমিক ও ভাড়াটিয়ার সাথে অত্যন্ত দয়ালু ও সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিল। এমনকি যখন সে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় তাদের বিষ দিচ্ছিল যা ঘুণাক্ষরেও তাদের কিছু টের পেতে দেয়নি।"

এই পত্রিকা সম্পূর্ণ প্রবন্ধটিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চেয়েছে যে, এ ধরনের মানুষের হাত থেকে পৃথিবীর রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত জরুরি এবং তারা এও বলেছে যে, "সমবেদনাকে হয়তো সংহার করা সম্ভব না, যদিও এক্ষেত্রে একে অবশ্যই ঘৃণার সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।" ম্যারি তার জীবনের শেষ দিনগুলো কারাগারে কাটায়। সে তখন মুক্তি পাওয়ার আবেদন করার জন্য সহায়তা লাভ করার চেষ্টা করছিল। কারাগারে থাকা অবস্থায়ই সে কুইক ম্যানিংয়ের সন্তানের জন্ম দেয়। মার্গারেট নামক এই কন্যাটিকে সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম এক দম্পতির কাছে দত্তক দেওয়া হয় । ম্যারির মৃত্যুদণ্ডের পাঁচ দিন আগে জোরপূর্বক শিশুটিকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ১৮৭৩ সালের ২৪ মার্চ তাকে ডারহ্যামের প্রাণদণ্ড মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনো সে বলছিল– সে নির্দোষ, সে কাউকে বিষ দিয়ে হত্যা করেনি। এর তিন মিনিটের মধ্যেই তার দেহ স্পন্দন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ভয়ংকর এক খুনির। এর আট দিনের মধ্যেই "দ্য লাইফ এন্ড ডেথ অফ ম্যারি অ্যান কটন" (The Life and Death of Mary Ann Cotton) শীর্ষক একটি মঞ্চ নাটক অনুষ্ঠিত হয় শহরের বিভিন্ন থিয়েটারে। এই নাটকটি সেরা নৈতিক নাটকের খেতাব পায়। মৃত্যুদণ্ডের পরও মায়েরা দুষ্ট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখায় এই বলে যে, দুষ্টুমি করলে ওয়েস্ট অকল্যান্ডের বিধবা এসে যাবে। অনেক ছেলেমেয়ে খেলাচ্ছলে বলে– "Mary Ann Cotton, she's dead and rotten" আজও তাকে খুনিদের কাতারে অত্যন্ত ধূর্তদের একজন ধরা হয়। ম্যারি অ্যান কটন দেখতে খুব সাধারণ, সহজ-সাবলীল হলেও সে একজন সুদক্ষ গণহত্যাকারী ছিল। সে একই সাথে এবং সমভাবে নিজের আচরণের আকস্মিক পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম ছিল। ফলে সে সহজেই মানুষের সহানুভূতি লাভ করেছিল।

এ মিসক্যারিজ অফ জাস্টিস

জন রেজিনাল্ড হ্যালিডে ক্রিস্টি (John Reginald Halliday Christie) তার প্রতিবেশীদের কাছে একজন কর্মঠ এবং সম্মানিত লোক হিসেবে পরিচিত ছিল। যদিও মানুষজন তাকে খুব একটা পছন্দ করত না, তবুও প্রায়ই তার কাছে চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ নিতে অনেকেই আসত। এই বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান ছিল বলে জানা যায়। গুজব আছে যে, সে প্রায়ই সফলভাবে মেয়েদের গর্ভপাত করত। তার কাছে বিভিন্ন যৌনকর্মীদের যাতায়াতের এটাই ছিল মূল কারণ এবং এই টোপ ফেলেই সে অসংখ্য কমবয়সী সুন্দরী যৌনকর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।

প্রায় ১৪ বছর ধরে জন ক্রিস্টির বসবাস ছিল লন্ডনের ক্ষীয়মান এলাকা নটিং হিলের ১০নং রিলিংটন প্লেসের (10 Millington Place, Noting Hill, London) একটি ভগ্নপ্রায় অস্বাস্থ্যকর পাকা দালানে। ১৯৩৮ সালে জন ক্রিস্টি ও তার স্ত্রী এথেল (Ethel) এই বাড়িটির নিচতলায় বসবাস শুরু করেন। ওই সময় সে তার পাঁচটি অপরাধের মামলায় লড়ছিল এবং সেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছিল– যার মধ্যে একটি ছিল, একজন নারীকে আঘাত করা সংক্রান্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সে পুলিশে যোগদানের আবেদন করে এবং তার পূর্ব ইতিহাস যাচাই না করাতে খুব সহজেই পুলিশ অফিসার হিসেবে চাকরি পেয়ে যায়। যুদ্ধের পর সে কিছুদিন একটি কারখানায় চাকরি করে এবং সব শেষে পোস্ট অফিসে কেরানি পদে চাকরি নেয়। ১০নং রিলিংটন প্লেসের বাড়িটিতে থাকার সময়ই জন ক্রিস্টির স্ত্রী হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এরপর সে ১৯৫২ সালে অন্যত্র একটি বাড়িতে গিয়ে বসবাস করা শুরু করে এবং এই বাড়িটি ভাড়া দিয়ে দেয়। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে ঐ বাড়িতে অবস্থানকারী ভাড়াটিয়া রান্নাঘরে মেরামতের কাজ করছিল। রান্নাঘরের একপাশ প্রায় অব্যবহৃতই ছিল বলতে গেলে। সেই পাশের আলমারি পরিষ্কার করতে গিয়ে হঠাৎ কোনো কিছুর দুর্গন্ধে তার দম আটকে আসে। কিছুটা অবাক হয়েই সে আরও এগিয়ে যায় আলমারিটি খোলার জন্য। আশ্চর্যজনকভাবে

সেই আলমারিটির সামনের অংশ কাগজ দিয়ে আটকানো ছিল। সেটিই যে দুর্গন্ধের উৎস তা বুঝতে মোটেও দেরি হলো না। তিনি বেশ বিরক্ত হয়েই ঝাড়ু ও চাকু নিয়ে আসলেন কাগজ কেটে আলমারিটি পরিষ্কার করবেন বলে। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে, ভেতরে কোনো ইঁদুর মরে এই গন্ধের সৃষ্টি করেছে। তাই পরিষ্কার করার সকল সরঞ্জাম হাতের কাছেই রেখেছিলেন। আলমারি খোলার পর তিনি যা দেখলেন, তাতে বাধ্য হয়েই তাকে ছুটতে হলো নিকটবর্তী টেলিফোন বুথে। হন্তদন্ত হয়ে তিনি ডায়াল করলেন ৯৯৯।

পুলিশ আসতে বেশি দেরি হয়নি। প্রথমেই তারা বাড়িটিকে ঘেরাও করে তদন্তের উদ্দেশ্যে। রান্নাঘরের সেই আলমারি থেকে বের হয় তিন তিনটি লাশ। তাদের পোশাক-আশাক দেখে ও শেষ পর্যন্ত চেহারা শনাক্ত করে জানা যায় যে, তারা তিন জনই ছিল যৌনকর্মী। আরও দু'জন যৌনকর্মীর কঙ্কাল বের হয় বাড়িটির পেছনের আঙ্গিনা থেকে। কোনমতে একটি গভীর গর্ত খুঁড়ে তাদের সেখানে মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। আরও খোঁজাখুঁজির পর বসার ঘরের মেঝে খুঁড়ে পাওয়া যায় আরও একটি লাশ। এটি আর কেউ নয়, জন ক্রিস্টির হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া স্ত্রী এথেল ক্রিস্টি।

সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় পুলিশের জোরালো তদন্ত। হন্যে হয়ে পুলিশ খুঁজতে থাকে জন ক্রিস্টিকে। ভাড়াটিয়ার কাছে যে ঠিকানা ছিল, তাকে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে কয়েক দিনের মধ্যেই তার হদিস পাওয়া যায় এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়। জন ক্রিস্টি হয়তো কখনো কল্পনা করেনি যে, সে এভাবে ধরা পড়ে যাবে, তাই গা-ঢাকা দিয়ে চলার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাকে পুলিশ রিমান্ডে নিলে সে এই ছয়টি খুনের কথা স্বীকার করে। এরপর আরও জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে বেরিয়ে পড়ে এক লোমহর্ষক তথ্য। ভয়ংকর এক রোগে আক্রান্ত ছিল জন ক্রিস্টি। সে পুলিশকে জানায় যে, তার খুন করার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল, সেই মৃত নারীদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা। তার পক্ষে মৃত নারীদেহ ছাড়া আর অন্য কোনো উপায়ে যৌন তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব ছিল না। বিশেষজ্ঞরা এই রোগকে নেক্রোফিলিয়া (Necrophilia) নামে আখ্যা দেন। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি মূলত মৃতদেহের প্রতি প্রবল যৌন আকর্ষণ অনুভব করে। আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের (American Psychiatric Association) ডায়াগনস্টিক ও স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল (Diagnostic and Statistical Manual) অনুযায়ী এই রোগকে Paraphilia শ্রেণীভূক্ত করা হয়। এর আরও দু'টি প্রচলিত নাম হলো থ্যানাটোফিলিয়া (Thanatophilia) এবং নেক্রোল্যাগনিয়া (Necrolagnia)। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তিন ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা হয়। প্রথম শ্রেণীর রোগীরা শুধুমাত্র মৃতদেহের সাথে

যৌনমিলনের কথা কল্পনা করে তৃপ্তি লাভ করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগীরা মৃতদেহ জোগাড় করে তার সাথে মিলিত হয়। এরা সাধারণত মর্গের কর্মচারী বা পাহারাদার অথবা কবরস্থানের পাহারাদার হয়। তৃতীয় ও সবচেয়ে ভয়ংকর শ্রেণীর রোগীরা কারও সাথে যৌন সম্পর্কের উদ্দেশে তাকে খুন করে। জন ক্রিস্টি ছিল নেক্রোফিলিয়ায় আক্রান্ত সবচেয়ে ভয়ংকর শ্রেণীর রোগীদের একজন। মানসিক রোগী সাব্যস্ত হওয়ায় জন ক্রিস্টি ভেবেছিল যে, তার শুধুই সাজা হবে এবং সে মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ফাঁসি দেওয়ার আদেশ করা হয়।

কিন্তু কাহিনি শুধু এতটুকুই নয়। এসব ঘটনার পেছনে চাপা পড়ে ছিল আরও কাহিনি। ১০নং রিলিংটন প্লেসে পাওয়া ছয়টি মৃতদেহের প্রকাশ পাওয়ার পর জেরার এক পর্যায়ে জন ক্রিস্টি ছয়টি খুনের কথা স্বীকার করে এবং সেই সঙ্গে তার আরও একটি খুনের কথা বলে ফেলে। চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত সব খুলে বলে তার পূর্ব-প্রতিবেশী টিমোথি ইভানসের (Timothy Evans) স্ত্রী বেরিল ইভানসকে (Beryl Evans) সে কীভাবে খুন করেছিল। কিন্তু এই স্বীকারোক্তি দিতে ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। টিমোথি ইভানসকে আর সাহায্য করা সম্ভব ছিল না, কেননা ১৯৫০ সালেই টিমোথির ফাঁসি হয় নিজের স্ত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করার দায়ে। এতদিন পর্যন্ত কেউই জানত না যে, টিমোথি ও জন ক্রিস্টির মধ্যে কে বেরিলের খুনের জন্য দায়ী। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছিল এই যে, এতদিন পরে আসল অপরাধী খুঁজে পেলেও টিমোথির মুক্তির বা তাকে নির্দোষ প্রমাণ করার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

টিমোথির স্বীকারোক্তির ঘটনা ঘটেছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ ও অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে। সে ১৯৪৯ সালের ৩০ নভেম্বর সাউথ ওয়েলসের মেরথায়ার টাইডফিল (Merthyr Tydfil, South Wales) পুলিশ স্টেশনে যায়। সেখানে দৌড়ে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার টেবিলে আছড়ে পড়ে বলে, "আমি হার মানছি। আমার পক্ষে আর আমার স্ত্রীর দেহাবশেষ বহন করা সম্ভব নয়। টিমোথি ছিল একজন অশিক্ষিত এবং সহজেই প্রতারিত করা যায় এমন ব্যক্তি। জন ক্রিস্টি যেন তাকে জাদুটোনা করে রেখেছিল, সম্মোহিতের মতোই সে অক্ষরে অক্ষরে জন ক্রিস্টির কথা মানছিল। প্রথমে সে জন ক্রিস্টির কথামতো গোয়েন্দাদের বলল যে, তার স্ত্রীর দেহ পাওয়া যাবে তাদের বাড়ির পাশের ড্রেনে। ১০নং রিলিংটন প্লেসের সেই বাড়ির একদম উপরের তলায় তারা থাকত। নিচতলায় ও দোতলায় ছিল জন ক্রিস্টির বসবাস। বাড়ির পাশেই অবস্থিত ড্রেনে মৃতদেহ খুঁজে না পেয়ে পুলিশ সারা বাড়িতে খোঁজ করে। সেখানেও মৃত দেহের কোনো দেখা মেলেনি। শেষ পর্যন্ত মৃত দেহটি খুঁজে পাওয়া যায় বাড়ির পিছনের আঙ্গিনার একদম শেষ মাথায়

অবস্থিত কাপড়-চোপড় ধোয়ার ঘরের (Wash-house) এক কোনায়। মেয়েটিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল। মৃত দেহটির সাথে সেই সবই করা হয়েছিল, যা ছিল জন ক্রিস্টির সব খুনের মূল উদ্দেশ্য। মৃত্যুর পর তাকে অসংখ্যবার ধর্ষণ করা হয়েছে বলে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা যায়। কিন্তু আরও একটি ভয়াবহ রহস্য উদ্‌ঘাটন তখনো বাকি ছিল। সেটি হলো বেরিলের শিশুকন্যা জেরাল্ডিনের (Geraldine) মৃতদেহ। মেয়ের মৃতদেহ দেখে টিমোথি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি, কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সে। তার পৃথিবী যেন ঐ মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে সে নিজেকে তার স্ত্রী ও মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে। কিন্তু পরে তার মামলার শুনানির সময় জন ক্রিস্টিকে দায়ী করে।

জন ক্রিস্টি ও তার স্ত্রী এথেল

হতভাগা টিমোথির জবানবন্দি অনুসারে তার স্ত্রী দ্বিতীয়বারের মতো গর্ভবতী হয়ে পড়ে। টিমোথির পক্ষে তখন আরও একটি সন্তানের ভরণপোষণ করার মতো আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তখন জন ক্রিস্টি তাকে পরামর্শ দেয়, বেরিলের গর্ভপাত করানোর জন্য এবং এও বলে যে, সে অত্যন্ত কম খরচে বেরিলের গর্ভপাত করিয়ে দেবে। প্রতিবেশী বন্ধুকে বিশ্বাস করে টিমোথি তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। একদিন স্ত্রীকে জন ক্রিস্টির কাছে নিয়ে যায় গর্ভপাতের জন্য। সাথে তার

মেয়েও ছিল। তাদেরকে জন ক্রিস্টির কাছে রেখে সে টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করতে বাইরে যায়। তার অনেক দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, কারণ ঠিকমতো চিকিৎসা না করাতে পারলে তার স্ত্রী মারা যেতে পারে বলে জন ক্রিস্টি তাকে অনেক বার বলেছিল। বাড়ি ফিরে আসার পর সে দৌড়ে জন ক্রিস্টির কাছে যায় এবং স্ত্রীর অবস্থা জানতে চায়। জন ক্রিস্টির চেহারা দেখে সে অনুমান করেছিল যে, হয়তো কোনো খারাপ খবর আছে। কিন্তু তবুও বার বার প্রশ্ন করলে জন ক্রিস্টি তাকে বেরিলের মৃতদেহের কাছে নিয়ে যায়। হতভম্ব টিমোথি বেরিলের নিথর দেহের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। জন ক্রিস্টি তাকে জানায়, গর্ভপাত করানোর সময় বেরিল মৃত্যুবরণ করে শারীরিক জটিলতার কারণে। জন ক্রিস্টি তাকে বলে যে, গর্ভপাত না করালেই ভালো ছিল এবং এজন্য টিমোথিকে দায়ী করে। এরপর তারা নিজেরাই বেরিলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে তাকে বাড়ির পেছনে সমাধিত করে। জন ক্রিস্টি টিমোথিকে পরামর্শ দেয়, তার স্ত্রীর সব কাপড় এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র ফেলে দিতে এবং তাকে শহর ছেড়ে কিছুদিন বাইরে থাকতে বলে। জন ক্রিস্টি এও আশ্বস্ত করে যে, তার মেয়ে জেরাল্ডিনকে দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থা করবে, যেন সে কোনো পরিবারের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠতে পারে। টিমোথি বলে যে, এ কারণেই সে শহরের বাইরে যায় এবং শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে কিছুদিন পরে পুলিশকে জানায়।

টিমোথির কোনো কথাই বিচারপতি বিশ্বাস করেনি এবং তা আদালতে প্রমাণ করারও কোনো প্রয়াস নেয়নি কেউ। শুধু তাই নয়, পূর্বে পুলিশে চাকরি করার কারণে জন ক্রিস্টির কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। পূর্বে যে তার একটি নারী নির্যাতনের মামলাও আছে, সেটি কেউ খুঁজেও বের করেনি– আদালতে পেশ করা তো দূরের কথা। বিচারপতির রায় ছিল, জন ক্রিস্টি সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তি এবং সে সকল সন্দেহের ঊর্ধে। টিমোথিকে তার স্ত্রী ও মেয়ে হত্যার দায়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। জন ক্রিস্টি মুক্তই থেকে গেল। আরও চারটি খুন করার জন্য সে উন্মুক্ত থাকল। তার স্ত্রী এবং তিনজন যৌনকর্মীকে সে খুব কম সময়ের ব্যবধানে হত্যা করে। তাদের দেহগুলো মাটি চাপা দেওয়া হয় পেছনের আঙ্গিনার আরও দু'টি যৌনকর্মীর মৃতদেহের সাথে– যাদের সে খুন করেছিল ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে। ততদিনে সেখানে কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। পরবর্তীতে সে তার স্ত্রীকে নিচতলার বসার ঘরের মেঝে খুঁড়ে সেখানে মাটিচাপা দেয়। ইট-সিমেন্ট ও কার্পেটের আড়ালে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায় তার স্ত্রী। তিনজন যৌনকর্মীকে সে রান্নাঘরের *আলমারিতে* রেখে সেই আলমারিটি কাগজ জাতীয় কিছু দিয়ে সম্পূর্ণ সীল করে দেয়।

জন ক্রিস্টির কয়েকজন শিকার

জন ক্রিস্টির সকল অপরাধ ধরা পড়ার পর ১৯৫৩ সালের জুন মাসে তাকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করা হয়। তিন জন যৌনকর্মী ও নিজের স্ত্রীকে খুন করার দায়ে তাকে ১৯৫৩ সালের ১৫ জুলাই পেন্টোনভিল কারাগারে (Pentonville Prison) ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এখানেই কাহিনি শেষ নয়, টিমোথির সাথে যা হয়েছিল, তা ন্যায়ের উদ্দেশ্যহানি বলে দাবি করে জনগণ এবং এর প্রতিবাদে আন্দোলন করে তারা। জনগণের প্রতিবাদ বছরের পর বছর চলতে থাকে এবং ১৯৬৬ সালের আগে এর কোনো সুরাহা হয়নি। বিচারপতি ব্রাবিন (Justice Brabin) শেষ পর্যন্ত জনগণের চাপের মুখে এই ন্যায়ের উদ্দেশ্যহানির সুরাহার দায়িত্ব নিতে বাধ্য হন এবং এই কেসের অফিশিয়াল রিভিউকে তাঁর দায়িত্বে একটি তদন্তের আকারে প্রকাশ করেন। তিনি জারি করেন, "খুব সম্ভবত টিমোথি ইভানস তার স্ত্রী বেরিল ইভানসকে খুন করেনি এবং এটি আরও পরিষ্কার যে, সে তার কন্যা জেরাল্ডিনকেও খুন করেনি।" এই ঘোষণার মাধ্যমে টিমোথির ন্যায়ের জন্য লড়াই করা জনগণের মূল উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ততদিনে টিমোথিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমা করে তাকে তার নিজস্ব জীবনে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব ছিল। তার দেহ পেন্টনভিল কারাগার থেকে সরিয়ে এনে সঠিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে সসম্মানে একটি কবরস্থানে সমাধিত করা হয়।

এরপরও জনগণের প্রশ্ন থেকেই যায়। বিচারকালে কেন পুলিশকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়নি? তারা কেন তাদের সম্পূর্ণ যোগ্যতা কাজে লাগায়নি

এবং কেনইবা তারা সকল প্রমাণ ও মৃতদেহ বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও খুঁজে বের করতে পারেনি। এই প্রমাণগুলো তখনই খুঁজে বের করতে পারলে সকল দোষের জন্য স্পষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দেশিত হতো ঘৃণ্য ফন্দিবাজ, গণ-শ্বাসরোধকারী ধর্ষক ও হত্যাকারী জন ক্রিস্টির দিকে। টিমোথির অপরাধের তদন্ত করতে এসে তারা জন ক্রিস্টির পূর্ব ইতিহাস জানতে ভুলে গিয়েছিল এবং পূর্বে পুলিশে চাকরি করার কারণে তাকে ভালো মানুষ খেতাব দিয়ে চলে যায়। জন ক্রিস্টি জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তাদের বলেছিল যে, বেরিলের লাশ এভাবে মাটিতে পড়ে ছিল, কেননা সে টিমোথিকে তা উঠাতে সাহায্য করতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে সে বলে, তার ফাইব্রোসাইটিস (Fibrosities) আছে, যা তাকে ভারী জিনিস উঠাতে অক্ষম করে দিয়েছে। পুলিশ একবারও ফাইব্রোসাইটিসের সততা ঘাটিয়ে দেখেনি, এমনকি কোনো প্রশ্নও করেনি। তাদের তিন দিন লেগেছিল লাশটি খুঁজে বের করতে এবং এটি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, বাড়ির পেছনের ছোট্ট এ ঘরটিতে তারা প্রথম দুই দিন উঁকিও দেয়নি। প্রথম দিন যখন তারা পেছনের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে জন ক্রিস্টির সাথে কথা বলছিল, তখন তারা ছোট একটি মাটি খুঁড়ে রাখা জায়গাকে নিয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেনি। জন ক্রিস্টির ভবিষ্যতের বাগান শুনে খুশি মনে সেখান থেকে চলে আসে। তারা যদি ঐ দিনই একবার ওখানে খুঁড়ে দেখত, তখন শুধু বেরিলের প্লাস্টিক মোড়ানো লাশই নয়, আরও দু'টি নারীর কঙ্কাল পাওয়া যেত– যা বহু আগেই জন ক্রিস্টির হাতে নির্মমভাবে ধর্ষিত ও খুন হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের সেই সকালে যখন পুলিশ দ্বিতীয়বারের মতো জন ক্রিস্টির বাড়িতে এসে তদন্তের জন্য পেছনের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, তখন জন ক্রিস্টির পোষা কুকুরটি বাগানের মাটি হাল্কাভাবে খুঁড়ে উত্তেজিত হয়ে ঘেউ ঘেউ করছিল। জন ক্রিস্টি কুকুরটিকে লাথি দিয়ে সেখান থেকে ভাগিয়ে দেয় এবং সেই মনগ্রেল কুকুরটি যদি আর একটু মাটি উপরে ফেলত তাহলে সেখানে একটি নারীর মাথার খুলি পাওয়া যেত। গোয়েন্দারা একবারও চিন্তা করেনি যে, তারা দুটি লাশের ঠিক উপরের জমিতে দাঁড়িয়ে একজন খুনির সাথে আলাপ করছে। তাদের সামনেই ঘটে যাওয়া কুকুরটির উত্তেজনা, তাকে ভাগিয়ে দেওয়া ও খুঁড়ে ফেলা স্থানে তাড়াহুড়ো করে জন ক্রিস্টির মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ঘটনা খুবই সাধারণ বলে মনে হয়েছিল। তারা কোনো কিছুই সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করেনি এবং জন ক্রিস্টিকে নির্দোষ বলে রিপোর্ট দিয়ে দেয়। তৃতীয় দিন ক্রিস্টি বেরিলের লাশ বের করে ওয়াশ হাউজের এক কোনায় ফেলে রাখে যেন টিমোথিকে তাড়াতাড়ি ফাঁসিয়ে এই তদন্তের ঝামেলা মিটে যায়। জেরাল্ডিনকেও খুন ও ধর্ষণ করে সে বেরিলের সাথেই রেখে দেয়। কিন্তু তার কোনো কিছুই হয়নি। ফাঁদে পড়ে হতভাগা টিমোথির ফাঁসি হয়ে যায়।

সেই দিন গোয়েন্দা ও পুলিশেরা যদি আরও একটু মনোযোগী হতো আরও চারটি নারীকে হয়তো মৃত্যু ও মৃত ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হতো। তাদের নিথর নির্জীব দেহকে অসংখ্যবার নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হতে হতো না। জঘন্য এই মানসিক রোগী ও হিংস্র খুনির কুপরিকল্পনায় তাহলে নির্দোষ টিমোথি ইভানসকে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করা যেত। জন ক্রিস্টির মৃত্যুদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে তার মতো খুনি শেষ হয়ে যায়নি। আজও সাধারণ মানুষের ভিড়ে হাজারো এমন জন লুকিয়ে আছে, যারা জঘন্যভাবে নারীদের শুধু ধর্ষণ করার জন্য খুন করতে ওঁৎ পেতে আছে। তবে শেষ পর্যন্ত জন ক্রিস্টির সকল অপরাধ প্রকাশ পাওয়াতে ও তার ফাঁসি হওয়াতে তখনকার লন্ডনবাসী কিছুটা স্বস্তি লাভ করেছিল।

দ্য স্ট্রিকনিন স্পেশালিস্ট

তখন ১৮৯২ সালের ১৫ নভেম্বর। জল্লাদ যখন প্রাণদণ্ডের মঞ্চটি উঁচু করে ফেলল তার জন্য একটি চমক ছিল, হঠাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে চিৎকার দিয়ে ওঠে নিল ক্রিম (Neill Cream) এবং স্বীকার করল যে, সেই জ্যাক দ্য রিপার (Jack The Ripper)। ঘটনাটি কয়েক মুহূর্তের জন্য সবাইকে চমকে দিলেও অবাক করেনি। কর্তৃপক্ষ তা খুব ভালো করেই জানত। তারা এটাও বুঝতে পেরেছিল যে এটি এই নিকৃষ্ট মানসিক রোগীর হত্যাবৃত্তির জীবনটি আরও একটু সাক্ষ্য সমৃদ্ধ করার চেষ্টা ছাড়া কিছু না। নিল সম্পর্কে এক কথায় বলা যায় যে সে ছিল নোংরা ভাবনা ও জঘন্য কর্মকাণ্ডের এক অধঃপতিত ব্যক্তি। সে একই ধরনের লোকজনকে একই এলাকায় খুন করত। এই ভয়ংকর খুনি এমন এক পদ্ধতিতে খুন করত যা কিনা লন্ডনের সবচেয়ে কুখ্যাত খুনির হত্যাকৌশল থেকেও ছিল জঘন্য।

নিল ক্রিম ছিল একজন নির্দয় ধর্ষকামী ব্যক্তি, যার কথা প্রকাশ পায় যখন সে নিজের কর্মকাণ্ডের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। তার জীবনের জঘন্য খুনগুলো সে করেছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর। জঘন্য এই খুনির জন্ম ১৮৫০ সালে গ্লাসগোতে (Glasgow)। তার বয়স যখন চার বছর তার বাবা-মা কানাডায় গিয়ে বসবাস করেন এবং সেখানেই তার শৈশব ও কৈশোর কাটে। তার বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল এবং তিনি তাকে মনট্রিলে (Montreal) অবস্থিত বিখ্যাত ম্যাকগিল কলেজে (McGill College) ভর্তি করেন। ১৮৭৬ সালে নিল সেখান থেকে একজন চিকিৎসক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। তবে তার চিকিৎসক জীবনের মূলমন্ত্র জীবন বাঁচানো ছিল না, বরং তা ছিল জীবন নেওয়া। সে পড়াশোনা শেষ করে গর্ভপাত বিশেষ চিকিৎসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। তখনকার দিনে এটি অত্যন্ত লাভজনক পেশা হলেও তা ছিল আইনত নিষিদ্ধ।

তার কর্মজীবনের প্রথম দিনগুলো ভালোই চলছিল যতদিন পর্যন্ত না তার জীবনে ফ্লোরা বুকসের (Flora Brooks) আগমন ঘটে। এই সুন্দরী যুবতীকে

দেখে মুগ্ধ হয়ে নিল তাকে তার প্রেমের জালে ফাঁসায় এবং এক পর্যায়ে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। নিলই তার গর্ভপাত করায়। কিন্তু কীভাবে যেন ফ্লোরার বাবা সবকিছু জেনে যান। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি অনেকটা বন্দুকের গোড়ায় বাধ্য করে তাদের বিয়ে করিয়ে দেন। বিয়ের পর পরই নিল উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে লন্ডনে যায়। এক বছর পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে তার স্ত্রীর কাছে ফেরত আসতে হয়। তার স্ত্রী ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ ছিল। নিল ফিরে আসার পর পরই সে মারা যায়। নিল আবারও গর্ভপাত চিকিৎসক হিসেবে কাজ করা শুরু করে। একাধিক মেয়ের সাথে অবাধ মেলামেশার সাথে এবার যোগ হয় ব্ল্যাকমেইল করা। যারা তার কাছে গর্ভপাত করাতে আসত সে তাদের ছবি ও যাবতীয় তথ্য রেখে দিত এবং সুযোগ বুঝে তাদের গুপ্ত কথা ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে মোটা অংকের টাকা আদায় করত। দিন দিন তার কুখ্যাতি বাড়তে থাকলে সে আরও দক্ষিণে, যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমায়। ভাগ্য পরীক্ষা করতে বসবাস শুরু করে শিকাগো (Chicago) শহরে। এখানেও সে ঘৃণ্য অপরাধগুলো করে যেতে থাকে। ১৮৮০ সালের মধ্যেই শিকাগো পুলিশের কাছে তার নাম পরিচিত হয়ে গেল। তাকে প্রথমবার গ্রেপ্তার করা হয় জুলিয়া ফল্কনার (Julia Faulkner) নামের এক যুবতি হত্যার সন্দেহে। মেয়েটি তার কাছে গর্ভপাত করিয়েছিল এবং সে মারা যায়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও তদন্ত তল্লাশি করে তেমন কিছু না পেয়ে ছেড়ে দেয় পুলিশ। জুলিয়ার গর্ভপাত করাটা ছিল অবৈধ কেননা সে বিবাহিত ছিল না। এটি নিয়ে পরে তেমন হইচই হয়নি। সবাই ভেবেছিল কোনো শারীরিক জটিলতায় তার মৃত্যু হয়। এরপর নিলের দুজন বৈধ রোগীর মৃত্যু হয়। প্রথম জন ছিল একজন বয়স্কা চিরকুমারী। তিনি গর্ভপাতের জন্য নয়, জন্মনিয়ন্ত্রক ওষুধের ব্যাপারে পরামর্শ নিতে নিলের কাছে আসতেন। এই চিরকুমারীর মৃত্যু ছিল অত্যন্ত সন্দেহজনক কেননা তার গর্ভপাত করানো হয়নি, শুধু ওষুধ সেবনেই মৃত্যু হয়েছিল তার। দ্বিতীয় জন আসলে তার রোগী প্রথম থেকে ছিল না। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী নিলের কাছ থেকে জন্মনিয়ন্ত্রক ওষুধ নিত। মৃত ড্যানিয়েল স্টট (Daniel Stott) ছিল একজন রেল কর্মচারী। তার মৃগী রোগ ছিল বলে জানা যায়। তার স্ত্রী পরে স্বামীর মৃগীরোগের ব্যাপারে নিলের পরামর্শ চাইলে সে তাকে ওষুধ দেয় বলে নিল পুলিশকে জানায়। তবে সন্দেহের উদ্রেক ঘটায় অন্যান্য মানুষের জবানবন্দি। ক্লিনিকের বেশিরভাগ কর্মচারীই বলেছিল যে ড্যানিয়েলের স্ত্রীর সাথে নিলের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। পুলিশ প্রথমে সন্দেহ করল স্ত্রীটিকে। কিন্তু তাদের কাজের মোড় ঘুরিয়ে দেয় নিলের চিঠি। সে চেয়েছিল অন্য কারো ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখতে। সে করোনারের (Coroner, অপঘাত বা সন্দেহজনিত মৃত্যুর তদন্তকারী কর্মকর্তা) কাছে চিঠি লেখে এই বলে যে, সম্ভবত কেমিস্ট ওষুধগুলোতে অতিরিক্ত পরিমাণে

স্ট্রিকনিন (Strychnine) মিশিয়েছে যার ফলে ড্যানিয়েলের মৃত্যু হয়েছে। সে ড্যানিয়েলের মৃতদেহ কবর খুঁড়ে বের করে যথার্থ পরীক্ষা করার পরামর্শ দেয়। তার কথামতো মৃতদেহ পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয় যে কেমিস্টের কোনো দোষ নেই। তখন সন্দেহ পড়ে নিলর ওপর। ততদিনে নিল ড্যানিয়েলের স্ত্রীকে পালিয়ে বিয়ে করে গা-ঢাকা দিয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে পুলিশ খুঁজে পায় এবং গ্রেপ্তার করে। ড্যানিয়েলের হত্যাকারী হিসেবে নিলকে সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডারের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু সে তার সাজা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ছাড়া পেয়ে যায়। ১৮৯১ সালের জুলাইতে ইলিনোয়িসের গভর্নর তার কারাদণ্ড নিষ্ক্রিয় করেন ও ১০ বছরেরও কম সময় জেল খেটে ছাড়া পায় নিল।

কিছুদিন পর নিলের বাবা মারা যায়। নিল ১৬ হাজার ডলার ও তার বাবার সকল সম্পত্তির মালিক হয়। সে কানাডায় ফিরে আসে, তবে বেশি দিনের জন্য নয়। খুব শীঘ্রই সে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়। ল্যামবেথের (Lambeth) জুয়াড়ি ও মাতালে ভরা কুখ্যাত রাস্তাগুলোয় সে মেডিক্যাল ছাত্রের বেশ ধরে ঘোরাঘুরি করত। সে জ্যাক দ্য রিপারের (Jack The Ripper, অজ্ঞাতনামা খুনি যে ১৮৮৮ সালের দিকে লন্ডনে বেশ কয়েকটি খুন করে ও পত্রপত্রিকায় নিজেকে খুনি বলে চিঠি লেখে। এ ঘটনা বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে) কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করত এবং তার মতো হতে চাইত। তার আদর্শ যে রাস্তাগুলোয় ঘুরে বেড়াত সেসব রাস্তায় সেও ঘুরে বেড়াতে গর্ববোধ করত। এছাড়া যৌনকর্মীদের প্রতি ছিল তার প্রচণ্ড আকর্ষণ। সে প্রায়ই তাদের সাথে সময় কাটাত। তাদের বিভিন্ন রোগ, চর্মরোগ ও গর্ভপাত সম্পর্কে জ্ঞান দিত। কখনো কখনো সে একই সাথে দুজন বা তিনজন যৌনকর্মীর সাথে সহবাস করত। তার কাছে একাধিক মেয়ের সাথে এভাবে এক সাথে থাকাটা খুব গর্বের বিষয় মনে হতো। তবে যৌনতাই তার একমাত্র আকর্ষণ বা তৃপ্তি ছিল না। যৌনতার পরের ধাপটি তার ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত ভয়ানক। সেটি হলো নিষ্ঠুরতার জঘন্যতম রূপ। সে মেয়েদের ট্যাবলেট বা তরল ওষুধ দিত এবং বলত যে এটি খেলে মুখের দাগ দূর হবে। সুদর্শন ও চটুল কথার এই ডাক্তারের কথা সবাই বিশ্বাস করে সেই ওষুধ খেত। ওষুধগুলোতে থাকত অতিরিক্ত পরিমাণে স্ট্রিকনিন, যা সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক, বিষের মধ্যে সেরা। মেয়েরা সেই ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত এবং নিল কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে বেরিয়ে আসত। ভয়ংকর বিষের প্রভাবে তীব্র যন্ত্রণায় তার শিকারদের শরীর প্রবলভাবে মোচড়াত এবং তখন সে মুচকি হাসতে হাসতে নিজের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিত। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কী রকম কষ্ট পেয়ে মেয়েগুলো মারা যাচ্ছে তা কল্পনা করে সে অত্যন্ত আমোদিত হতো।

১৮৯১ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে ল্যামবেথের হারকিউলিস রোডে (Hercules Road, Lambeth) অবস্থিত একটি বাড়ির দিকে নিল

নিল ক্রিম

হেঁটে আসছিল। বাড়ির জানালা দিয়ে দুজন অল্পবয়সী যৌনকর্মী এলিজাবেথ মাস্টারর্স (Elizabeth Masters) এবং এলিজাবেথ মে (Elizabeth May) তাকে দেখছিল। নিল তাদের দুজনের ঘরের সামনে আসার পর ম্যাটিল্ডা কভার (Matilda Cover) নামের ২৬ বছর বয়সী এক যৌককর্মী তাকে ডাক দেয়। নিল তার পিছু পিছু ল্যামবেথ রোডে তার ঘরে যায়। এর দশদিন পর প্রচণ্ড চিৎকারে সবাই তার ঘরে ছুটে যায়। প্রচণ্ড খিঁচুনিতে সে বিছানা থেকে মেঝেতে পড়ে যায়। চিৎকার করতে করতে সে বলে যে তাকে ফ্রেড নামে এক লোক বিষযুক্ত ওষুধ দিয়েছে। তবে তার কথায় কেউ তেমন আমল দেয়নি। এমনকি যে চিকিৎসক তার ডেথ সার্টিফিকেট দেয় সে বলে যে, অতিরিক্ত মদ্য পানে ম্যাটিল্ডার মৃত্যু হয়েছে। এরই সাতদিন আগে ১৩ অক্টোবর ওয়াটারলু রোডে (Waterloo Road) এলিন ডনওয়ার্থ (Ellen Donworth) নামের ১৯ বছর বয়সী এক যৌনকর্মীকে ভয়ংকর মৃত্যুযন্ত্রণারত অবস্থায় হাসপাতালে নিতে দেখা গিয়েছিল। মেয়েটি যাত্রাপথেই মারা যায়। মারা যাওয়ার আগে সে বলেছিল যে আগের রাতে সামান্য লক্ষ্মীটেরা চোখের এক লম্বা লোক তাকে এক বোতল সাদা তরল ওষুধ দিয়েছিল পান করতে এবং বলেছিল তার চর্মরোগ নিরাময় করবে। লোকটি সোনালি চশমা ও সিল্কের হ্যাট পরা ছিল এবং তার বেশ ঘন মোছ ছিল। মেয়েটির পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা যায় স্ট্রিকনিনের বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে।

নিল তার দুই-দুইটি খুনের সন্দেহ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য এক আগ্রহী পত্র ব্যবহারকারীকে সামনে আনে। এটিই যে তার কর্মকৌশল ছিল তা বুঝতে ব্রিটিশ পুলিশের অনেক সময় লাগে। সে লর্ড রাসেল (Lord Russell) এবং ডা. উইলিয়াম ব্রডবেন্টের (Dr. William Broadbent) কাছে উড়োচিঠি পাঠায় এবং সেখানে ম্যাটিল্ডার মৃত্যুর জন্য তাদের দায়ী করে। ডা. উইলিয়ামকে সে হুমকিও দেয় যে তাকে ২৫০০ পাউন্ড না দিলে প্রমাণসহ পুলিশকে সব জানিয়ে দিবে। বার বার উড়োচিঠিতে বিরক্ত হয়ে ডা. উইলিয়াম শেষ পর্যন্ত পুলিশের শরণাপন্ন হন। পুলিশ উড়োচিঠির লেখককে ধরার জন্য ফাঁদ পাতে। কিন্তু সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। নিল এরপর করোনারের কাছে চিঠি পাঠিয়ে বলে যে, সে এলিনের খুনির নাম-ঠিকানা জানে। সে ৩ লাখ পাউন্ডের বিনিময়ে এই তথ্য বিক্রি করার প্রস্তাব দেয়। চিঠিতে সে নিজেকে একজন গোয়েন্দা বলে পরিচয় দেয় এবং নাম বলে জি.ও ব্রায়ান (G.O'Brian) । পুলিশ তাদের ডায়েরিতে এ ঘটনা সংক্ষেপে লিখে রাখে মাত্র, কোনো তদন্ত করার প্রয়োজন বোধ করেনি। এসব চিঠি লিখার কারণ আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী বলে যে, নিল বড় অংকের টাকার কথা বলে খুনগুলোকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর করতে চেয়েছিল এবং তার কর্মকাণ্ডকে মানুষের মনে গেঁথে দিতে

চেয়েছিল। এটি সত্যি যে নিল কখনই কোথাও টাকা নেওয়ার জন্য যেত না শুধু চিঠিতেই লিখত। অনেকে আবার বলত যে, তার হয়তো ইচ্ছা ছিল চাঞ্চল্যকরভাবে গ্রেপ্তার হয়ে সবার কাছে পরিচিত ও আলোচিত হওয়ার। হয়তো সে এটা মনে রেখেছিল যে, জ্যাক দ্য রিপার এরকম চিঠির মাধ্যমেই তার সন্ধানকারীদের তীব্র কটাক্ষ করত।

নিল ১৮৯২ সালের জানুয়ারিতে কানাডায় ফিরে আসে। এর মধ্যে সে আরও একটি বিয়ে করে তার স্ত্রীর নাম ছিল লরা স্যাবাতিনি (Laura Sabbatini)। কানাডায় ফেরার পথে জাহাজে সে বেশ কয়েকজন যাত্রীর কাছে গর্ব করে তার জীবন, অবৈধ সম্পর্ক, যৌনজীবন সম্পর্কে বলছিল। এমনকি সে কীভাবে কোন বিষ ব্যবহার করে মেয়েদের হত্যা করত তাও বলত। হত্যার সময় সে নকল মোছ পরত যেন কোনোভাবে তার আসল পরিচয় ফাঁস না হয় এর কোনো কিছুই সে বাদ রাখেনি। কানাডায় এসে কোনো আপাত কারণ ছাড়াই সে ৫০০টি পোস্টার ছাপায়। পোস্টারগুলো ছিল নিম্নরূপ–

"এলিন ডনওয়ার্থের মৃত্যু"

মেট্রোপোল হোটেলের বাসিন্দাদের উদ্দেশে বলছি, ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, গত ১৩ অক্টোবর যে ব্যক্তি এলিন ডনওয়ার্থকে বিষপ্রয়োগ করে সে এই হোটেলের একজন কর্মচারী এবং আপনাদের জীবন আশঙ্কামুক্ত নয় যতক্ষণ আপনারা এখানে অবস্থান করছেন।

একান্ত শ্রদ্ধাসহকারে
ডব্লিউ এইচ মুর্যে
(W.H Muray)
লন্ডন, এপ্রিল, ১৮৯২.

কেনইবা সে মেট্রোপোল হোটেলের নাম লিখল এবং কেনইবা পোস্টারগুলো সেখানে বিলানো হয়নি তা জানা যায়নি। এরপর সে নিউইয়র্কে চলে যায়। মার্চের ২০ তারিখ সে লিভারপুলের (Liverpool) উদ্দেশে নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ১১ এপ্রিলেই আবার ল্যামবেথে ফেরত আসে। সেখানে সে একসাথে দুজন যৌনকর্মীকে নিয়ে রাত কাটায়। অবাধ ও নোংরা যৌনতার রেশ কেটে গেলে তার মধ্যে নিষ্ঠুর পৈশাচিকতা জেগে ওঠে। ১৮ বছর বয়সী এমা শ্রিভেল (Emma Shrivell) এবং ২১ বছর বয়সী এলিস মার্শকে (Alice Marsh) সে তিনটি করে বিষযুক্ত ট্যাবলেট দেয় এবং বলে যে এটি তাদের মুখের ব্রণ দূর করবে এবং গায়ের রং উজ্জ্বল করবে। হতভাগা মেয়ে দুটি সরলমনে তা গ্রহণ করে। একবারও তাদের অন্যান্য যৌনকর্মীদের বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর কথা মনে পড়েনি। নিলকে তারা ফ্রেড নামে চিনত এবং ওষুধ খাবার পর পরই সে তাদের

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সেই রাতেই ভয়ংকরভাবে মেয়ে দুটি মারা যায়। এ ঘটনার রায় ঘোষণার পর 'জ্যাক দ্য রিপারের' অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ শহরটিতে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যায়। আবারও দেখা যায় যে, মেয়ে দুটিকে স্ট্রিকনিন দিয়ে মারা হয়েছে। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে খুনিকে। এবারও নিল কোনো উড়োচিঠি না লিখে থাকতে পারল না। এবার সে চিঠি লিখল ড. হার্পার (Dr. Harper) নামক এক ব্যক্তিকে এবং তার ছেলে ওয়াল্টারকে (Walter) এমা ও এলিসের খুনের জন্য দায়ী করে। সে ১৫০০ পাউন্ড দাবি করে এই তথ্য গোপন রাখার জন্য। ওয়াল্টার একজন মেডিক্যাল ছাত্র ছিল সে নিলের বাসার পাশেই ল্যামবেথ প্যালেস রোডে (Lambeth Palace Road) থাকত। ডা. হার্পারের এই চিঠি দেখে ভয় পাবার কিছু ছিল না তাই সে সোজা পুলিশের কাছে যায়। এলিস ও এমার ঘরে নিলের দেওয়া একটি চিঠি পুলিশের সংগ্রহ ছিল। চিঠিতে তাদের দুজনকে ডা. হার্পার সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে তিনিই ম্যাটিল্ডা ও লো হার্ভির (Lou Harvey) মৃত্যুর জন্য দায়ী। ডা. হার্পারের কাছে আসা বেনামি চিঠি ও এলিস ও এমার কাছে আসা নিলের স্বনামে চিঠি দুটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে দুটি হাতের লেখা হুবহু এক রকম। অর্থাৎ দুটি একই ব্যক্তি লিখেছে। খোঁজাখুঁজি করতেই নিল ক্রিম নামের ব্যক্তিকে পাওয়া যায় ওয়াল্টারের পাশের বাড়িতে। ঘটনা পুলিশের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। মারাত্মক মিথ্যাচার ও হুমকির দায়ে নিলকে গ্রেপ্তার করা হয়। অপরদিকে খুব দ্রুত ম্যাটিলডার মৃতদেহ কবর থেকে খুঁড়ে বের করে পোস্টমর্টেম করানো হয়। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ডাক্তারের ডেথ সার্টিফিকেট ভুল ছিল এবং ম্যাটিল্ডার মৃত্যুর কারণ হলো স্ট্রিকনিন।

নিল অত্যন্ত সাহসী ও চালাক হতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিল। ম্যাটিল্ডার ডেথ সার্টিফিকেটে মদ্যপানজনিত কারণে সাধারণ মৃত্যু লেখা ছিল। কেউই জানত না যে তার খুন হয়েছে এটি একমাত্র খুনির পক্ষেই নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব। এছাড়া এলিজাবেথ মাস্টারস ও এলিজাবেথ মে নিলকে ম্যাটিল্ডার সাথে দেখেছিল। তারা দেখামাত্রই নিলকে চিনে ফেলেছিল ফলে ম্যাটিল্ডার মৃত্যুর দায় নিঃসন্দেহে নিলের ওপরই পড়ে। পুলিশ জানত যে তাদের হাতে শক্ত প্রমাণই আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে খটকা লাগে। কে এই লো হার্ভি ? তারা ৩ জুন নিলকে এসব হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার করে এবং লো হার্ভিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। যখন ব্রাইটনে (Brighton) লো হার্ভিকে খুঁজে পাওয়া যায় দেখা যায় যে সেই একমাত্র মেয়ে যে কিনা নিলের ভয়ংকর মৃত্যু ফাঁদকে ফাঁকি দিতে পেরেছিল। তার সাথে নিলের দেখা হয়েছিল ১৮৯১ সালের অক্টোবরে। তারা লন্ডনের সোহোতে (soho) এক রাত কাটায়। পরদিন ভোরে চলে যাবার আগে নিল তাকে তিনটি ওষুধ দেয় এবং বলে এগুলো খেলে তার কপালের দাগগুলো

চলে যাবে। তারা ঠিক করে যে সেদিনই সন্ধ্যায় তারা চ্যারিং ক্রস হোটেলের (Charing Cross Hotel) কাছে দেখা করবে। লুইস (Louis), যাকে সবাই আদর করে লো (Lou) ডাকত কখনো সেই ওষুধগুলো খায়নি। সে একজন যৌনকর্মী ছিল এবং তার মালিক কেন যেন সেই ওষুধগুলো দেখে পছন্দ করেনি। সে ওষুধগুলো ছুড়ে ফেলে দেয় এবং তাকে বলে দেয় যেন সে এসব ওষুধ না বুঝে না খায়। সন্ধ্যায় যখন তারা হোটেলের ডাইনিং হলে একসাথে বসে ছিল লুইসের মালিক তাদের দূর থেকে লক্ষ করছিল। নিল আবারও তাকে দুটি ওষুধ দেয় এবং তার সামনেই সেগুলো খেতে বলে। লুইস অনেক কষ্টে কৌশলে সেগুলো ফেলে দেয়। নিল একটু পর তার হাত পরীক্ষা করে হাত খালি দেখে নিশ্চিত হয় যে সে ওষুধ খেয়েছে। রাতের খাবার শেষ করে লুইস তাকে রাতে তার সাথে থাকার আহ্বান জানালে সে ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে চলে যায়। নিল নিশ্চিত ছিল সেই রাতেই লুইসের মৃত্যু হবে এবং সে তার যন্ত্রণা কাতর মুখ কল্পনা করে হাসতে থাকে। এরপর হঠাৎ এক মাস পরেই তাদের দেখা হয় পিকাডিলিতে (Piccadilly) এবং নিল তাকে জীবিত ও সুস্থ দেখে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে। লুইস তার সাথে কথা বলতে গেলে সে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থের মতোই বলে, "তুমি? তুমি এখানে কীভাবে? তুমি না ওষুধ খেয়েছিলে?" এরপর সে বলতে গেলে দৌড়েই সেখান থেকে চলে আসে।

লুইসের কাহিনিও নিলের মামলার দলিলে যোগ করা হলো। লুইস ও দুই এলিজাবেথের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে নিলের কাছে কোনো প্রমাণ ছিল না নিজেকে বাঁচানোর। ১৮৯২ সালের ১৭ অক্টোবর ওল্ড বেইলিতে (Old Bailey) তার মামলার শুনানি হয়। সেখানে ল্যামবেথের এক কেমিস্ট সাক্ষ্য দেয় যে নিল তার কাছ থেকে নাক্স ভমিকা (Nux Vomica) কিনেছিল, যা থেকে স্ট্রিকনিন তৈরি করা হয়, এটি একধরনের উদ্ভিদজাত পণ্য। এর সাথে সে কিছু জেলাটিন ট্যাবলেটও কিনে। ডাক্তার হিসেবে পরিচিত থাকায় তার বারবার এসব কেনার ব্যাপারটায় কেউ কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেনি। পুলিশ জানায় যে তার বাসায় সাত বোতল স্ট্রিকনিনও পাওয়া গিয়েছে। নির্দয় এই বিষ প্রয়োগকারীকে অপরাধী ঘোষণা করতে বিচারক মাত্র বারো মিনিট সময় নেন। কেউ একটুও সহানুভূতি অনুভব করেনি যখন এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই ঘৃণ্য পিশাচের জীবন একটি দড়ির সাহায্যে স্তব্ধ করা হয়। ফাঁসি হয় ভয়ংকর খুনি নিল ক্রিমের।

নিলের নামে দু'ধরনের দাবি তাকে জনগণের সামনে বেশ কিছুদিন ধরে রাখে। মৃত্যুর সাথে সাথেই তার নাম মুছে যায়নি। 'দ্য টাইমস' (The Times) পত্রিকায় একটি অসাধারণ চিঠিতে নিলের চক্ষুরোগ চিকিৎসক লেখেন যে নিলের নৈতিক পতনের অন্যতম কারণ হলো তার টেরা চোখ। যদি তার চোখকে ছোটবেলায়ই চিকিৎসা করে ঠিক করা হতো তাহলে তার নৈতিকতার একটা

অবক্ষয় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হতো। দ্বিতীয়টি হলো স্যার এডওয়ার্ড মার্শাল হলের (Sir Edward Marshall Hall) দাবি যে, অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে (Sydney, Australia) কারাগারে থাকাকালীন নিলের পক্ষে তিনি একটি দ্বিপত্নীকরণ (Bigamy) মামলায় জিতেছেন। খোঁজ নিয়ে সিডনির সেই কারাগারের গভর্নরের কাছ থেকে জানা যায় যে সেখানে প্রায় হুবহু নিলের মতো দেখতে একজন আসামি আসলেই ছিল। তবে এটাও প্রমাণিত হলো যে নিল কখনো অস্ট্রেলিয়া যায়নি তখন মার্শাল হল নিশ্চিত হলেন যে এই বিষপ্রয়োগকারী খুনির একটি হুবহু দেখতে সহচর ছিল এবং এরা একে অপরের এলিবাই (Alibi; অন্যত্রস্থিত; অপরাধ সংঘটনকালে অন্যত্র থাকার অজুহাত) এর কাজ করত। কোনো কোনো লেখক এও বলেছেন যে নিলের সদৃশ এই ব্যক্তি হয়তো আসল 'জ্যাক দ্য রিপার'। অনেকে আবার এটাও বলেন যে নিল ও 'জ্যাক দ্য রিপার' একই ব্যক্তি। এমনকি নিল নিজেও ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছিল যে সেই 'জ্যাক দ্য রিপার'। তবে এটি প্রমাণিত হয় যে নিল 'জ্যাক দ্য রিপার' নয়। কেননা, 'জ্যাক দ্য রিপারের ত্রাসের রাজত্বকাল, ১৮৮৮ সালে নিল শিকাগোর জুলিয়েট কারাগারে (Joliet Prison) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা খাটছিল। নিলের মতো ঘৃণ্য ভয়ংকর ব্যক্তি ছিল সমাজের বিষধর সাপের মতো। ফাঁসিমঞ্চে তার কাহিনির অবসান ঘটলেও তার আদর্শ 'জ্যাক দ্য রিপার' আজও এক রহস্য।

কট বাই আ নিউ ইনভেনশন

খুনের ইতিহাসে ডা. হাউলি হার্ভি ক্রিপেনের (Dr. Hawley Harvey Crippen) চেয়ে কুখ্যাত হয়তো আর কেউ ছিল না। ক্রিপেন মাত্র একবারই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল কিন্তু তিনটি সর্বনাশা ভুল না করলে হয়তো সে পালিয়ে বেড়াতে পারত। শান্ত স্বভাবের জ্ঞানী ও নম্র মানুষটির সর্বত্রই ছিল আভিজাত্যের ছোঁয়া। সদয় ও নিরীহ ব্যক্তি হিসেবেই বন্ধুমহলে ছিল পরিচিত ও প্রতিবেশীদের কাছে সম্মানিত। তার এসব গুণ বরং তার ভয়ংকর অপরাধের আতঙ্ককে ত্রাসে পরিণত করেছিল।

ক্রিপেনের জন্ম হয় মিশিগানের কোল্ডওয়াটারে (Michigan, Coldwater) ১৮৬২ সালে। তার শৈশব সেখানেই কাটে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে পড়া শুরু ক্লিভল্যান্ডে (Cleveland) এবং কঠিন অধ্যবসায়ের মাধ্যমে পরবর্তীতে ওহাইয়ো (Ohio), লন্ডন (London) ও নিউইয়র্ক (New York) থেকে বিভিন্ন ডিগ্রি লাভ করে। পড়াশোনার পিছে তার বহু সময় ও শ্রম ব্যয় করার পর শেষ পর্যন্ত আমেরিকাতেই বসবাস শুরু করে। আমেরিকার বড় বড় শহরে হাতযশ করার পর সে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে (Brooklyn) আসে। তার বয়স তখন ৩১ বছর এবং এরই মধ্যে বিপত্নীকও হয়ে গিয়েছিল, ব্রুকলিনের এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের সহযোগী হিসেবে সে কাজ করছিল তখন। এখানেই তার পরিচয় হয় ১৭ বছর বয়সী এক রোগীর সাথে। মেয়েটি তার নাম বলে কোরা টার্নার (Cora Turner)। প্রাণোচ্ছল, আকর্ষণীয় মেয়েটি বিবাহিত ছিল। তার স্বামী স্টোভ তৈরির কারখানায় বেশ ভালো চাকরি করত। মেয়েটি তখন গর্ভবতী ছিল এবং দুঃখজনকভাবে তার গর্ভস্রাব (Miscarriage) হয়। এরপর তার সংসারে বেশ দুর্গতি নেমে আসে। এমন পরিস্থিতিতেও ক্রিপেন মেয়েটিকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলে এবং ধীরে ধীরে তার মন জয় করার চেষ্টা করতে থাকে। সে শীঘ্রই জানতে পারে, মেয়েটির আসল নাম কুনিগান্ডে ম্যাকামোৎজকি (Kunigunde Mackamotzki), তার বাবা রাশিয়ান ও মা জার্মান এবং মেয়েটি ওপেরা গায়িকা হতে চায়। ক্রিপেন তাকে গানের প্রশিক্ষণে ভর্তি করিয়ে দেয়। যদিও সে জানত যে তার প্রতিভার চেয়ে তার স্বপ্নটিই বড়।

তবুও সে গানের ক্লাসের সব খরচ দেয়। ১৮৯৩ সালে ক্রিপেন মেয়েটিকে বিয়ে করে।

১৯০০ সালে ক্রিপেন মানিয়ন (Munyon) নামে এক ওষুধ প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিল। তাকে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শাখার ম্যানেজার হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে লন্ডনে বদলি করা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে লন্ডনে চলে যেতে হয়। কোরা বছরের শেষে লন্ডনে তার কাছে যায়। সেখানে সে সিদ্ধান্ত নেয় ওপেরা গায়িকার পেশা ছেড়ে সে বড় বড় মিউজিক হলের অনুষ্ঠানে গান করবে। সে এখানে নতুন নাম নেয় বেলি এলমোর (Belle Elmore) এবং তার সাথে ক্রিপেনও ছদ্মনাম নেয় পিটার (Peter)। কোরা সেখানে একদল ভবঘুরে সঙ্গী জুটিয়ে ছিল যারা তাকে বেশ প্রভাবিত করা শুরু করে। সে সবসময় জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরত, চুলে ব্লিচ করে সোনালি করে ফেলেছিল, সবসময় সোনালি কোঁকড়ানো লম্বা পরচুলা পড়ে থাকত। সে ছিল অত্যন্ত বহির্মুখী ও দিন দিন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, বিশেষভাবে পুরুষ সমাজে। তার স্বামী ক্রিপেন তার সোনালী চশমার ফাঁক দিয়ে স্ত্রীর চারপাশে জমকাল সামাজিক উত্তেজনা উপভোগ করত। সে আকারে ছোটখাটো হওয়ায় মাঝে মাঝে সুদর্শন পুরুষদের মাঝে হীন বোধ করত, তার চেহারা নজরে পড়ার মতো বস্তু বলতে ছিল তার অস্বাভাবিক বড় গোঁফ। সে প্রায়ই তার স্ত্রীর বন্ধুদের সামনে নিজেকে জাহির করার উদ্দেশে তাকে দামি পশমী কোট অথবা গহনা উপহার দিত। এই জাঁকজমকতার আড়ালে তাদের সংসারের জীর্ণতা ঢাকা পড়ে থাকত। তাদের কারোই গৃহস্থালির দিকে কোনো নজর ছিল না এবং নজর দেওয়ার ইচ্ছাও তাদের ছিল না। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন থালা ও পাত্র ছড়ানো ছিটানো বিবর্ণ রান্নাঘর, ময়লা কাপড়ের স্তূপ এবং দু'টি বিড়াল যাদের কখনই বের করা হতো না–এই ছিল তাদের সংসার। এসব নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথাও ছিল না। আপাত দৃষ্টিতে যাই সুখ বাকি ছিল তাদের বৈবাহিক জীবনে তাও শেষ হয়ে যায় যখন ক্রিপেনকে চিকিৎসার কাজে ফিলাডেলফিয়াতে (Philadelphia) যেতে হয়। কয়েকমাস পর সে বাড়ি ফেরার পর কোরা তাকে জানায় যে, সে ব্রুস মিলার (Bruce Miller) নামক এক আমেরিকান গায়কের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। সে এও বলে যে, তারা একে অপরকে অত্যন্ত পছন্দ করে। তাই সে ক্রিপেনের সাথে সংসার করতে ইচ্ছুক নয়।

১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বরে ক্রিপেন উত্তর লন্ডনের ক্যামডেন রোডের থেকে একটু দূরে ৩৯ হিলটপ ক্রিসেন্টে (39 Hilltop Crescent, off Camden Road, North London) বাস করা শুরু করে। সেটি ছিল সুন্দর সুন্দর ভিক্টোরিয়ান দালানে সজ্জিত গাছপালা সমৃদ্ধ সবুজ এলাকা, যেখানে তার বাড়ির বার্ষিক ভাড়া ছিল ৫২ পাউন্ড ১০ সেন্ট। ক্রিপেনের সাপ্তাহিক আয় ছিল ৩ পাউন্ড, তার

খুনি ডাঃ হাউলি হার্ভি ক্রিপেন

বার্ষিক আয়ের বেশ বড় অংক চলে যেত তার অভিজাত বাড়িটির ভাড়া দিতে গিয়ে। তবে নতুন সুন্দর বাড়ি তার সংসারের অশান্তি দূর করতে পারেনি। ক্রিপেন তার স্বীকারোক্তির এক পর্যায়ে বলে, 'যদিও আমরা বেশ সুখেই ছিলাম, তবু মাঝে মাঝে সে প্রচণ্ডভাবে রেগে যেত। প্রায়ই আমাকে হুমকি দিত যে, সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তার এক প্রেমিক আছে যার কাছে সে চলে যাবে এবং আমার সাথে সব শেষ করে দিবে। তার যখন ইচ্ছা বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যেত এবং যখন ইচ্ছা তখন ফিরত। আমি যতটা না দুর্দশাগ্রস্ত ছিলাম তার চেয়ে বেশি ছিলাম নিঃসঙ্গ। খুব শীঘ্রই আমরা আলাদা আলাদা ঘরে ঘুমানো শুরু করলাম।'

মিউজিক হলো লেডিজ গিল্ড (Music Hall Ladies Guild) নামের এক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাজে কোরা নিজেকে ব্যস্ত রাখা শুরু করল। সেখানে সে খুব বড় তারকা সেজে এই পেশায় সুযোগহীনদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করত। তার একাধিক প্রেমিক ছিল যাদের কাছ থেকে সে দামি দামি উপহার ও টাকা নিত। ক্রিপেনও তার জীবনে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিল। সে ছিল এথেল লা নিভ (Ethel Le Neve), মানিয়ন প্রতিষ্ঠানের নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রিটের (New Oxford Street) নতুন শাখার এক কর্মচারী। সৌন্দর্যের দিক থেকে সে কোরার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। শান্ত নারীসুলভ মেয়েটির একমাত্র আকাঙ্ক্ষাই ছিল সম্মান অর্জন। তাকে সঙ্গ দিতে রাজি করাতে ক্রিপেনকে তার সর্বোচ্চ সম্মোহনি

ক্ষমতা ব্যবহার করতে হয়েছিল। বহু অনুনয়-বিনয়ের পর সে ক্রিপেনের সাথে বিচক্ষণভাবে অভিসারে রাজি হয়। তাকে ক্রিপেন একটি অভিজাত হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল। ক্রিপেন সবসময় এথেলের স্বপ্নে বিভোর থাকত যা তাকে প্রশান্তি দিত ঠিকই কিন্তু তার সংসারের অবস্থা এতে আরও খারাপ হয়ে যায়। কোরা তাদের বাড়িতে পেইং গেস্ট রাখা শুরু করে। শুধু তাই নয়, সে ক্রিপেনকে দিয়ে তাদের কোট রাখা, বুট পরিষ্কার করা, ধূমপানের কয়লা এনে দেওয়া এমনকি খাবারের পাত্রও পরিষ্কার করাত। দিন দিন তার জীবন অসহনীয় হয়ে উঠছিল। ক্রিপেনের একটি ডেন্টাল ক্লিনিকে বেশ কিছু টাকা দেওয়া বাকি ছিল। এদিকে দু'জন মহিলার খরচ সামলানো তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ছিল। দুশ্চিন্তায় ও অশান্তিতে তার কাজে মনোযোগ থাকত না। এর ফলস্বরূপ ১৯০৯ সালের নভেম্বরে সে তার মানিয়নের চাকরি হারায়। পরের মাসেই কোরা ব্যাঙ্ককে তাদের যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১২ মাসের মধ্যে ৬০০ ডলার উঠিয়ে নেয়ার নোটিশ দেয় এবং একাজের জন্য স্বামীর সম্মতির প্রয়োজন বোধ করেনি। সে ক্রিপেনের সাথে এথেলের সম্পর্কের কথা জানত এবং তার বন্ধুমহলে বলে বেড়াত যে, ওই মেয়েকে ত্যাগ না করলে সে ক্রিপেনকে ছেড়ে চলে যাবে।

১৯১০ সালের ১৭ জানুয়ারি ক্রিপেন তার অফিসের নিকটবর্তী এক পরিচিত ওষুধের দোকান থেকে পাঁচ দানা হাইয়োসাইনের (Hyoscine) ফরমায়েশ করে। এই ওষুধটি অত্যন্ত শক্তিশালী চেতনানাশক যা সাধারণত মানসিক ও শারীরিক বেদনা উপশমে ব্যবহৃত হতো। তৎকালীন ব্রিটেনে এর ব্যবহার ছিল বস্তুত অজানা। দোকানির কাছে তখন একটুও হাইয়োসাইন মজুদ ছিল না। সে দু'দিন পর ক্রিপেনের কাছে তা পৌঁছে দেয়। ক্রিপেন ওষুধগুলো চেতনানাশক হিসেবেই ব্যবহার করেছিল যার স্থায়ীত্ব হয়ে যায় চিরকাল।

জানুয়ারির ৩১ তারিখ সে তার স্ত্রীর দু'জন অবসরপ্রাপ্ত গায়ক-গায়িকা অতিথিকে বেশ সমাদর করে। নৈশভোজ ও তাস খেলার সময় সে তাদের বেশ চিত্তবিনোদনও করে। তার স্ত্রীর বান্ধবী ক্লারা মার্টিনেটি (Clara Martinetti) বলে, 'আজকের সন্ধ্যাটি ছিল চমৎকার এবং বেলিকে বেশ হাসিখুশি লাগছে।' রাত দেড়টার দিকে ক্লারা ও তার স্বামী পল (Paul) প্রস্থান করে। ক্রিপেনের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এর পরের ঘটনাটি মোটেও আমোদপূর্ণ ছিল না। অতিথিরা চলে যাবার সাথে সাথেই কোরা রাগে ফেটে পড়ে এবং পরদিনই বাড়ি ছেড়ে দেবার হুমকি দেয়। সে বলেছিল যে, ক্রিপেন তার অতিথি পলকে উপর তলায় শৌচাগারে নিজে পৌঁছে দিয়ে না আসায় তার অপমান হয়েছে এবং এটিই তার রাগের কারণ। সেদিনই ছিল কোরার সে বাড়িতে শেষ দিন। সে রাতের পর কেউ তাকে জীবিত দেখেনি। পরদিনই সে কোরার কিছু আংটি ৮০ পাউন্ডে বন্ধক রাখে। ফেব্রুয়ারির ২ তারিখ সে এথেলকে দিয়ে মিউজিক হলে লেডিস গিল্ডে

একটি চিঠি পাঠায়। তাতে লেখা ছিল যে, তাদের কোষাধ্যক্ষা বেলি এলমোর পরবর্তী কয়েকটি সভায় উপস্থিত হতে পারবে না। তাকে জরুরি তলবে এক মৃত্যুপথযাত্রী আত্মীয়কে দেখতে আমেরিকা যেতে হয়েছে। ফেব্রুয়ারির ৯ তারিখ সে কোরার আরও কিছু গহনা ১১৫ পাউন্ডে বন্ধক রাখে। খুব শীঘ্রই কোরার বন্ধুরা তার বেশিরভাগ গহনা ও পোশাক এথেলের পরনে দেখতে পেল। এমনকি সে গিল্ডের বল নাচের অনুষ্ঠানে কোরার পোশাক ও দামি ব্রোচ পরে ক্রিপেনের সঙ্গী হিসেবে গিয়েছিল। তারা ক্রিপেনের কাছে বেলি এলমোরের কথা জানতে চাইলে শুধু দুঃসংবাদ পেতে থাকে এবং দিন দিন তার তীব্রতা বেড়েই চলছিল। প্রথমে সে বলে যে, সে বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার (California) পাহাড়ি অঞ্চলে থাকার কারণে তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এরপর বলে যে, সে সাংঘাতিকভাবে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। মার্চের ২৪ তারিখ ক্রিপেন বেলার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ক্লারার কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে এথেলের সাথে পাঁচ দিনের ভ্রমণে ডিপেতে (Dieppe) চলে যায়। টেলিগ্রামে লেখা ছিল, ' বেলি গতকাল সকাল ছয়'টায় মারা গেছে।' এর দু'দিন পর স্থানীয় দ্য এরা (The Era) ম্যাগাজিনে বেলির মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়। ক্রিপেনের কাছ থেকে জানা যায় যে, তার দেহ আমেরিকাতেই দাহ করা হয়েছে।

ক্রিপেনের স্ত্রী কোরা

এদিকে এথেল ক্রিপেনের বাড়িতে হাউজকিপার হিসেবে চাকরি নেয় এবং সেখানেই থাকা শুরু করে। তার সাথে সে একজন ফ্রেঞ্চ পরিচারিকা এনেছিল যে বাড়ির সব কাজ করত। এথেল তার নিজের বাড়িওয়ালিকে বলেছিল যে, ক্রিপেনের স্ত্রী আমেরিকা গিয়েছে। যেহেতু সে নিশ্চিত ছিল যে সে আর ফিরবে না তাই এথেল তার বেশিরভাগ পোশাকই রেখে এসেছিল কোরার পোশাক ও অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করার আশায়। কিছুদিন পর ক্রিপেন তার বাড়িওয়ালাকে নোটিস দেয় যে সে অচিরেই বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। তবে কোরার মৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্নের চাপ কমে যাওয়াতে সে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নোটিসের স্থায়ীত্বকাল বাড়ায়। এ ব্যাপারে সে বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছিল। কিন্তু নিয়তি আঘাত হানল ২৮ জুনে। কোরার বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ন্যাশ (Nash) দম্পতি সম্প্রতি আমেরিকান থিয়েটারগুলো ভ্রমণ করে ফিরেছিল। তারা ক্রিপেনকে বলে যে, ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকা অবস্থায় তারা কোরার মৃত্যুসংবাদ পায়নি। ক্রিপেনের উত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে তারা পুলিশের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এথেলের সাথে সম্পর্কের কথা তারাও জানত, যা তাদের সন্দেহের উদ্রেক করে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের (Scotland Yard) এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাদের বন্ধু ছিল, ন্যাশ দম্পতি এ ব্যাপারে তার সহায়তা কামনা করে।

কোরার মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়। জুলাইয়ের ৮ তারিখ, শুক্রবারে চিফ ইন্সপেক্টর ওয়াল্টার ডিউ (Chief Inspector Walter Dew) এবং একজন সার্জেন্ট ক্রিপেনের অফিসে ফোন করে। তারা কোরার মৃত্যু সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে এবং জানতে চায় তার কাছে কোনো ডেথ সার্টিফিকেট আছে কিনা। ক্রিপেন তাদের সাথে সরাসরি দেখা করতে চায়। তার চেম্বারের নিকটবর্তী রেস্তোরাঁর এক নির্জন কোনায় সে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অফিসারদের সাথে কথা বলে। পুরোটা সময়ই সে কথা বলে যাচ্ছিল শুধু খাবার সময় বিরতি নেয়। সে তাদের কাছে স্বীকার করে যে, কোরার মৃত্যুসংবাদটি মিথ্যা। শুধুমাত্র তার মর্যাদা ও খ্যাতি রক্ষার্থে তাকে এতকিছু সাজাতে হয়েছে। এরপর সে বলে যে, কোরা আসলে তার প্রেমিক ব্রুস মিলারের সাথে পালিয়ে আমেরিকা চলে গেছে। ব্রুসের সম্পর্কে সে একটি তথ্যই জানত যে, সে একজন আমেরিকান হলে মিউজিকের গায়ক। সে পুলিশকে সর্বাত্মক সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে সন্দেহ দূর করার জন্য তার বাড়িতে তল্লাশি নেওয়ার জন্য সাথে সাথে রাজি হয়ে যায়। ইন্সপেক্টর ডিউ মিসেস ক্রিপেনের সমস্ত পোশাক সুসজ্জিতভাবে রেখে যাওয়া দেখে বেশ ধাঁধাঁয় পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কোনো রকম বিশৃঙ্খলার চিহ্ন না পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়। তার সন্তুষ্টির কথা ক্রিপেন জানত না। এরপর সে যা করে তা তার সবচেয়ে বড় ভুল প্রমাণিত হয়। সে আতঙ্কিত হয়ে যায় ও এথেলকে রাজি করায় তার সাথে আমেরিকা গিয়ে নতুন জীবন শুরু করার জন্য। পরদিন

ভোরে সে তার ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে সব লেনদেনের হিসাব মেটাতে বলে। এরপর তাকে বাজারে পাঠায় কম বয়সী ছেলেদের উপযোগী কিছু কাপড় কিনতে। সেদিন দুপুরে ক্রিপেন ও এথেল ইয়োরোপের উদ্দেশে রওনা হয়। এর পরের সোমবার ইন্সপেক্টর ডিউ ক্রিপেনের বাড়িতে যায় জবানবন্দি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কিছু গৌণ তথ্য জানতে। কিন্তু তার বাড়ি সম্পূর্ণ খালি পেয়ে সে সাথে সাথে বুঝে ফেলে ঘটনা কী ঘটেছে এবং তৎক্ষণাৎ ক্রিপেনের বাড়ি গভীর তল্লাশির আদেশ দেয়। তল্লাশির দ্বিতীয় দিনের শেষ দিকে ডিউ নিজেই বাড়িটির কয়লা রাখার প্রকোষ্ঠের মেঝের একটি পাথর আলগা দেখে। সেখান থেকে পাথর সরিয়ে তার নিচে পাওয়া যায় মানুষের পচে যাওয়া মাংস, চামড়া এবং চুল। কিন্তু কোথাও কোনো হাড় খুঁজে পাওয়া যায়নি। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হাড়ের চিহ্ন না পেয়ে তারা সেই মাংস ও চুলই নিয়ে যায় দ্রুত ফরেনসিক পরীক্ষা করাতে। প্যাডিংটনের সেন্ট ম্যারি'স হসপিটালের (St. Mary's Hospital, Paddington) সেরা প্যাথলজিস্ট এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা সেগুলো পরীক্ষা করতে লেগে গেল। বেশ কষ্টসাধ্য পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ফলাফল পাওয়া গেল যে এগুলো দ্বিধাহীনভাবে নারীদেহের যে নিয়মিত তার চুল ব্লিচ করত। পেটের কাছের চামড়া পরীক্ষা করে সেখানে পূর্বে হওয়া অপারেশনের একটি স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায়। মিসেস ক্রিপেন, যে সেখানে বেলি নামে পরিচিত ছিল তার সাথে উভয় বৈশিষ্ট্যই মিলে। তার চুল ব্লিচ করার কথা সকলেই জানত এবং ঘনিষ্ঠ বান্ধবীরা অতীত গর্ভস্রাবের কারণে অপারেশনের চিহ্ন সম্পর্কে অবগত ছিল। সর্বশেষ তথ্যটিই ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর। মৃতের দেহাবশেষে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে হাইয়োসাইন যা অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে ১২ ঘণ্টায় মৃত্যু অবধারিত। জুলাইয়ের ১৬ তারিখ ডা. ক্রিপেনের ও এথেলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার আদেশ কার্যকর করা হয়। উভয়কেই হত্যা ও অঙ্গচ্ছেদের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়।

ক্রিপেনের আরও দু'টি ভুল ছিল। তা হলো সে কোরার হাড় থেকে মাংসগুলো কেটে, চেঁছে আলাদা করে ফেলেছিল এবং হাড়গুলো সম্ভবত তার রান্নাঘরের চুলায় পুড়িয়ে ফেলেছিল। এরপর সে অবশিষ্ট মাংসগুলো ভেজা কুইকলাইমে ডুবিয়ে রাখে। আতঙ্কে হয়তো সে ভুলে গিয়েছিল যে কুইকলাম ক্ষয়কর জারক হিসেবে শুধু শুকনো অবস্থায়ই কাজ করে। ভেজা কুইকলাইমে দেহাবশেষের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। আরও একটি ভুল ছিল দেহাবশেষগুলো মাটিচাপা দেওয়ার আগে তা একটি জ্যাকেটে প্যাঁচানো। জ্যাকেটেটির গায়ে সিল ছিল, 'শার্টমেকারস, জোনস ব্রাদার্স, হেলোওয়ে' (Shirtmakers, Jones Brothers, Holloway)। এরপরও সে রেহাই পেতে পারত কিন্তু তার তৃতীয় ও সবচেয়ে বড় ভুলের কারণে তা হয়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে, তার সবচেয়ে বড় ভুল ছিল পালানো।

কোরার দেহাবশেষের উদ্ধার হওয়ার পর ব্রিটিশ প্রেস ঘৃণা ও ধিক্কারে ফেটে পড়ে। ক্রোধের সাথে সেখানে আতঙ্কও ছিল জাগ্রত। তবে পালিয়ে বেড়ানো প্রেমিকযুগল তখনো অনুধাবন করতে পারেনি যে, সামনে কত বড় ঝড় আসছে। তারা দু'জন তখন ব্রুসেলসের রটারড্যামে (Rottedrdam, Brussels) ছিল। এরপর ২০ জুলাই তারা অ্যান্টওয়ের্প (Antwerp) ছাড়ে কিউবেকগামী (Quebec) এস এস মনট্রোস (SS Montrose) জাহাজে। এরমধ্যে ক্রিপেন তার গোঁফ কামিয়ে ফেলেছিল এবং চশমা পরা বন্ধ করে দিয়েছিল। সে জন ফিলো রবিনসন (John Philo Robinson) ছদ্মনাম ব্যবহার করে এবং ছেলেদের পোশাকে এথেলকে তার ১৬ বছর বয়সী পুত্র জনের ছদ্মনাম দেয়। তারা ভাবছিল যে, এভাবে তারা সুরক্ষিত কিন্তু তাদের ধারণা ভুল ছিল। জাহাজের কমান্ডার, ক্যাপ্টেন কেন্ডাল (Captain Kendall) হিলড্রপ ক্রিসেন্টের পৈশাচিক ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিল। সে এও দেখেছিল যে ডেইলি মেইল (Daily Mail) পত্রিকা খুনি যুগলের তথ্যের উপর ১০০ পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সে মি. রবিনসন ও তার ছেলের মধ্যে কিছু অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করল। তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক সংখ্যায় বার বার হাত ধরার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল যা পিতা-পুত্রের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নয়। তার পুত্র জনের খাওয়ার ধরনও ছিল মেয়েদের মতো এবং তার জামা তার শরীরের মাপ মতো ছিল না। তার সন্দেহ আরও গাঢ় হলো যখন রবিনসন তার ছেলেকে বাদাম ভেঙে দিচ্ছিল ও তার সালাদের অর্ধেক সাধছিল। সে বার বার পরীক্ষা করে দেখল যে রবিনসন নামের প্রতি লোকটি তেমন সাড়া দিচ্ছে না। তার সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সে এই যুগলকে কোনো কিছু আঁচ করতে দেয়নি। সে সমস্ত পত্রিকা তাদের চোখের আড়ালে রাখে এবং তাদের দু'জনকে তার টেবিলে খাবার আমন্ত্রণ জানায়। সেখানেও কথাবার্তার ফাঁকে সে তাদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। ভ্রমণ শুরু হওয়ার দু'দিন পর ক্যাপ্টেন তাদের জাহাজের নতুন বেতার প্রযুক্তির মাধ্যমে তার সন্দেহ প্রকাশ করে পুলিশের কাছে টেলিগ্রাফ করে। ২৩ জুলাই চিফ ইন্সপেক্টর ডিউ এবং তার সার্জেন্ট একদল পুলিশ নিয়ে লিভারপুল (Liverpool) থেকে লরেন্টিক (Laurentic) জাহাজে করে রওনা দেয়। লরেন্টিক ছিল অত্যন্ত দ্রুতগামী যা মন্ট্রোসের আগে আগেই কিউবেক পৌছে যাবে।

পরবর্তী ৮ দিন ক্রিপেন জাহাজের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখল এবং বেতারের বিস্ময়কর প্রযুক্তির প্রশংসা করতে লাগল। সে নিজেই যে এই প্রযুক্তির অধীনস্ত হয়েছে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। কেন্ডাল নিয়মিত বেতারের মাধ্যমে অপরাধীদের কর্মকাণ্ডের বিবরণী দিয়ে যাচ্ছিল পুলিশের কাছে। ৩১ জুলাই সকাল ৮টায় যখন মন্ট্রোস বন্দরে পৌছার আগেই চিফ ইন্সপেক্টর ডিউ পাইলটের ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত ছিল। তাকে কানাডিয়ান পুলিশ সহায়তা করছিল। লরেন্টিক থেকে সে

মন্ট্রোসে উঠে যখন জাহাজটি সেন্ট লরেন্সে (St. Lawrence) ছিল। তখনো কিউবেক পৌঁছতে প্রায় ১৬ ঘণ্টা বাকি। ক্যাপ্টেন কেন্ডালের সাথে দেখা করে সন্দেহভাজন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে সোজা ক্রিপেনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'শুভ সকাল ডা. ক্রিপেন। আমি চিফ ইন্সপেক্টর ডিউ।' ক্রিপেন শুধু আস্তে করে বলল, 'শুভ সকাল, মি. ডিউ।' এথেল তার কেবিনে বসে বই পড়ছিল। একইভাবে তার সাথে কথা বলা হলে সে আর্তচিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারায়। ডা. ক্রিপেন পরে বলেছিল, 'আমি দুঃখিত নই। আমার দুশ্চিন্তা অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল। তবে একথা বলে রাখা ভালো যে সে (এথেল) এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। আমি তাকে কখনো কিছুই জানাইনি। এথেল সম্পর্কে সে বলে 'গত তিন বছরে আমার জীবনে একমাত্র সুখ।'

ক্রিপেনকে গ্রেফতার ও তার বহিঃসমর্পণে তিন সপ্তাহের বেশি লাগেনি। আগস্টের ২০ তারিখ ডিউ তার অপরাধীদের নিয়ে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হলো। ডিউ নিজে ক্রিপেনের পাহারায় ছিল। জাহাজের অন্যান্য যাত্রীদের আতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করতে সে মি. ডয়েল (Mr. Doyle) এবং ক্রিপেন মি. নিল্ড (Mr. Nield) নামে ভ্রমণ করছিল। ক্রিপেন ও এথেলকে একে অপর থেকে আলাদা রাখা হয়েছিল। ক্রিপেনের অনুরোধে একদিন কিছু সময়ের জন্য যার যার কেবিন হতে একে অপরকে দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। লিভারপুল থেকে লন্ডন পর্যন্ত ক্রোধিত জনগণের ভিড় উপচে পড়ছিল ডা. ক্রিপেনকে দেখার জন্য। এতটা জঘন্যভাবে হত্যার দায়ে তার কঠোর শাস্তির দাবি করে রাগে ফেটে পড়ে জনগণ। ডা. ক্রিপেনকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং এথেলকে তার সাহায্যকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। তাদের দু'জনের মামলার শুনানি আলাদা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

যদিও ক্রিপেন জানত যে তার কাছে আত্মরক্ষার কিছু নেই, সে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করল। ১০ অক্টোবরে ওল্ড বেইলিতে তার মামলার শুনানি শুরু হওয়ার সাতদিন আগে মিসেস ক্রিপেনের দেহাবশেষ ফিঞ্চলেতে (Finchley) কবরস্থ করা হয়। ডা. ক্রিপেন তার পরও বলছিল যে, সেগুলো তার স্ত্রীর নয় এবং ১৯০৫ সালে সে বাড়িটিতে আসার আগে থেকেই তা আছে। তবে এক্ষেত্রে যে জ্যাকেটটি দিয়ে দেহাবশেষ ঢাকা ছিল সেই দোকানি সাক্ষী দেয়। সে তার হিসাবের খাতা দেখিয়ে বলে যে, এই ধরনের জিনিস তার কাছে ১৯০৮ সালের আগে আসেনি। সেখান থেকে ক্রিপেনেরও নাম পাওয়া যায়। সে ১৯০৯ সালে জানুয়ারিতে এটি কিনেছিল। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, সে যদি কোরার হত্যা নাই করে থাকে তবে তার স্ত্রী নিরুদ্দেশ হওয়ার পর পরই কেন তার খোঁজ করেনি। ১ ফেব্রুয়ারিতে কেউ তাকে ঘর থেকে বের হতে দেখেনি। কেনইবা সে তার স্ত্রীর গহনা বন্ধক রেখে টাকা নিচ্ছিল? বাকি গহনা ও পোশাক তাহলে

এথেলকে কেন দিয়েছিল? এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি ডা. ক্রিপেন। যখন ব্রুস মিলারকে আদালতে হাজির করা হয় সে বলে যে, বর্তমানে সে বিবাহিত এবং শিকাগোতে এস্টেট এজেন্ট হিসেবে চাকরি করে। সে কোরার সাথে গান গেয়েছিল বেশ কয়েকবার কিন্তু তার সাথে প্রেমের সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। সে বলে ১৯০৪ এর পর তার কোরার সাথে দেখা হয়নি। সবকিছুই ক্রিপেনের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল। শুনানির পঞ্চম দিন ২৭ মিনিটের বিরতির পর বিচারকেরা তাকে দোষী ঘোষণা করে। লর্ড চিফ জাস্টিস অ্যালভারস্টোন (Lord Chif Justice Alverstone) তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ক্রিপেন তখনো শক্তভাবে বলে, 'আমি এখনও প্রতিবাদ করছি। আমি নির্দোষ।'

বিস্ময়ের বিষয় হলো এটি যে ক্রিপেন আত্মরক্ষায় কোনো আইনজীবী নিযুক্ত করার ও কোনো বর্ণনা উত্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে কারণ এতে এথেলের সাজা মওকুফ হবে। প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার এডওয়ার্ড মার্শাল হল (Edward Marshall Hall) উত্থাপিত করল যে, 'ডা. ক্রিপেন তার অস্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত স্ত্রীকে তার ওপর চাহিদাকে শান্ত করার উদ্দেশে তাকে হাইয়োসাইন দেয়, কেননা সে তখন এথেলের সাথেও শারীরিক সম্পর্কে জড়িত ছিল। হাইয়োসাইনের অত্যধিক মাত্রা সেবনের ফলে কোরার মৃত্যু হয়।' তবে এই বর্ণনার সত্যতা অস্বীকার করে ডা. ক্রিপেন বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। কেননা যদি দুর্ঘটনামূলকভাবেই মৃত্যু হয়ে থাকে তবে মৃতদেহটি এভাবে কেটে ফেলার কারণ কী হতে পারে? কেনই বা হাড়গোড় আলাদা করে তা লুকিয়ে রাখা হবে? ক্রিপেনের উৎকণ্ঠা ছিল শুধু মামলা থেকে এথেলের নাম মুছে দেওয়া নিয়ে। ২৫ অক্টোবর ওল্ড বেইলিতে এথেলের মামলার শুনানি হয়। তার পক্ষের আইনজীবী এফ ই স্মিথের (F.E. Smith) তুখোড় উপস্থাপনে শেষ পর্যন্ত এথেলকে মুক্তি দেওয়া হয়। স্মিথ জুরিকে জিজ্ঞাসা করে যে, ক্রিপেন যে তার খুনের সকল চিহ্ন এথেলের কাছ থেকে লুকাতে চাইবে এটা তারা বিশ্বাস করে কিনা। কেউ কি কোনো যুবতি নারীর মনে এ ধরনের ভয় ও ঘৃণা সৃষ্টি করার ঝুঁকি নিয়ে বলবে, 'এভাবেই আমি সেই নারীর সমাদর করি, যে আমার সাথে সংসার করেছে এবং আমি এখন তোমাকে আমার সাথে সংসার করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।' এরপর এথেলকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়।

তবে এথেল তার প্রেমিকাকে ছেড়ে যায়নি। ক্রিপেনের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতিদিন তাকে একপলক দেখার জন্য অপেক্ষা করেছে। আর ক্রিপেন মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত শুধু এথেলের চিন্তাই করেছে। বার বার নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছে। তার দিন কাটত এথেলের ছবিতে চুম্বন করে ও তাকে দীর্ঘ আবেগময় প্রেমপত্র লিখে। সে একটি জবানবন্দিতে বলে, 'আমি এখন পরকালের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি, আমি বলতে চাই যে, এথেল লা নিভ আমাকে এমনভাবে

ভালোবেসেছে যা পৃথিবীর খুব কম নারীই কোনো পুরুষকে দিতে পারে। এমন ভালোবাসা আমার জন্য নিঃসন্দেহে পুরস্কারস্বরূপ।'

ডা. ক্রিপেন, যার নাম তখন মৃত্যুর সমার্থক হয়ে গিয়েছিল তাকে ১৯১০ সালের ২৩ নভেম্বর পেন্টোনভিল প্রিজনে (Pentonville Prison) ফাঁসি দেওয়া হয়। তার শেষ ইচ্ছা ছিল যেন তাকে এথেলের ছবি ও চিঠিগুলো সহকারে কবরস্থ করা হয় এবং তাই করা হয়েছিল। কারাগারে যারাই তার নিকটবর্তী হতে পেরেছিল সকলেরই এই চুপচাপ ছোটখাটো মানুষটির প্রতি এক কৌতূহলী মায়া জন্মেছিল। এফ ই স্মিথের ভাষায়, 'সে একজন সাহসী পুরুষ ও প্রকৃত প্রেমিক।'

এথেল লা নিভ ক্রিপেনের মৃত্যুর পর পরই দুর্বোধ্যতায় হারিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তার কী হয়েছিল তা আজও অস্পষ্ট। কেউ বলে সে অস্ট্রেলিয়া চলে গিয়েছে এবং সেখানেই ১৯৫০ সালে মৃত্যুবরণ করেছে। অনেকে বলে, সে কানাডা বা আমেরিকায় আছে। কেউ বলে যে, প্রায় ৪৫ বছর ধরে সে ছদ্মনামে বোর্নমাউথের (Bournemouth) কাছে একটি চায়ের দোকান চালায়। এমন গুজবও রটেছে যে, সে তার ও ক্রিপেনের প্রণয়ের কাহিনি বিস্তারিত লিখেছে যেন তা তার মৃত্যুর পর ছাপানো যায়। তবে এসব ধারণা ততখানিই অস্পষ্ট যতটা সাংঘাতিক তাদের কিংবদন্তি প্রেম যা একজন শান্ত স্বভাবের প্রেমিককে পৃথিবীর সবচেয়ে পৈশাচিক খুনিতে পাল্টে দিয়েছে।

দ্য বোস্টন স্ট্র্যাঙ্গলার

তখন ১৯৬২ সাল। জুনের একটি অসহনীয় ভ্যাপসা গরম রাত্রে হঠাৎ পুলিশকে ডাকা হলো বোস্টনের (Boston) কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি ভগ্নপ্রায় দুর্বল বাড়িতে। বাড়িটির একটি ঘরে একজন যুবতির লাশ পাওয়া গিয়েছিল। প্রায় বিবস্ত্র নিথর দেহটি বেশ অশ্লীল ভঙ্গিমায় বিছানার উপর পড়ে ছিল। মেয়েটিকে তারই একটি মোজার সাহায্যে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। মোজাটি তখনো তার গলায়ই প্যাঁচানো ছিল। নির্জীব চোখ মেলা মুখটিতে ছিল আতঙ্ক ও যন্ত্রণার ছাপ। সেই রাত্রে এই খুনের ঘটনাটিকে আর দশটি 'sex murder' এর মতো বলে ধরে নিল পুলিশ। কিন্তু আসলে এই ঘটনার মাধ্যমেই শুরু হয় এক ত্রাসের রাজত্ব যা কল্পনাতীতভাবে শহরটিকে গ্রাস করেছিল এবং জনগণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে থাকে ১৮ মাস ধরে। কেননা এই খুনটি সংঘটিত হয়েছিল শতাব্দীর কুখ্যাততম গণহত্যাকারীদের একজনের হাতে যাকে 'The Boston Strangler' (বোস্টনের শ্বাসরোধকারী) নামে সবাই চিনে।

প্রায় দেড় বছর ধরে পুলিশ বিভিন্ন স্থানে তদন্ত তল্লাসি চালিয়ে যায় এই ভয়ংকর খুনির রহস্য উদঘটনের চেষ্টায়। কিন্তু প্রতিবারই সে পুলিশের চোখে ধুলা দিয়ে ধরা ছোঁয়ার আড়ালেই থেকে যায়। যেন অন্ধকারে মিশে যেত খুনিটি। দেড় বছরের মধ্যে সে ১৩টি যুবতিকে খুন করে। এর মধ্যে ১১ জনকেই পাওয়া যায় একই রকম প্রায় বিবস্ত্র অশ্লীল অবস্থায় এবং গলায় শক্ত করে মোজা প্যাঁচানো থাকত যা দিয়ে তাদের শ্বাসরোধ করা হয়েছিল। ব্যতিক্রম দুই যুবতির একজনকে ছুরির আঘাতে খুন করা হয়। তার সারা দেহ ছুরির আঘাতে ফালা করা হয়েছিল। হতভাগা মেয়েটির যৌনাঙ্গ ও স্তন ছুরির আঘাতে প্রায় বিকৃত করে ফেলা হয়েছিল। তবে তারও গলার কাছে একটি মোজা পাওয়া যায়। অপর যুবতিকে হাত দিয়ে গলা টিপে হত্যা করা হয়। তার গলায় খুনির আঙুলের ছাপ ছিল স্পষ্ট।

এই ১৩ টি জঘন্য লোমহর্ষক খুনের জন্য দায়ী ছিল সাবেক ইউএস আর্মি বক্সিং চ্যাম্পিয়ন অ্যালবার্ট ডিসলভো (Albert Desalvo)। তার এই প্রত্যেকটি খুনের মতোই অদ্ভুত ও প্যাঁচালো ব্যাপার হলো এই যে তাকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়নি। যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয় তার উপর অসংখ্য ডাকাতি ও নারীদের

অ্যালবার্ট ডিসলভো

উপর যৌন হয়রানির অভিযোগ ছিল মাত্র। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে যেসব নারীদের উপর হামলা করার কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের কেউই খুন হয়নি, প্রত্যেকেই জীবিত ছিল। যদিও অনেকেই অ্যালবার্টকেই 'দ্য বোস্টন স্ট্রাঙ্গলার' বলে তখন বিশ্বাস করেনি কিন্তু এই সুদর্শন ও শক্তিশালী বক্সার শেষপর্যন্ত খুনের কথা স্বীকার করেছিল। তবে 'দ্য বোস্টন স্ট্র্যাঙ্গলার' সন্দেহে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে তাকে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করার পর এসব সত্য বের হয়ে আসে। সুদর্শন ও মিষ্টিভাষী অ্যালবার্ট তার কালো চুলগুলোকে পেছনে উল্টিয়ে আঁচড়তে এবং সবসময় পরিষ্কার করে ধোয়া ধবধবে সাদা শার্ট পরে থাকত। তার বাহ্যিক রূপ দেখে কেউ কখনো তাকে সন্দেহ করেনি। নিজের মুখে খুনগুলোর কথা স্বীকার করার পর সবাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, অ্যালবার্ট ডিসালভোই 'দ্য বোস্টন স্ট্র্যাঙ্গলার'।

অ্যালবার্ট ডিসালভোকে ছোটবেলা থেকেই অনেকবার আইনি ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। বেশিরভাগ সময়ই অন্যের বাড়িতে জোরপূর্বক অনধিকার প্রবেশের কারণে তাকে পুলিশের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার এই ক্ষমতাটি ভয়ংকরভাবে কাজে লাগে যখন সে খুনের নেশায় উন্মত্ত ছিল। তার কর্মজীবন শুরু হয় যখন সে যুবক। তাকে যখন ইউএস আর্মির একটি ফোর্সের সাথে জার্মানিতে পাঠানো হয় সেখানে সে বিয়ে করে। তার স্ত্রী, আইরমজার্ড (Irmgerd) ছিল স্থানীয় একটি মেয়ে। বিয়ের পর তাদের দুটি সন্তান হয়। তাদের দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার পর তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর অ্যালবার্ট ইউ এস আর্মির মিডলওয়েট বক্সিং চাম্পিয়ন হয়ে যায়। কিন্তু কয়েক মাস পর সে আর্মির চাকুরি ছেড়ে দেয় এবং আমেরিকা ফেরত চলে আসে। এবং খুব সাধারণ একটি চাকরি করা শুরু করে। এরপরই শুরু হয় তার পৈশাচিকতা, একের পর এক যুবতিকে খুন করে যেতে থাকে সে।

অ্যালবার্টকে গ্রেপ্তারের পর তার স্বীকারোক্তি শুনে পুলিশ কর্মকর্তারা ভেবেছিলেন সে হয়তো কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত। একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে এমন পৈশাচিকতা সম্ভব বলে তাদের বিশ্বাস হয়নি। তারা ডাক্তারদের শরণাপন্ন হলেন। তারা কিছুদিন তাকে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং বিভিন্ন নিরীক্ষা করলেন। তারা বলেন যে, অ্যালবার্টের যৌন চাহিদা তীব্র ও উদ্দাম, তা নিয়ন্ত্রণ করার মতো না। এমন উন্মাদ যৌন আকাঙ্ক্ষার কারণেই এতটা হিংস্র হতে পেরেছিল সে। আরও খবর নিয়ে জানা যায়, সে যখন জার্মানিতে ছিল তার স্ত্রী প্রায়ই এটা নিয়ে অভিযোগ করত। সেই ফোর্সে কর্মরত একজন সাইকিয়াট্রিস্ট বলেন, অ্যালবার্টের স্ত্রী তার থেকে দূরে থাকতে চাইত এবং বেশিরভাগ সময়ই সহবাস এড়িয়ে যেতে চাইত। এর ফলে তাদের মধ্যে কলহ ও শেষপর্যন্ত তালাক হয়।

অ্যালবার্টের স্ত্রীর কথা অনুযায়ী ডাঃ জেমস ব্রুসেল (Dr. James Brussel) বলেন অ্যালবার্টের চাহিদা ছিল অত্যধিক বেশি এবং সে তার স্ত্রীর সাথে এমন আরও কিছু করতে চাইত যা মেয়েটির পক্ষে করা সম্ভব হতো না। অ্যালবার্টের হিংস্র ধরনের চুম্বন ও পাশবিক আঁচড় কামড় প্রতিনিয়ত সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে মেয়েটি তালাকের পথ বেছে নেয়। এছাড়া জানা যায় যে, আর্মিতে থাকাকালে অ্যালবার্ট তার অবসর সময় পার করত অন্যান্য অনুপস্থিত অফিসারদের স্ত্রীদের সাথে। একই সাথে একাধিক নারীর সাথে সহবাস করার মতো অস্বাভাবিক বেলেল্লাপনার মতো ঘৃণ্য অভিযোগও ছিল তার নামে। এটি একধরনের অমানুষিকতাই বটে। তার গ্রেপ্তারের পর প্রতিরক্ষার জন্য বিশিষ্ট আইনজীবী এফ. লি বেইলিকে (F. Lee Bailey) নিযুক্ত করা হয়। তিনি বলেন, "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে অ্যালবার্ট আজ পর্যন্ত মনোরোগবিদ্যায় দেখা সবচেয়ে ভয়ংকর রোগীদের একজন। তার সর্বনাশা যৌন আকাঙ্ক্ষা এ যাবৎকালের সবচেয়ে ভয়ংকরগুলোর মধ্যেই একটি। নিঃসন্দেহে অ্যালবার্ট স্কিৎসোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত (Schizophrenia, এক ধরনের মানসিক রোগ যার ফলে মানুষের অনুভূতি ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকে না।) এবং তার যথার্থ চিকিৎসার প্রয়োজন।

ভয়ংকর এই হত্যাস্পৃহা শুরু হয় ১৯৬২ সাল থেকে। নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তখনই উচিত ছিল এই শ্বাসরোধকারী খুনিকে ধরার জন্য একটি বিশেষ স্কোয়াড গঠন করা। কিন্তু তার বদলে তারা সাধারণভাবে এর তদন্ত চালায় যার ফলে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটে চলতে থাকে। প্রত্যেকটি যুবতিকেই তাদের নিজেদের বাড়িতেই খুন করা হয়েছিল। অ্যালবার্ট তাদের বাসায় ডেলিভারিম্যান অথবা পানির পাইপের মিস্ত্রী হিসেবে প্রবেশাধিকার নিত। বাড়িতে ঢোকার পর পরই সে যুবতিদের উপর হামলা চালিয়ে তাকে ধর্ষণ করত। এরপর শ্বাসরোধ করে হত্যা করে প্রায় বিবস্ত্র দেহটিকে অশ্লীল ভঙ্গিমায় সাজিয়ে রেখে চলে যেত। একের পর এক এমন হত্যাকাণ্ড ঘটতে থাকায় এবং খুনি তখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকায় শহরবাসী অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। বেশিরভাগ মেয়েরাই সন্ধ্যার পর পারতপক্ষে একা বের হতো না। স্বামীরা কোনো কাজে রাতে বাইরে থাকলে স্ত্রীদের কাছে গুলিভরা বন্দুক রেখে যেত। শহরে পুলিশি তৎপরতাও বেড়েছিল, সামান্য সন্দেহের বশে সাধারণ লোকজন ও পূর্বে পুলিশ রেকর্ডে আসা লোকজনকে গ্রেপ্তার ও ছেড়ে দেওয়ার ঘটনাও বেড়ে চলল। এতকিছুর মধ্যেও অ্যালবার্টকে তখন পুলিশের সম্মুখীন হতে হয়নি। অথচ সবার আগে তাকে সন্দেহ করা উচিত ছিল কেননা কয়েক মাস আগেই সে যৌন হয়রানির দায়ে কিছুদিন সাজা খেটে মুক্তি পেয়েছিল। তার বয়স তখন ৩২ বছর এবং সে একটি মডেলিং কোম্পানিতে চাকরি করত। সেখানে এক নতুন মডেলকে

প্রভাবিত করে তার সাথে বন্ধুত্ব করে। একদিন জামার জন্য মাপ নেওয়ার সময় সে মেয়েটিকে আপত্তিকর ভাবে ছোঁয় এবং তাকে চুম্বনের চেষ্টা করে। ধস্তাধস্তি ও মেয়েটির আর্তনাদ শুনে সবাই ছুটে আসলে মেয়েটি রক্ষা পায় এবং অ্যালবার্টকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনাকে বলা হয় 'দ্য মিজারিং ম্যান অ্যাটাক' (The measuring man attack)। ১৯৬৪ সালে তাকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয় এবং এবারের ঘটনার শিরোনাম ছিল 'দ গ্রিন ম্যান অ্যাটাক (The green man attack)। এর কারণ হলো তার সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল ধবধবে সাদা শার্ট ও সবুজ রঙের প্যান্ট। এই প্যান্টটি পরেই সে সবগুলো হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। এই প্যান্ট পরা অবস্থায় সে বেশ কয়েকটি মেয়েকে যৌন হয়রানি করেছিল যার ফলে অভিযোগ করার সময় সবার স্বীকারোক্তিই মিলে যায়। সেই কর্মকর্তা হঠাৎ খেয়াল করেন যে 'গ্রিন ম্যান' এবং 'মিজারিং ম্যান' এর হুবহু মিলে যাচ্ছে। তিনি পুলিশ রেকর্ডে থাকা অ্যালবার্টের ছবিটি দেখিয়ে নিশ্চিত হন এবং দ্রুতই তাকে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তারের পর তার জিজ্ঞাসাবাদের সময় আচরণগত সমস্যার কারণে পুলিশের সন্দেহ হয় যে সে হয়তো মানসিক রোগী। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিজওয়াটার মেন্টাল ইনস্টিটিউটে (Bridgewater Mental Institute) যা ম্যাসাসুটসে (Massachusetts) অবস্থিত। সেখানেই ভয়াবহ লোমহর্ষক রহস্য উদঘাটিত হয়। সেখানে তার চিকিৎসা করেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রবার্ট মিজার (Dr. Robert Mezer) এবং পুলিশকে নিশ্চিত করেন যে অ্যালবার্টই 'দ্য বোস্টন স্ট্রাঙ্গলার'। তার কাছে অ্যালবার্ট ১৩ টি খুনের কথা স্বীকার করে এবং প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের খুঁটিনাটি বিবরণসহ বর্ণনা করে। ডাঃ রবার্ট পুলিশের কাছে বলেন, "অ্যালবার্ট বেশিরভাগ খুনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে আমার কাছে। এমনকি সে অত্যন্ত গোপন ও অন্তরঙ্গ কর্মকাণ্ডগুলোও বলেছে।" যেহেতু ম্যাসাসুটসের আইন অনুযায়ী আসামির চিকিৎসক তার কাছে থেকে জোগাড় করা তথ্য আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে দিতে পারে না তাই সম্পূর্ণ ঘটনাবলি আদালতের শুনানিতে আড়ালেই থেকে যায়। শুধু প্রমাণিত হয় যে অ্যালবার্টই প্রকৃত অপরাধী এবং তাকে সাজাপ্রাপ্ত মানসিক রোগী আসামি হিসেবে ব্রিজওয়াটার মেন্টাল ইনস্টিউটে বন্দি করা হয়।

এরপরও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক অ্যালবার্টের প্রকৃত বোস্টন স্ট্র্যাঙ্গলার হওয়া নিয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করলে অ্যালবার্টের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত আইনজীবী এফ. লি বেইলি তার বইতে অ্যালবার্টের ঘটনা বর্ণনা করেন। সেসময় বেশ জনপ্রিয়তা প্রাপ্ত বই 'The Defence Never Rests' এ তিনি বলেন যে অ্যালবার্ট আরও একটি স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। ১৯৬৫ সালে এই স্বীকারোক্তির সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিল কয়েকজন ডাক্তার, এফ লি বেইলি নিজে এবং কয়েকজন পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা। বলা যায় যে সেটি ছিল এক

নাটকীয় সভা। তবে সেটি শুধু পুলিশ ও প্রতিবাদীপক্ষের মধ্যে একটি বিশেষ তদন্ত হওয়ায় তা সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে, বিশদভাবে আদালতে ব্যবহার করা হয়নি। অ্যালবার্টের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এফ. লি বেইলি তার বইতে লেখেন।

"আমি চেয়েছিলাম যে অ্যালার্ট ডিসালভোকে বিশেষজ্ঞরা পর্যবেক্ষণ করুন। তাছাড়া কর্তৃপক্ষও এব্যাপারে তদন্ত শেষ করে ফলাফলে পৌঁছতে ইচ্ছুক ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই অ্যালবার্টকে দ্য বোস্টন স্ট্র্যাঙ্গলার হিসেবে সনাক্ত করা ও তা অকাট্য প্রমাণ হিসেবে প্রকাশ করাটা ছিল আবশ্যক। এটি সম্ভব ছিল তখনই যখন পুলিশ তার স্বীকারোক্তি ও ১৩ টি খুনের বর্ণনার সাথে অগণিত তথ্য প্রমাণ ও ১৩ টি খুনের ঘটনাস্থলের যথার্থ সামঞ্জস্য বের করতে পারবে। তাই আরও একটি জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা করা হয়।"

অ্যালবার্টের পরবর্তী স্বীকারোক্তি আদালতে বিশদভাবে ব্যবহৃত হবে না এমন চুক্তি স্থাপন করার পর ঠিক করা হয় যে জিজ্ঞাসাবাদ ব্রিজওয়াটার মেন্টাল ইনস্টিটিউটের সংঘটিত হবে। যদিও বলা হয়েছিল যে সকল কাজ শেষ হতে ১৫ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না পরে দেখা যায় সম্পূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হতে পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছিল। অ্যালবার্ট যতই গোপন কথা ফাঁস করছিল ততই তার 'বোস্টন স্ট্র্যাঙ্গলার' হওয়ার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল। সে তার শিকার সম্পর্কে এমন এমন তথ্য প্রকাশ করতে লাগল যা শুধুমাত্র প্রকৃত খুনির পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। সে বলেছিল যে তার আট নম্বর শিকার বিভারলি সামানসের (Beverly Samans) বিছানার নিচে একটি ছোট ডায়েরি পাওয়া যাবে, পুলিশ সত্যিই সেটি যথাস্থানে খুঁজে পেরেছিল। সে তার প্রত্যেকটি শিকারের বাড়ির ফ্লোর প্ল্যান এঁকে দিতে পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের বাড়ির পর্দা, কার্পেট ও আসবাবপত্রের রং- বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পেরেছিল এমনকি কার বাড়ি কীভাবে সাজানো সে সম্পর্কেও একদম সঠিক বর্ণনা দিয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, অ্যালবার্ট প্রত্যেকটি খুনের নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল যেন কোনো ভয়ংকর গল্প বলছে। সে সাধারণত প্রত্যেকটি শিকারকে চোখে চোখে রেখে তাদের সম্পর্কে সব খবর নিত। এরপর যখন তাদের একা থাকার সময় তখনই তাদের বাড়িতে কখনো পোস্টম্যান বা মিস্ত্রির বেশে আসত। বাড়িতে ঢুকেই প্রথমে পালানোর রাস্তা স্থির করত। বাড়ির প্ল্যান জানা থাকার কারণে পালানোর রাস্তা তার জানাই থাকত। এরপর প্রথমে সে এমনভাবে দরজা জানালা বন্ধ করত যেন তার শিকার পালাতে না পারে। মিস্ত্রির বেশে ঢুকলে তো কথাই নেই। সোজা বেডরুমে গিয়ে সেখানে মেয়েটিকে আটকে ফেলত। ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক তাকে বাধ্য করত তার পাশবিক যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে। সাধারণত সে একটি ধারাল ছুরি দিয়ে তার শিকারদের কাপড় ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলত এবং হিংস্রভাবে তাদের আঁচড়ে-

কামড়ে ধর্ষণ করত। এরপর একটি মোজা গলায় পেচিয়ে মেয়েদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করত। প্রায় ১৩ টি হত্যাকাণ্ডই একই রকম, ব্যতিক্রম ছিল শেষ দুটি যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই জিজ্ঞাসাবাদের সম্পূর্ণ অংশই রেকর্ড করা হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হওয়ার পর তার রেকর্ড থেকে প্রতিলিপি লিখতে প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠা লেগেছিল। অবশ্য এর সাথে পূর্বে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যও যোগ করে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সাজানো হয়েছিল। এতে সময় লাগে ৫০ ঘণ্টা। প্রত্যেকটি তথ্যের সত্যতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং প্রত্যেকটিই সত্য প্রমাণিত হয়। ১৩টি মারাত্মক খুনের বিস্তারিত বর্ণনা যা আরও আগেই সন্দোহাতীতভাবে অ্যালবার্টকে 'দ্য বোস্টন স্ট্র্যাঙ্গলার' হিসেবে প্রমাণ করতে পারত তার সম্পূর্ণ অংশ তার মামলার শুনানি শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি। তখন প্রকাশিত হলে তাকে মানসিক রোগী হিসেবে প্রাধান্য না দিয়ে তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। যেহেতু এসকল খুনের খুঁটিনাটি বর্ণনার সাথে অ্যালবার্টের সম্পর্ক আদালতে প্রমাণিত হয়নি মানুষের সত্য জানার আগ্রহ স্তিমিত হয়নি। তবে অ্যালবার্টই বোস্টন স্ট্র্যাঙ্গলার কিনা সে ব্যাপারে জনগণের প্রশ্নের উত্তর একজনই দিতে পারত। সে হলো অ্যালবার্ট ডিসালভো নিজে, যে চিরকালের জন্য নীরব হয়ে গিয়েছে মৃত্যুর মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে, অর্থাৎ সাজার ছয় বছর পর ব্রিজওয়াটার মেন্টাল ইনস্টিটিউট থেকে তাকে ম্যাসাসুটসের ওয়ালপোল স্টেট প্রিজনে (Walpole State Prison) পাঠানো হয়। সেখানে আরও তিনটি অপরাধীর সাথে একই কারাগারে রাখা হয়। ১৯৭৩ সালে তার সাথের সেই তিনজন মাদকাসক্ত অপরাধী কোনো এক কারণে তাকে ছুরিকাঘাতে করে কারাগারেই হত্যা করে। ঘৃণ্য দানবটির এমন করুণ ও পৈশাচিক খুনের মাধ্যমেই চিরতরে তার অস্তিত্ব থেকে মুক্তি পায় বোস্টনবাসী।

দ্য লোনলি হার্টস কিলারস

রেমন্ড ফার্নান্দেজ (Raymond Fernandez) এবং মার্থা বেক (Marth Beck) ছিল সমাজের দু'টি বেমানান আবর্জনা বিশেষ। তাদের কুকর্মের ফলে এমন নারকীয় তাণ্ডব সৃষ্টি হয়েছিল যা তাদের অবজ্ঞাকারী সমাজকে ত্রাসে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাদের দু'জনেরই ছিল স্বাভাবিক ও সম্ভাবনাময় জীবন। কিন্তু ভাগ্য তাদের সাথে নিষ্ঠুর পরিহাস করে। ১৯৪৭ সালে এই দুই ভয়ংকর অপরাধী জোট বাঁধার পর তারাই উল্টো সমাজের সাথে নির্মম পরিহাস করা শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের জীবন দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ করে।

রেমন্ডের জন্ম হয় হাওয়াইতে (Hawaii) এক স্প্যানিশ পরিবারে। ৩০ এর দশকে সে স্পেনে গিয়ে বসবাস শুরু করে এবং একটি স্প্যানিশ মেয়েকে বিয়ে করে সংসার শুরু করে। সিভিল ওয়ারের (Civil War, স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার, ১৯৩৬ সালের ১৭ জুলাই থেকে ১৯৩৯ সালের ১ এপ্রিল স্থায়ী হয়েছিল) সময় সে ফ্র্যাঙ্কোর ফোর্সে (Franco's Force; General Francisco Franco, সিভিল ওয়ারের পর ফ্রান্সের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে) যোগদান করে এবং ওয়ার হিরো (War Hero) হিসেবে সম্মাননা পায়। এরপর সে সম্মানের সাথে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স (British Intelligence) বিভাগে যোগদান করে। তাকে জিব্রাল্টারের (Gibraltar) ফেরিঘাটে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে সে একটি তেলবাহী জাহাজে করে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করে। যাত্রাপথে জাহাজে হাঁটাহাঁটি করার সময় হঠাৎ তার মাথায় পাটাতনের ওপর উঠার দরজাটির (Hatch door) প্রচণ্ড আঘাত লাগে। সে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং মাথা ফেটে প্রচুর রক্তপাত হয়। তার যখন জ্ঞান ফিরে সে তখন কুরাসাও (Curacao) দ্বীপের একটি হাসপাতালে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর সে সুস্থ হয়ে উঠে। কিন্তু মাথায় ভারি দরজার আঘাতের কারণে তার ব্যক্তিত্বের বেশ পরিবর্তন আসে। সে অত্যন্ত ধূর্ত ও নিষ্ঠুর প্রতারকে পরিণত হয়। যতই দিন যায় তার মধ্যকার কুস্বভাবগুলো আরও বেড়ে যায় এবং তাকে একটি নির্দয় দানবে পরিণত করে। সে ভাবতে শুরু করে যে, তার মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি আছে, যার সাহায্যে সে যে কোনো নারীকে তার ইচ্ছেমতো চূড়ান্তভাবে ব্যবহার করতে পারবে। সে

'লোনলি হার্টস' (Lonely Hearts) ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন দেওয়া শুরু করে। 'লোনলি হার্টস' হলো কোনো নির্দিষ্ট ম্যাগাজিন অথবা কোনো পত্রিকার একটি আলাদা সংরক্ষিত কলাম, যেখানে নিঃসঙ্গ মানুষেরা কোনো সঙ্গী খুঁজে পাবার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। রেমন্ডও সে রকম নিজেকে নিঃসঙ্গ পুরুষ পরিচয় দিয়ে রোমান্টিক বিজ্ঞাপন দিত। যেসব সহজ-সরল মানুষেরা তার এসব বিজ্ঞাপনে সারা দিত তাদেরই সে লুট করত। এভাবে ১৯৪৭ সালের মধ্যে তার শিকারের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায়। এরপর সে কিছুদিনের জন্য স্পেনে যায়। সেখানে তার প্রতারণার এক শিকার রহস্যজনকভাবে মারা যায়। তখন ছিল ছুটির মৌসুম। এরপর সে আবারও আমেরিকা ফেরত আসে। এবার তার উদ্দেশ্য ছিল ফ্লোরিডাবাসী এক মহিলার রোমান্টিক ও উত্তেজনাপূর্ণ চিঠির জবাবের বদলে তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করা। এসব কুচক্রী কর্মকাণ্ডই তার জীবিকায় পরিণত হয়েছিল।

মার্থা বেকের নাম লোনলি হার্টস ক্লাবে তার কিছু বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে কৌতুক ও হাসির পাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। মার্থা ছিল ২৮০ পাউন্ডের বেঢপ আকৃতির এক মহিলা। তার বিশাল বপু ও অহেতুক নিজেকে যৌনাবেদনময়ী হিসেবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টার কারণে সে অদ্ভুত ও হাস্যকর ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তার জীবন মোটেও কৌতুকময় ছিল না, বরং তা ছিল ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে জর্জরিত। মাত্র ১৩ বছর বয়সে সে তার আপন ভাই দ্বারা ধর্ষিত হয়। এই অজাচারী যৌন সম্পর্ক চলতেই থাকে যতদিন না মার্থা অতিষ্ঠ হয়ে তার মায়ের কাছে নালিশ করে। কিন্তু কোনো এক কারণে, যা মার্থা কখনই বুঝতে পারেনি, তার মা এই হীন ঘটনার জন্য তাকেই দোষ দিত। তাকে জোর করেই নিভৃত সবার আড়ালে নিঃসঙ্গ থাকতে বাধ্য করা হতো। যার ফলে সে তার কৈশোরের সব মজা ও সকল স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। নিঃসঙ্গ কৈশোর পার করে সে একজন নার্স হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে। সে ক্যালিফোর্নিয়াতে (California) একটি আর্মি হাসপাতালে চাকরি নেয়। কিন্তু সেখানে তার সংযমহীন যৌনজীবন নিয়ে বিভিন্ন কুৎসা রটনা শুরু হলে সে বাধ্য হয়েই চলে আসে ফ্লোরিডায়। সেখানে সে দুস্থ ও পঙ্গু শিশুদের একটি আশ্রমে সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে কাজ নেয়। আশ্রমটি ফ্লোরিডার পেনসাকোলায় (Pensacola) অবস্থিত ছিল। এখানেই তার সাথে রেমন্ডের দেখা হয়। অবশ্য রেমন্ড এখানে নিজেকে তার ব্যবসায়িক ছদ্মনামে, চার্লস মার্টিন (Charles Martin) হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। তখন মার্থা তার অসফল বিয়ের চিহ্ন, দু'টি সন্তান নিয়ে অনেক কষ্টে চলছিল। তার সন্তানদের মধ্যে প্রথম জনই ছিল জারজ সন্তান, যা সত্য প্রকাশ হওয়ার পর মার্থার সংসার ভেঙে যায়। রেমন্ডের সাথে মার্থার খুব শীঘ্রই একটি উষ্ণ সম্পর্কের সূচনা হয়। শুধু তাই নয়, রেমন্ড তাকে

এমন সব ন্যায়ভ্রষ্ট কামবিকৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, যা তাকে তার স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ ও সংযমহীন জীবনে প্রথমবারের মতো শারীরিক তৃপ্তি দেয়। সে তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে দুই সন্তানকে পরিত্যাগ করে রেমন্ডের সাথে চলে আসে।

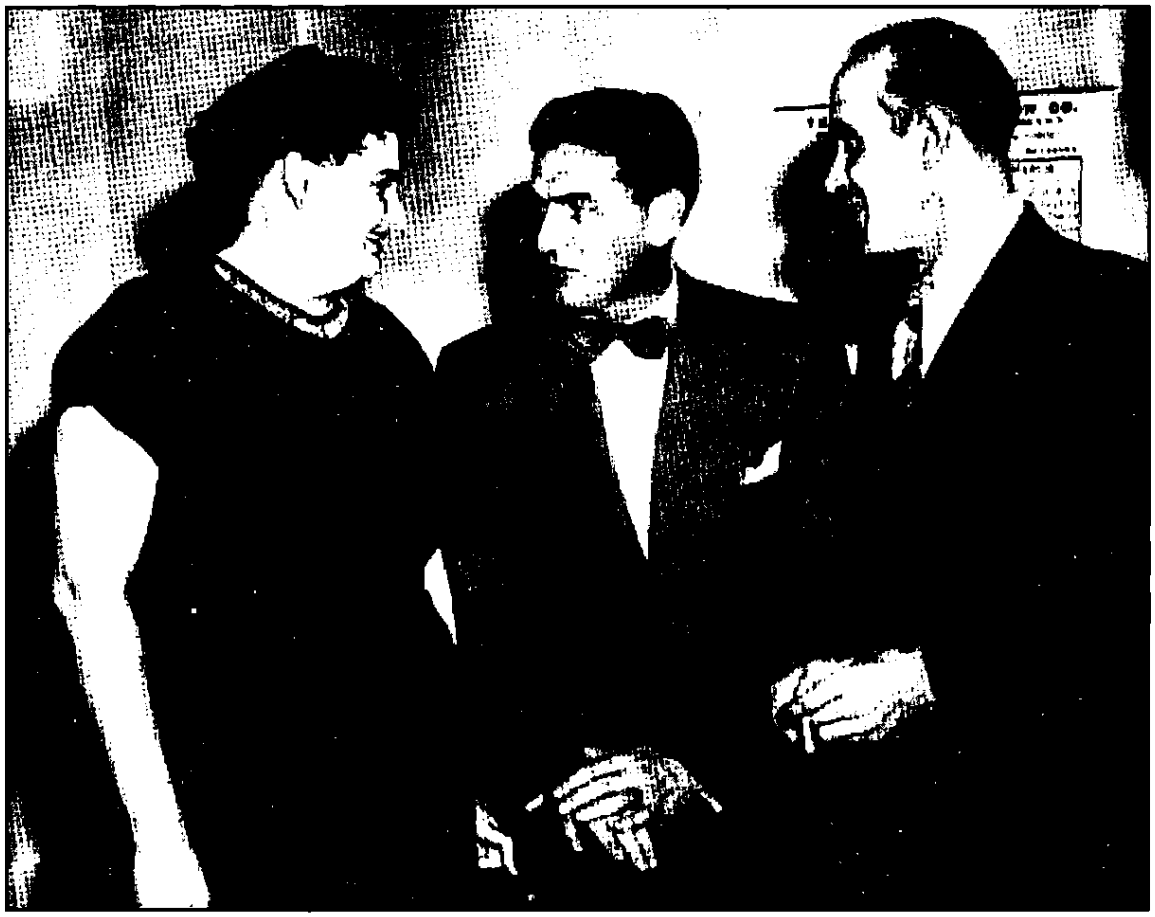

রেমন্ড এবং মার্থা

রেমন্ড মার্থাকে তার ব্যবসার ধারা বুঝিয়ে বলে এবং মার্থা তার সাথে যোগদান করতে রাজি হয়। স্থির হয় যে, মার্থা রেমন্ডের বোনের বেশ ধরে তার সাথে সব জায়গায় যাবে এবং তার প্রতারণা ব্যবসায় সাহায্য করবে। কিন্তু মার্থা তাকে এতটাই ভালোবেসে ফেলেছিল যে, মুক্তভাবে তার কাজ করার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা পড়ল। রেমন্ড বিভিন্ন মেয়েদের সাথে ঘোরাঘুরি করত এবং কিছুদিন পর বিয়ে করে ফেলত, যা ছিল তার জোচ্চুরির প্রাথমিক ধাপ। কিন্তু মার্থা তা মেনে নিতে পারল না এবং তাকে সেই বিয়েগুলো সুসম্পূর্ণভাবে পালন করতে দিত না। এ ধরনের ঈর্ষা এই রোমান্টিক খেলোয়াড়ের বেশ ক্ষতি সাধন করল। যার ফলে তাদের প্রথম যৌনকর্মের ফলাফলে রেমন্ডের শিকার তার গাড়ি ও ৫০০ ডলার ফেরত চাইল এবং তার জীবনবীমার কাগজপত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করল। এরপর হতভাগা এই প্রেমিক জুটি ইলিনয়িসের কুক কাউন্টিতে (Cook County, Illinois) গিয়ে বসবাস শুরু করল। ১৯৪৮ সালের আগস্টে রেমন্ড

সেখানে মার্টল ইয়াৎ (Myrtle Younge) নামের একটি মেয়েকে বিয়ে করে। পিতৃহারা মেয়েটির জীবনে রেমন্ড ছাড়া আর কেউই ছিল না তখন। তাদের বিয়ের পর আবারও মার্থা একই কাজ শুরু করে। নব দম্পতি যখন আলাদা ঘরে থাকা শুরু করল মার্থা বিপত্তি বাধাল। সে মার্টলের সাথে রেমন্ডকে একা থাকতে দিতে অস্বীকার করল। উপায় না দেখে শেষে অতি শীঘ্রই মার্টলকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল তারা। মার্টলকে অতিরিক্ত পরিমাণে বার বিচুর‍্যাট (Barbiturate) ঘুমের ওষুধ জাতীয় খাইয়ে দিয়ে অ্যারক্যানসাসের লিটল রকের (Litle Rock, Arkansas) উদ্দেশে একটি বাসে উঠিয়ে দেয়। পথিমধ্যেই মার্টল মৃত্যুবরণ করে। রেমন্ড ও মার্থা একটি গাড়ি ও ৪০০০ ডলার লাভ করে।

এরপর তারা ডিসেম্বরের দিকে নিউইয়র্কের অ্যালব্যানিতে (Allbany, Newyork) যায়। এবারে উদ্দেশ্য ছিল জ্যানেট ফে (Janet Fay) নামের এক সাদাসিঁধে বিধবা। জ্যানেটের বয়স ছিল প্রায় ৬৬ বছর। রেমন্ড তার নিঃসঙ্গ জীবনে ভালোবাসার সঞ্চার করাতে সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। প্রেমে অন্ধ হয়েই রেমন্ডকে বিয়ে করে এবং তার সকল সম্পত্তি, ৬০০০ ডলারের জীবনবীমা ও গাড়ি সব রেমন্ডের নামে লিখে দেয়। তবে বিয়ের পর পরই খুন করা সম্ভব নয়, মানুষজন সন্দেহ করবে তাই তারা কিছু দিন সময় নিল। রেমন্ড মার্থাকে বোঝাল, তার ঈর্ষা ও রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে না হলে তাদের ক্ষতি হবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা ! যেদিন মার্থা তাদের দু'জনকে একই বিছানায় দেখল, সে একটি ভারি হাতুরি দিয়ে ঘুমন্ত জ্যানেটের মাথায় আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায়ই তাকে গলাটিপে হত্যা করে রেমন্ড। মার্থা এরপরও রাগে অন্ধ হয়ে জ্যানেটের মাথায় হাতুরি দিয়ে বেশ কয়েকটি আঘাত করে। জ্যানেটের মৃতদেহ একটি ট্রাকে ভরে তারা সেটি নিউইয়র্কের কুইনসে (Queens) তাদের ভাড়া করা বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে স্টোর রুমের মেঝেতে ট্রাঙ্কটি পুঁতে ফেলে সিমেন্ট দিয়ে ডেকে দেয়। জ্যানেটের প্রতিবেশীরা কোথাও তাকে খুঁজে না পেয়ে রেমন্ড ও মার্থাকে সন্দেহ করে। কিন্তু তারা তো তখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। জ্যানেটের সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে তার খুব বেশি সময় লাগেনি। এমনকি তার মৃত্যুর আগেই তার বাড়িটি গোপনে বিক্রি করে ফেলা হয়েছিল বলে জানা যায়। কুইনসে কিছুদিন থেকে তারা পরের বছর মিশিগানের গ্র্যান্ড র‍্যাপিডসে (Grand Rapids, Michigan) যায়। সেখানেও উদ্দেশ্য জঘন্য প্রতারণা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখানে রেমন্ড ২৮ বছর বয়সী সুন্দরী বিধবা ডেলফাইন ডাওনিং (Delphine Downing) কে তার প্রতারণার জালে ফেলতে ফাঁদ পাতছিল। রেমন্ড এবার তার মাথার সামনের অংশের টাক ঢাকার জন্য পরচুলা পরেছিল। এতে করে তাকে আগের মতো সুদর্শন দেখা যেত এবং তাকে হঠাৎ দেখে কেউ চিনে ফেলার ভয়ও দূর হলো। রেমন্ড ধূর্ত শেয়ালের মতো ডেলফাইন ও তার দুই বছর বয়সী

মেয়ে রেইনেলের (Rainelle) পিছু নিতে থাকল। শেষ পর্যন্ত সে ডেলফাইনকে তার মিথ্যে প্রেমের জালে আটকাতে সক্ষম হয়। রেইনেলের প্রতি রেমন্ডের স্নেহ মমতা দেখে ডেলফাইন নিশ্চিত হয়ে তাকে বিয়ে করে। তবে ডেলফাইন বেশ চালাক চতুর ছিল। সে তার সম্পত্তির উপরে মার্থার কোনো হস্তক্ষেপ এড়িয়ে যেত। বিয়ের পর রেমন্ডের পরচুলা দেখে তাদের মধ্যে কিছুটা কলহ হয়। ফলে সম্পত্তি ও টাকা-পয়সা হাত করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। রেমন্ড ডেলফাইনকে হাত করার জন্য কিছুটা সময় নেয়। যতদিন যাচ্ছিল মার্থার পক্ষে রেমন্ড ও ডেলফাইনের দাম্পত্য জীবন অসহনীয় হয়ে পড়ছিল। ফলে মার্থার সাথে রেমন্ডের কিছু কথা কাটাকাটি হয়। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ে রেইনেল ওখানে বসে খেলছে। যদিও রেমন্ড ভাবে যে, দুই বছরের শিশু তাদের কথা কিছু বুঝেনি। কিন্তু মার্থা তা মানল না। সে রেইনেলকে মারধর করে ও ধমকিয়ে ভয় দেখাল যেন কোনো কথা না বলে। এরপর থেকে শিশুটি প্রায় সব সময় একদম নীরব থাকত এবং থেকে থেকে কেঁদে উঠত। ডেলফাইন মার্থাকে সন্দেহ করে এবং প্রশ্ন করে যে, তার মেয়েকে সে কিছু বলেছে কিনা। শুধু তাই নয়, সে তাদের এও বলে হুমকি দেয় যে, তার মেয়ের কিছু হলে সে রেমন্ডকে তালাক দিয়ে তাদের এ বাড়ি থেকে বের করে দিবে। ফলাফল হলো আরও ভয়াবহ। মার্থা রাগে অন্ধ হয়ে ছোট্ট রেইনেলকে বাথটাবের পানিতে ডুবিয়ে মারে। ছোট্ট দেহটিকে বিশাল এক ট্রাঙ্কের ভরে ফেলা হয়। ডেলফাইন বাড়িতে ফিরে এসে তার মেয়ের খোঁজ করলে তাকেও হত্যা করা হয়। একটি সাঁড়াশির মাধ্যমে নির্মম পৈশাচিকভাবে রেমন্ড ডেলফাইনকে হত্যা করে। তার নিথর দেহের স্থান হয় মেয়ের সাথে সেই ট্রাঙ্কে। এরপর সেই ট্রাঙ্ক রক্তাক্ত সাঁড়াশি, কাপড় ও বিছানার চাদর সবই একসঙ্গে স্টোররুমের মেঝে খুঁড়ে মাটিচাপা দেওয়া হয়। জ্যানেট ফে'র মতোই মা-মেয়ে সিমেন্টের আড়ালে সমাধিত হয়। তবে তাদের সেই ভয়ংকর স্থানে বেশিদিন থাকতে হয়নি। কৌতূহলী প্রতিবেশীদের রেমন্ড ও মার্থা যতই মিথ্যে বলে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন তারা বিশ্বাস করেনি যে, মা-মেয়ে হঠাৎ কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়াতে গিয়েছে। সন্দিহান এক প্রতিবেশী, যে রেমন্ড ও মার্থাকে স্টোররুমে অস্বাভাবিকভাবে অসংখ্যবার যেতে দেখেছিল পুলিশকে ফোন করে ব্যাপারটি জানায়। সেদিন বিকেলে যখন রেমন্ড ও মার্থা সিনেমা দেখতে বাইরে গিয়েছিল, তখন পুলিশ বাড়িতে এসে তল্লাশি চালায়। স্টোররুমে নতুন ঢালাই করা সিমেন্ট দেখে তাদের সন্দেহ হয় ও পুরো মেঝে খুঁড়ে ফেলা হয়। সেখানেই পাওয়া যায় চিরনিদ্রায় শায়িত ডেলফাইন ও তার মেয়ে রেইনেলকে। রেমন্ড ও মার্থা খুশিমনে বাড়িতে ঢুকে, তারা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে, পুলিশ তাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে। তাদের হতবাক করে দিয়ে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে এবং মৃতদেহ দু'টি দেখায়। ধরা পড়ে জঘন্য দুই অপরাধী।

এরপর শুরু হয় দুই স্টেটের মধ্যে জোরদার প্রতিযোগিতার লড়াই। মিশিগানে কোনো ডেথ পেনাল্টি (Deth Penalty, মৃত্যুদণ্ড) ছিল না, কিন্তু নিউইয়র্কে ছিল। এর মধ্যে জ্যানেট ফে'র হত্যার ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে যায়। জ্যানেটকে খুন করার দায়ে তাদের নিউইয়র্ক নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তাদের এই পৈশাচিক কর্মকাণ্ডে সাধারণ জনগণের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের শিকার হয়। এরপর জঘন্য খুনি দু'জনকে নিউইয়র্কে পাঠানো হয়। তাদেরকে তিনটি খুনের দায়ে এবং মার্টল ইয়ংসহ আরও ১৭ জনের হত্যার সন্দেহে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৯ সালের জুলাইতে তাদের বিচারকার্য শুরু হয় এবং তা প্রায় ৪৪ দিন ধরে চলে। পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিনই এ ব্যাপারে বিশদভাবে লেখালেখি হতে থাকে। তাদের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কারজনক কথা জনসাধারণকে তাদের বিরুদ্ধে আরও ক্ষেপিয়ে তোলে। সাংবাদিকেরা রেমন্ড ও মার্থার অতীত ঘেঁটে তাদের ভয়ংকর সত্য বের করে আনে। পত্র-পত্রিকার উত্তেজনাপূর্ণ শিরোনাম ছিল তাদের নোংরা হীনপ্রবৃত্তির অজাচিত যৌন জীবন। এতে করে জনগণ আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আদালতের বাইরে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে যায় এই 'মনস্টার' (Monstar, দানব) ও তার 'ওভারওয়েট ওগ্রেস' (Overweight ogress, বিরাট আকারের রাক্ষসী) কে এক পলক দেখতে। মামলার রায় প্রকাশ ও তাদের শাস্তির জন্য জনগণ তাগাদা দিতে লাগল। মামলার রায় নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। রেমন্ড ও মার্থাকে প্রথম শ্রেণীর খুনি হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং তাদের দু'জনকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাদের মামলা ১৯৫১ সালের ৪ মার্চ শেষ হয় এই ফলাফলে যে, ২৯ আগস্ট তাদের ইলেকট্রিক চেয়ারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। তাদেরকে সিং-সিং কারাগারে (Sing Sing Prison) নিয়ে যাওয়া হয় এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা সেখানেই থাকে।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার দুই ঘণ্টা আগে রেমন্ড মার্থাকে একটি প্রেমপত্র পাঠায়, সেখানে তার প্রতি অগাধ প্রেমের কথা ব্যক্ত করে। চিঠিটি পড়ার পর মার্থা বলে, "এখন আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, রেমন্ড আমাকে ভালোবাসে, আমি খুশিতে আত্মহারা হয়েই আমার মৃত্যুর পথে পা বাড়াব।" তবে তাদের মৃত্যুটি মোটেও সুখকর হয়নি। যদিও পত্র-পত্রিকায় হাস্যরস মিশিয়ে কৌতুকাকারে লেখা হয়েছিল কীভাবে মার্থার অস্বাভাবিক মোটা দেহ নিয়ে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে কষ্ট হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, পত্রিকায় আরও লেখা হয়েছিল যে, তার মাংসল দেহে ইলেকট্রিক শক সঠিক প্রভাব ফেলতে পারছিল না। যার ফলে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে একটু বেশি সময় লাগে। এসব কথার সম্পূর্ণ সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজন মনে করেনি কেউ। তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তির কারণে তাদের করুণ মৃত্যুতে করুণাবোধ করার চেয়ে এসব কৌতুকে হাসাহাসি করেছিল সবাই। তাদের কঠোর কষ্টদায়ক মৃত্যু হয়তো এক মুহূর্তের জন্যও তাদের শিকারদের কষ্টের কথা মনে হয়েছিল কিনা কে জানে?

দ্য কিলার ক্লাউন

শিকাগো (Chicago) শহরের একটি ছোট্ট ছিমছাম বাড়ি, সেখানে জন্ম নেয় ছোট্ট এক শিশু। বাবা-মা খুব শখ করে তার নাম তাদের প্রিয় তারকার নামে রাখেন জন ওয়েন গেসি (John Wayne Gacy) এবং স্বপ্ন দেখেন যে, একদিন তাদের সন্তান বিখ্যাত হবে। সবার মুখে মুখে থাকবে তার নাম। এক অর্থে তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল বলতে হবে। কিন্তু তারা যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবে নয়। জন ওয়েন গেসি এমন একটি নাম ছিল যা কালো জাদুর প্রভাবের মতোই আমেরিকানদের মনকে আতঙ্কিত করে তুলত। সে ছিল দেশের নিষ্ঠুরতম ধর্ষকামী (Sadist) ও সুদক্ষ গণহত্যাকারী, যাকে 'ক্লিলার ক্লাউন' (Killer Clown) নামে সবাই চিনত। ভয়ংকর এই সমকামী খুনিকে বহু ফাঁদ পেতে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৮ সালে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় শিকাগোর পুলিশ। তাদের কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে স্বীকার করে ৩৩ জন যুবক ও বালকের খুনের কথা। তাদের প্রত্যেককে কুপিয়ে ও শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার আগে সে বর্বরভাবে তাদের ধর্ষণ করে।

গেসি ছিল একজন মোটা ও নিঃসঙ্গ সমকামী পুরুষ, যার তীব্র যৌন চাহিদা ছিল অস্বাভাবিকভাবে অনিয়ন্ত্রিত। তার এই অতৃপ্ততা তার আচরণে কিছুটা প্রকাশ পেত। যার কারণে প্রতিবেশীরা তার থেকে একটু দূরেই থাকত। তার মধ্যে প্রবল ইচ্ছা ছিল প্রতিবেশীদের প্রিয় পাত্র হওয়ার। কিন্তু প্রতিবেশীরা তাকে কিছুটা বাতিকগ্রস্ত ভাবত। এছাড়াও তার স্থানীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বেচ্ছাকৃতভাবে ব্যাপক প্রচারকার্য চালায়। তার এক বন্ধু ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে জড়িত ছিল। তার কাছ থেকেই সে পরামর্শ নেয় যে, জনপ্রিয়তার জন্য স্থানীয় হিতকারী বা দাতা হিসেবে পরিচিত হতে হবে এবং তাকে জোরালোভাবে প্রতিবেশী শিশুদের জন্য কিছু করতে হবে। সে তার বন্ধু গুস্তোর (Gusto) সাথে পরিকল্পনা করে তিনটি ক্লাউনের (Clown) পোশাক তৈরি করে এবং একটি আলাদা চরিত্র তৈরির চিন্তাভাবনা করে। খুব শীঘ্রই সে এলাকার তারকা, পোগো দ্য ক্লাউন (Pogo the Clown) হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে গেল। সে রাস্তায়,

বাড়ির পাশে, বাচ্চাদের জন্মদিন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ক্লাউন হিসেবে অংশগ্রহণ করতে লাগল। এক পর্যায়ে সে এতটা জনপ্রিয় হয়ে গেল যে, প্রেসিডেন্ট কার্টারের (President Carter) স্ত্রী রোজালিন (Rosalynn) তার সাথে ছবি তোলেন। সেই ছবিটি তিনি স্বাক্ষর করে গেসিকে পাঠিয়েছিলেন, যা সে অত্যন্ত যত্ন করে রেখেছিল।

কিন্তু ৩৮ বছর বয়সী গেসির জনপ্রিয়তা ক্লাউন হিসেবে যতই বাড়ছিল, ততই পুলিশের কাজও বেড়ে যাচ্ছিল। একদিকে গেসি তার জনপ্রিয়তার জন্য ক্লাউন সেজে বাচ্চাদের খুশি করছিল, অন্যদিকে শহর থেকে একের পর এক যুবক রহস্যজনকভাবে হারিয়ে গিয়ে পুলিশকে হতবুদ্ধি করে ফেলছিল। আশপাশের শহরগুলো থেকেও একই রকম বয়সের ছেলে হারিয়ে যাওয়ার খবর ও অভিযোগ আসছিল তাদের কাছে। প্রায় ছয় বছর ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা গেসিকে ফাঁসানো সম্ভব হয়। যখন তারা গেসির রহস্য উদঘাটন করে ভয়ংকর এক নির্যাতনের খরস্রোতে ভাসা কাহিনি তাদের শিহরিত করে ফেলে। নরউড পার্কের সেই বাড়িটি থেকে এমন সব তথ্যপ্রমাণ বের হয়, যা আগে কখনো বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক করেনি। হতবুদ্ধি গোয়েন্দারা কখনো ভাবেনি যে, তাদের এতটা ধূর্ত শিকারির সম্মুখীন হতে হবে। তারা যদি আরও একটু সতর্ক হতো তাহলে কিলার ক্লাউনের শিকারদের অন্তত কয়েকজন হয়তো আজ জীবিত থাকত। শুধু তাই নয়, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে চারটি এমন যুবক নিখোঁজ হওয়ার সন্দেহে পুলিশের ফাইলে গেসির নাম এসেছিল।

নিখোঁজ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে গেসির নাম সন্দেহের তালিকায় থাকার আরও একটা কারণ ছিল, তার নামে কমবয়সী ছেলেদের যৌন হয়রানির মামলা। পর পর দুইবার একই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তার নাম সন্দেহের শীর্ষে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তার জনহিতকর কাজের জন্য জয়প্রিয়তা হয়তো তাকে যায়।

তখন তাদের দু'টি সন্তান ছিল। তালাকের পর সন্তান দু'টি তাদের মায়ের কাছেই থাকে। গেসির প্রথম স্ত্রী বলে "সে অনেকটা দক্ষ বিক্রেতার মতো ছিল– যে কিনা তার কথা দিয়ে যে কাউকে মুগ্ধ করতে পারে। গেসির দ্বিতীয় বিয়ে হয় ১৯৭২ সালে। তার দ্বিতীয় স্ত্রী ক্যারোল হফ (Carole Hoff) তাদের ছাড়াছাড়ির কারণ হিসেবে গেসির অস্বাভাবিক আচরণের কথা বলে। তাদের তালাকের আগে সে হঠাৎই বাসায় অসংখ্য নগ্ন ছেলেদের ছবি আনা শুরু করে। এরপর ১৯৭৬ সালে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়। উভয় স্ত্রীই তাকে অদ্ভূত ও রহস্যময় বলে বর্ণনা করে। বিয়ের পর প্রথম কয়েক মাস তার আচরণ স্বাভাবিক থাকলেও এরপর তার প্রবল সমকামিতা প্রকাশ পায়। সে বেশিরভাগ দিনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেত এবং বাইরে রাত কাটাত। এ নিয়ে কোনো কথা বললেই সে তার স্ত্রীদের প্রচণ্ড মারধর করত। প্রতিরাতেই বাইরে যাওয়া নিয়ে পুলিশের প্রশ্ন ছিল, "কোথায় যেত

গেসি?" পরে আরও তদন্ত করে বের হয় যে, বাগহাউস স্কয়ারে (Bughouse Square) ঘোরাফেরা করত। বাগহাউস স্কয়ার হলো শিকাগোর অন্যতম কুখ্যাত এলাকা, যা রাত্রের বেলায় অসংখ্য পুরুষ যৌনকর্মী ও সমকামী যুবকে ভরপুর থাকত। সে সেখান থেকে কোনো যুবককে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেত এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরও পরিণতি হতো নির্মম ধর্ষণ ও মৃত্যু।

গেসি ও প্রেসিডেন্ট কার্টারের স্ত্রী

গেসিকে গ্রেফতার করার পেছনে মূল কারণটি ছিল বলতে গেলে কাকতালীয়। তার সাথে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তির সুসম্পর্ক ছিল। দুর্ভাগ্যবশত তাদের একজনের পরিচিত একটি ছেলে গেসির শিকার হয়েছিল। নিখোঁজ বালকটির খোঁজে সেই ব্যক্তি পুলিশকে অত্যন্ত তাগাদা দিচ্ছিলেন এবং তার সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগান। আবারও সন্দেহ এসে পড়ে গেসির ওপর। এবার পুলিশ গেসির জনপ্রিয়তা ও সামাজিক অবস্থান উপেক্ষা করে তার বিলাসবহুল বাগানবাড়িতে তল্লাশি চালায়। ১৯৭৮ সালে ডিসেম্বরে তাকে

গ্রেফতার করা হয়। তার বাড়িতে পুলিশ ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দল চিরুনি অভিযানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গেসির জিজ্ঞাসাবাদে তার প্রতি যথেষ্ট কঠোরতা প্রদর্শন করে সকল সত্য উদঘাটন করে পুলিশ। বাধ্য হয়ে গেসি ম্যাপ এঁকে পুলিশকে দেখিয়ে দেয় কোথায় মাটিচাপা দেওয়া আছে ২৮টি মৃতদেহ। সে তার বাড়ির সৌন্দর্যমণ্ডিত বাগানে নিয়মনিষ্ঠভাবে ২৮টি যুবক ও বালককে সমাধিত করেছিল। আরও ৫টি ছেলের লাশ সে ডেস প্লেইনস নদীতে (Des Plains) ছুঁড়ে ফেলেছিল। নদীর কাছেই ছিল তার আলিশান বাগান বাড়িটি। সুদৃশ্য বাগানবাড়িটি ৩৩টি মৃত্যুর সাক্ষী ছিল। পুলিশ ম্যাপের সাহায্যে গেসির বাগান খোঁড়ার কাজ শুরু করল। আতঙ্কিত প্রতিবেশীরা দেখল, কীভাবে তিন দিনের খোঁড়াখুঁড়ির পর গেসির দৃষ্টিনন্দন পরিচ্ছন্ন বাগানের মাটির নিচ থেকে বের হয় ২৮টি ছেলের মৃতদেহ। বাকি ৫টি মৃতদেহ খুঁজে বের করার জন্য অসংখ্য পুলিশ ডুবুরিকে নদীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকদিনের দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় পাঁচটি মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ নদী থেকে তোলা হয়।

গেসির Modu's Operandi (মোডাস অপারেন্ডি; হত্যাকৌশল) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পুলিশের বেশ কয়েক মাস লেগে যায়। ছোটবেলা থেকেই তার পুলিশি জিনিসপত্রের প্রতি আকর্ষণ ছিল এবং এ ধরনের খেলনাই তার পছন্দ ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরও এর পরিবর্তন হয়নি। তার কাছে বিভিন্ন বন্দুক, হাতকড়া ও অন্যান্য জিনিসপত্রও ছিল। প্রথমদিকে যখনই সে কোনো ছেলেকে তার বাড়িতে নিয়ে আসত, সে তার বিশ্বাস জয় করার জন্য তার সাথে হাত সাফাইয়ের খেলা খেলত। এরপর তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিত হাতকড়া খোলার কৌশল দেখানোর জন্য এবং তাকে আশ্বস্ত করত, কয়েক সেকেন্ড পরেই হাতকড়া খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু গেসির অধীনে যাওয়া মাত্রই তাকে বর্বর সমকামী ধর্ষণের শিকার হতে হতো। হাতকড়া খোলার কৌশল শেখার বদলে সে শুনত গেসি বলছে, "হাতকড়া থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হলো তার চাবি। এটিই হলো আসল কৌশল।" এরপর অসংখ্যবার ধর্ষণ করে হত্যা করা হতো হতভাগা ছেলেটিকে। হাতকড়ার কৌশলের পর সে শুরু করে দড়ির কৌশল। সে তার শিকারের গলায় একটি দড়ি বেঁধে তাতে দুটি গিট বাঁধত। এরপর গিটের ফাঁক দিয়ে একটি কাঠের টুকরো রেখে তা বাঁকিয়ে ফেলত। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে যেত এবং তাকে গেসির পাশবিকতার শিকার হতে হতো। কাঠের টুকরোটি আরও বাঁকালে শিকারের মৃত্যুবরণ করতে খুব বেশি সময় লাগত না।

১৯৭৯ সালে গেসির মামলার শুনানিতে শিকাগোর ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি উইলিয়াম কাঙ্কল (District Attorney William Kunkle) তাকে অসুস্থ মানসিকতার জঘন্য অপরাধী বলেন। এসব পরিকল্পিত হত্যার দায়ে গেসির মৃত্যুদণ্ডের প্রার্থনা

করেন। কিন্তু তখন ইলিনোয়িস রাজ্যে তর্ক চলছিল এ ধরনের কৌশলে সংঘটিত হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়ার রীতি চালু করা যাবে কিনা। প্রতিরক্ষার আইনজীবী স্যাম অ্যামিরান্টে (Sam Amirante) বলেন যে, হত্যা করার সময় গেসি উন্মত্ত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিল। তার ভিতরে জমা বিদ্বেষ ও সমকামিতার প্রবলতা তার চেতনাকে লুপ্ত করে দিত, যার ফলে এত লম্বা সময় ধরে সে এতগুলো খুন করেছে। শেষ পর্যন্ত গেসিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

দ্য ভ্যাম্পায়ার কিলার

ডোনাল্ড ম্যাকসোয়ান (Donald Mcswann) তার বন্ধুর পিছু পিছু তার কর্মশালায় প্রবেশ করল। সে যেন কর্মশালা নয়, এক মৃত্যুগুহায় আসল, জন হে'র (John Haigh) মৃত্যুগুহা। ডোনাল্ড লন্ডনে একটি পিনবল আর্কেড (Pinball Arcade; পিনবল খেলার জায়গা বিশেষ) চালাত এবং জন সেখানে মাঝে মাঝে মিস্ত্রীর কাজ করত। তার কাছে জন সব সময়ই তার কর্মশালার কথা বলে গর্ব করত। আসলেও সেটি ছিল গর্ব করার মতো একটি কর্মশালা। সেখানে সব ধরনের মিস্ত্রীর জন্যই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মজুদ ছিল– রং মিস্ত্রীর, ঝালাই মিস্ত্রীর, ধাতব বস্তুর মিস্ত্রীর, রাজমিস্ত্রীর এমনকি খুনিদেরও। ঢুকেই ডোনাল্ডের চোখ পড়ল ৪০ গ্যালন আয়তনের সালফিউরিক এসিডের পাত্রটির দিকে। সে অবাক হয়ে জনকে প্রশ্ন করল যে, এত বড় পাত্র ও এত পরিমাণ এসিড কী কাজে লাগে, কিন্তু জবাব পেল না। হঠাৎ তার পেছন থেকে জন হিংস্রভাবে একটি ভারী হাতুড়ি ঘুরিয়ে সোজা তার মাথায় আঘাত করল। জন তার প্রথম শিকারকে এক আঘাতেই হত্যা করল।

পরবর্তী সময়ে যখন জন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, তার স্বীকারোক্তিতে বলে যে, ডোনাল্ডকে মারার পর সে তার বেশ খানিকটা রক্ত পান করেছিল। এরপর সারারাত ধরে তার চামড়া যতটা সম্ভব ছাড়িয়ে রক্তাক্ত দেহটিকে সালফিউরিক এসিড ভর্তি পাত্রে ফেলে দেয়। প্রচণ্ড বুদ্বুদের সাথে দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া বের হতে থাকে পাত্রটি থেকে। দুর্গন্ধে টিকতে না পেরে সে বাধ্য হয়ে দৌড়ে বাইরে চলে যায় মুক্ত বাতাসের প্রয়োজনে। তখন সকাল পেরিয়ে সূর্য প্রায় মাথার ওপরে। পরদিন দুপুরের মধ্যে সেই এসিডের পাত্রে ডোনাল্ডের দেহাবশেষ থকথকে আঠালো পদার্থে পরিণত হয়। কর্দমার স্তূপের মতো দেহাবশেষটি দেখে কেউ চিন্তাও করতে পারবে না যে, এটি কখনো একটি মানবদেহ ছিল। জন সেই বীভৎস অবশিষ্টাংশগুলো বালতিতে করে ভূগর্ভস্থ একটি ম্যানহোলে ঢেলে দেয়। ডোনাল্ডের দেহ ভয়ানক নোংরা হিসেবে নর্দমায় মিশে গেল।

তখন সেপ্টেম্বর মাস, ১৯৪৪ সাল এবং ডোনাল্ডের কোন খবর নেই। কেউ তার অন্তর্ধানের কারণ ভেবে পাচ্ছিল না। জনের 'মার্ডার ফর প্রফিট' পরিকল্পনা সফলভাবে এগিয়ে চলছিল। ডোনাল্ডের বৃদ্ধ বাবা-মা যখন বার বার তার কাছে

এসে ছেলের খোঁজ করছিল, সে তাদের আশ্বস্ত করেছিল এই বলে যে, ডোনাল্ড যুদ্ধের জন্য স্কটল্যান্ডে লুকিয়ে আছে। যুদ্ধ শেষ হলেই ফিরে আসবে। এ কথাটি বিশ্বাসযোগ্য করতে সে কয়েক সপ্তাহ পর পর স্কটল্যান্ডে গিয়ে ডোনাল্ডের নাম নিয়ে তার বাবা-মার উদ্দেশে চিঠি পাঠাত। এরই ফাঁকে সে ডোনাল্ডের পিনবল আর্কেডের ব্যবসাটি চালাত। তখন যুদ্ধকালীন ভিড়ে লোকজন উপচে পড়ছিল, যার কারণে ব্যবসা অনেক ভালো চলছিল। জন দু'হাতে পিনবল আর্কেড থেকে টাকা আয় করতে থাকল। কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এই টাকা যথেষ্ট ছিল না। বিলাসবহুল জীবনযাপনের ইচ্ছা ও লালসায় আবারও সে 'মার্ডার ফর প্রফিট' পদ্ধতি বেছে নিল। এবার তার শিকার হলো ডোনাল্ডের হতভাগ্য বাবা-মা। সে ডোনাল্ডের নাম নিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়ে তার বাবা-মাকে অনুরোধ করল, তারা যেন তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু জন হে'র কর্মশালায় তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ছেলের জন্য উদ্বিগ্ন বাবা-মা ১৯৪৫ সালে ১০ জুলাইয়ের কালরাতে জনের কর্মশালায় যায়। ছেলেকে দেখার ইচ্ছা পূরণ তো হলোই না বরং ভয়ংকর হাতুড়ির আঘাতে তাদের মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়। রক্তাক্ত দেহ দু'টিকে একই কায়দায় এসিডের পাত্রে ছুড়ে ফেলা হয়। তাদের পঁচাগলা অবশিষ্টাংশ একই ম্যানহোল দিয়ে নর্দমায় ঢেলে দেওয়া হয়। দক্ষিণ লন্ডনের ক্রলিতে (Crawley, South London) অবস্থিত এই স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মশালা আরও দু'টি খুনের সাক্ষী হয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল।

জাল দলিলপত্র ও চিঠি ব্যবহার করে জন অনেক কিছু অর্জন করল। পাঁচটি বাড়ি এবং ইন্স্যুরেন্সের মোটা টাকা সবই তার নামে হস্তান্তরিত হয়। তবে তার জুয়ার নেশা, ভোগপরায়ণতা ও বিভিন্ন ব্যবসায় অবিবেচকতা ও অমিতব্যয়ীতার কারণে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই সে প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ল। টাকার জন্য আবারও তার মধ্যে নিষ্ঠুর দানব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সে হন্যে হয়ে শিকার খুঁজতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে এক হাসিখুশি কমবয়সী দম্পতিকে শিকার হিসেবে নিশানা করে। হাসিখুশি ডা. আর্চি হ্যান্ডারসন (Dr. Archie Henderson) ও তার স্ত্রী রোজালি (Rosalie) কিছুদিনের মধ্যেই তার সাথে বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে গেল। সে তাদের বাসায় যাতায়াত শুরু করল। একদিন সে তাদেরকে তার কর্মশালা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। হতভাগা দম্পতি তাদের পরিণতি না জেনে জনের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। বলা যায় যে, নিজেদের মৃত্যুকে কাছে ডেকে আনে। নির্দিষ্ট দিনে তারা জনের কর্মশালায় যায় এবং দু'জনেই মৃত্যুবরণ করে। ভারী মুগুরের আঘাতে তাদের হত্যা করা হয়। রক্তপিপাসু জন পিশাচের মতো তাদের রক্ত পান করে এবং তাদের এসিড ট্যাঙ্কে ফেলে দেয়। এবার ট্যাঙ্কটি ছিল আরও বড়, ৪৫ গ্যালন। একইভাবে তাদের দেহাবশিষ্ট নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়। আবারও প্রচুর টাকার মালিক হয় জন। ১৯৪৯ সালের মধ্যেই

সে বেশ ভালোরকম সম্পত্তি গুছিয়ে ফেলে এবং প্রচুর টাকা জমায়। তার ব্যবসাও ভালো চলছিল, কিন্তু তারপরও তার মনে হচ্ছিল যে, আরও একটি শিকার দরকার।

সে যদিও বিলাসবহুল জীবনযাপন করছিল তবুও আরও একটি শিকারের ব্যবস্থা করে। এবার সে আগের চেয়ে বেশি সাবধান হয়ে ও বেশি ধূর্ততার সাথে কাজ করছিল। তার এবারের নিশানা ছিল ৬৯ বছর বয়স্ক বিধবা মিসেস অলিভ ডিউর‍্যান্ড ডিকন (Mrs. Olive Durand Deacon)। তার স্বামী তার নামে ৪০ হাজার পাউন্ড রেখে গিয়েছিল। সে লন্ডনে যে হোটেলে থাকত জন সেখানেই গিয়ে থাকা শুরু করল। এক মাসের মধ্যে সে মিসেস অলিভের সাথে বেশ ভালো পরিচিত হয়ে যায়। সে বিশ্বাস করেছিল যে, নিজস্ব ব্যবসার পাশাপাশি জন বিভিন্ন উদ্ভাবনী যন্ত্রপাতি তৈরি করে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছে। সে জনকে নকল প্লাস্টিকের নখ বানানোর ব্যবসার পরামর্শ দিলে জন তাতে আগ্রহ দেখায়। সে ব্যবসার ব্যাপারে আলাপ করার জন্য মিসেস অলিভকে তার কর্মশালায় এসে সবকিছু ঘুরে দেখার আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারির এক শীতের রাতে জন বৃদ্ধা বিধবাকে তার কর্মশালায় গাড়িতে করে নিয়ে আসে। সেখানে নিয়ে মাথায় গুলি করে তাকে হত্যা করা হয় এবং তারও একই পরিণতি হয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা জন পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি হিসেবে দিয়েছিল এবং তা আদালতে তার মামলার শুনানিতে পড়ে শোনানো হয়। জনের স্বীকারোক্তিটি ছিল এরূপ–

অ্যামি ম্যাকসোয়ান; হেন্ডারসন দম্পতি, মিসেস অলিভ

"তার নকল নখের প্রতি আগ্রহের কারণে প্রলোভিত করলাম আমার কর্মশালায় আসতে। তাকে নিয়ে এসে প্রথমে স্টোররুমে যাই, তাকে কিছু যন্ত্রপাতি দেখতে ব্যস্ত করে আমি আমার বন্দুকটি আনতে যাই। ফিরে এসে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে তার মাথার পেছনে গুলি করি। এরপর আমি গাড়ি নিয়ে বাইরে যাই গ্লাস আনতে। তারপর বৃদ্ধার গলার পাশে একটি ছিদ্র করি, সম্ভবত ছোট একটি পকেট ছুরি দিয়ে। তার গলা থেকে এক গ্লাস রক্ত নিয়ে আমি তা পান করে ফেললাম। এরপর তার কোট খুলে গা থেকে সকল গহনা যেমন– কানের দুল, মালা, আংটি ইত্যাদি খুলে নিলাম। এরপর আমি তাকে এসিডের পাত্রে ফেলে রাখি। তার হাতব্যাগটি পাত্রে ফেলার আগে ভেতরের টাকা-পয়সা এবং একটি কলম সরিয়ে ফেলি। ব্যাগটি পাত্রে ফেলে দিয়ে পাম্পের সাহায্যে পাত্রে সালফিউরিক এসিড ঢালতে থাকি। পাত্রটি পূর্ণ হয়ে গেলে আমি দেহটিকে এসিডের সাথে বিক্রিয়া করতে দিয়ে বেরিয়ে আসি।

ওহ! ভুলেই গিয়েছিলাম। আগেই বলা উচিত ছিল। মহিলাকে এসিডের পাত্রে ফেলে আমি এনশিয়েন্ট প্রাইয়র'স (Ancient Prior's) এ গিয়েছিলাম এক কাপ চা খেতে। এরপর এসে ট্যাঙ্কে এসিড ঢালি।" মিসেস অলিভের দেহ সম্পূর্ণ গলে

যেতে বেশ কয়েক দিন সময় লেগেছিল। এর মধ্যে দুইবার জন কর্মশালায় এসে দেখে গিয়েছে তার এসিড পাত্রের অবস্থা।

এদিকে মিসেস অলিভকে খুঁজে না পেয়ে হোটেলে বেশ তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ জনসহ হোটেলের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। জনের সদাপ্রস্তুত ও অতিরিক্ত সাহায্যপূর্ণ আচরণে গোয়েন্দাদের সন্দেহ হয় ও তারা জনের অতীতের রেকর্ডস ঘেটে দেখেন। বের করল যে, ৩৯ বছর বয়স্ক জনের বিরুদ্ধে এর মধ্যে জালিয়াতির মামলা আছে। তারা খুনি সন্দেহে জনকে গ্রেফতার করল। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সে খুনের কথা স্বীকার করল এবং নিশ্চিতভাবে এও বলল যে, তাকে কখনো অপরাধী প্রমাণ করা সম্ভব নয়, কেননা পুলিশ তার কোনো শিকারের কোন অবশিষ্টাংশ বা চিহ্ন খুঁজে পাবে না। কিন্তু সে ভুল ছিল। লন্ডনের পুলিশ অসংখ্য ফরেনসিক বিজ্ঞানীকে কাজে লাগিয়ে দিল। তারা জনের কর্মশালার সেই ম্যানহোল ও নর্দমার কদর্ম সম্পূর্ণ বের করে কর্মশালার আঙিনায় এনে রাখে। রাতদিন পরীক্ষা করে তারা শেষপর্যন্ত সেই পঁচাগলা কর্দম থেকে একটি গলস্টোন (Gallstone; পাথুরি-রোগ), পায়ের একটি অংশ, একটি হাতব্যাগের কিছু অংশ এবং প্রায় সম্পূর্ণ একপাটি নকল দাঁত খুঁজে পায়। এসব জিনিস মিসেস অলিভের চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করা হলে তিনি নিশ্চিত করেন যে, এগুলোর মালিক হলো সরলমনা মিসেস অলিভ। তার ডেন্টিস্টের কাছে দাঁতের পাটিটি নিয়ে গেলে সেও নিশ্চিতভাবে বলে যে, সেটি মিসেস অলিভেরই নকল দাঁতের পাটি। এসব প্রমাণ মিলে যাওয়ায় জনকে অপরাধী প্রমাণ করার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ রইল না।

জনের মামলার শুনানিতে তার প্রতিরক্ষার আইনজীবী বলেন যে, জন পাগল এবং সে পরিকল্পিতভাবে খুন করেনি। তার হিংস্রতার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, জনের কঠোর অসুখী শৈশবের কথা। জনের পিতা-মাতা প্লাইমাউথ ব্রিথ্রেনের (Plymouth Brethren, নিয়মনিষ্ঠ খ্রিস্টানদের একটি সম্প্রদায়) সদস্য ছিল। তার শিকারদের রক্ত পান করার প্রবণতাকে পাগলামির স্পষ্ট লক্ষণ বলে প্রমাণ করার চেষ্টাও করেন। পত্র-পত্রিকায় তাকে 'দ্য ভ্যাম্পায়ার কিলার' নামে ডাকা হচ্ছিল এবং ব্যাপক লেখালেখি হচ্ছিল। তবে ব্রিটিশ জুড়ি এবং বিচারপতি জনের এই রক্তলোলুপ বৈশিষ্ট্যকে পাগলামির প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলেন না। দুই দিন ধরে চলে এই মামলা। শেষ পর্যন্ত সকল প্রমাণের আলোকে মিসেস অলিভ ডিউর‍্যান্ড ডিকনের হত্যার দায়ে জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। রায় ঘোষণার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তার কিছু বলার আছে কি না, উত্তরে সে শুধু বলে, "একদম কিছু না।" ১৯৪৯ সালের ৬ আগস্ট তাকে ওয়ার্ন্ডসওয়ার্থ কারাগারে (Wandsworth Prison) ফাঁসি দেওয়া হয়। শেষ হয় এক রক্তশোষক পিশাচের কাহিনি।

দ্য এ সিক্স লে-বাই মার্ডারার

ব্রিটেনে 'দ্য এ সিক্স মার্ডার' নিয়ে যতটা তর্কাতর্কি ও মতভেদ দেখা গিয়েছিল তা হয়তো আর কোনো হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে হয়নি। এ ঘটনার জন্য ব্রিটিশ আইন ইতিহাসে সবচেয়ে লম্বা ও দীর্ঘতম শুনানিতে এক অশিক্ষিত ও দুর্বলচিত্তের তুচ্ছ অপরাধীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তার নাম ছিল জেমস হ্যানর‍্যাটি (James Hanratty)। এরপর সম্মানিত লেখকদের একটি দল ব্যাপক প্রচারকার্য চালায় জনগণের মনে এই বিশ্বাস আনতে যে, ব্রিটিশ বিচারপতিরা ভুল মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

১৯৬১ সালের ২২ আগস্টের ভোরে বাকিংহামশায়ারের রোড রিসার্চ ল্যাবরেটরির (Road Research Laboratory, Buckinghameshire) দু'জন বিজ্ঞানী মরিস মাইনর (Morris Minor) গাড়ির সামনের সিটে বসে হাসাহাসি করছিল। তারা তখন টেমস নদীর তীরবর্তী ডরনি রিচে (Dorney Reach) ছিল। গাড়িটি উইন্ডশর ও মেইডেনহেডের (Windsor, Maidenhead) এর মাঝামাঝি এক স্থানে থামানো হয়েছিল। মাইকেল গ্রেগস্টেন (Michael Gregsten) ছিল ৩৮ বছর বয়স্ক এক বিবাহিত পুরুষ ও তার দু'টি সন্তান ছিল। তার সঙ্গী ভ্যালেরি স্টোরি (Valerie Storie) ছিল ২৩ বছর বয়সী এক আকর্ষণীয় তরুণী। হঠাৎ একটি আওয়াজে তাদের আলাপে বাধা পড়ে। আওয়াজটি এসেছিল গাড়ির চালকের আসনের জানালার পাশ থেকে। শব্দ পেয়ে মাইকেল উঁকি দিয়ে দেখতে গেলে একটি লোক তার দিকে বন্দুক তাক করে এবং গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। আতঙ্কিত হয়ে তারা ভাবল যে হয়তো ডাকাতির উদ্দেশে লেকাটি এসেছে। তারা তাকে টাকা-পয়সা, ঘড়ি-গহনা সাধল এবং তাদের ছেড়ে দিতে অনুরোধ করল। লোকটি তাদের কথা কানে না তুলে একদম শেষের সিটে গিয়ে বসল এবং হুমকি দিল, কেউ তার দিকে তাকালেই গুলি করবে। বন্দুকটি নিয়ে খেলা করতে করতে সে বলল, "আমি এখন একটু দৌড়ের ওপর আছি। ব্রিটেনের প্রত্যেকটি পুলিশ এখন আমায় খুঁজছে।" কঠোরভাবে হুমকি দিয়ে গেলেও তাকে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনে হচ্ছিল।

এরপর বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে সে মাইকেলকে গাড়ি চালানোর আদেশ দেয়। সে গাড়ি চালানো শুরু করলে ভয়ংকর লোকটি তাকে তাগাদা দিতে থাকে জোরে চালানোর জন্য। বেশ জোরে চালিয়ে তারা প্রায় ৩০ মাইল রাস্তা পাড়ি দেয়। পথিমধ্যে তারা লন্ডনের গ্রামাঞ্চল, স্লোও (Slough), হেইস (Hayes) এবং স্ট্যানমোর (Stanmore) পার করে। হালকা কিছু খাবার ও পেট্রোলের প্রয়োজন ছাড়া কোথাও গাড়ি থামানো হয়নি। মাইকেল ভয়ে কাঁপছিল, পেছনে বসে থাকা লোকটির নির্দেশমতো গাড়ি চালাতে চালাতে সে মাঝে মাঝে মুক্তির উপায়ও ভাবার চেষ্টা করছিল। পুলিশ চেকপোস্টগুলো যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ ছিল তার। যখন তারা এ ফাইভ (A5) সড়কে সেন্ট অ্যালবানসের (St. Albans) পথে মাইকেল তখন বার বার হেডলাইড জ্বালিয়ে বন্ধ করছিল এই আশায় যে, কোনো পুলিশ হয়তো তা খেয়াল করে তাকে উদ্ধার করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, ওই সময়টিতে সেখানে কোনো পুলিশ তার নজরে পড়েনি। অগত্যা ভয়ে ভয়ে তাদের এগিয়েই যেতে হলো। যখন গাড়ি সবেগে এ সিক্স (A6) সড়ক সেন্ট অ্যালবানস ও লিউটনের (Luton) মাঝামাঝি এলাকায় চলছে লোকটি মাইকেলকে গাড়ি থামাতে বলে। সে বলল যে তার একটু ঘুমানো দরকার। সে ভ্যালেরিকে গাড়ির ভেতরের হ্যান্ডেলে বেঁধে ফেলল। এরপর মাইকেলের কাছে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য একটি ছোট ব্যাগ দিতে বলে। যখনই সে ব্যাগটির কাছে যায় নিষ্ঠুর লোকটি মাইকেলের মাথায় দুটি গুলি করে। সাথে সাথে মৃত্যু হয় তার। বন্ধুর মৃত্যুতে আর্তনাদ করে কেঁদে উঠে ভ্যালেরি বলে, "শয়তান পিশাচ কোথাকার, এ তুই কী করলি?" পৈশাচিক অট্টহাসি দিয়ে সে উত্তর দেয়, "এই ছেলেটি একটু বেশি দ্রুত কাজ করছিল, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।" মাইকেলের শরীরের রক্তে গাড়িটি ভেসে যাচ্ছিল। লোকটি আর্তনাদরত ভ্যালেরিকে জোর করে টানতে টানতে পেছনের সিটে নিয়ে তাকে প্রায় বিবস্ত্র করে এবং মৃত্যুভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে। এরপর সে ভ্যালেরিকে আদেশ করে মাইকেলের মৃতদেহটি গাড়ি থেকে নামিয়ে রাস্তার কিনারে রাখতে। বাধ্য হয়ে সে তাই করে। মাইকেলের মৃতদেহের পাশে সে আতঙ্কে ও কষ্টে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। ভয়ংকর খুনিটি তখনো কী করবে তা নিয়ে নিজের সাথে কথা বলে যাচ্ছিল। ভ্যালেরি শেষপর্যন্ত তাকে সব টাকা পয়সা ও গাড়িটি দিয়ে বলে তাড়াতাড়ি চলে যেতে। লোকটি টাকাটা নিয়ে চলে যাবার ভান করে। হঠাৎ পিছে ঘুরে সে ভ্যালেরির উদ্দেশে এলোপাতাড়ি কয়েকটি গুলি করে। একটি গুলি তার ঘাড়ে এসে বিদ্ধ হলে সে মৃতের ভান করে পড়ে থাকে। হিংস্র খুনিটি আবার এসে পরীক্ষা করে দেখে যে, সে মৃত কি না। ভ্যালেরিকে মৃত ভেবে সন্তুষ্ট হয়ে সে গাড়িটি নিয়ে চলে যায়। তার আবির্ভাব ও একটি খুনের শেষ সাক্ষীটিকে হত্যার খুশিতে সে আপন মনেই হাসতে থাকে। লোকটি চলে যাবার পর ভ্যালেরি বহু

কষ্টে উঠে বসে। ব্যস্ত রাস্তার কোনো গাড়ির চালকের কানে তার চিৎকার পৌঁছেনি। শেষপর্যন্ত সে তার পরনের লাল কাপড়টি খুলে তা নাড়িয়ে চালকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে কিন্তু অন্ধকারে তা কারো চোখে পড়েনি। চেষ্টায় ব্যর্থ হতে হতে একপর্যায়ে সে রাস্তার কিনারেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়।

সৌভাগ্যবশত ভোর ৬.৩০ মিনিটে এক কিশোর সেই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তাকে দেখতে পায়। সাথে সাথে সে ভ্যালোরিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। পুলিশ এসে মাইকেলের মৃতদেহ উদ্ধার করে। হাসপাতালে ভ্যালেরির জ্ঞান ফিরে আসে এবং কিছুটা সুস্থ হবার পর সে অপেক্ষমাণ পুলিশকে যা যা ঘটেছিল তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে। তার ঘাড়ে লাগা গুলিটি তাকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয় এবং তার বাকি জীবন কাটাতে হয় হুইলচেয়ারে করে। তবে এই আঘাত তার স্মৃতি বা মানসিকতার কোনো ক্ষতি করেনি। ভ্যালেরির বর্ণনার সাহায্যে খুনির একটি Identikit ছবি আঁকা হয়। আরও একটি ছবি আঁকানো হয় মাইকেলের গাড়ি পরিত্যাগ করতে যারা তাকে দেখেছে তাদের বর্ণনার সাহায্যে। গাড়িটি পাওয়া যায় এসেক্সের আইলফোর্ড (Ilford, Essex) এলাকায়। পুলিশ কোনো সূত্র বা তথ্য অনুসন্ধানে হন্যে হয়ে তদন্ত করতে থাকে। তারা আশপাশের সব হোটেলগুলোতে আগন্তুককে খুঁজে বেড়াতে থাকে। শেষপর্যন্ত পিটার লুইস অ্যালফনকে (Peter Louis Alphon) সন্দেহ করা হয়। সে মাইডা ভ্যালের ভিয়েনা হোটেলে (Vienna Hotel, Maida Vale) উঠেছিল। তার ঘর থেকে দু'টি ০.৩৮ বুলেট পাওয়া যায়। ব্যালিস্টিকস (Ballistics, অস্ত্রবিজ্ঞান) বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করেন যে, মাইকেল ও ভ্যালেরির দেহ থেকে পাওয়া বুলেট ও এই বুলেট একই রকম। গ্রেফতার করা হয় পিটারকে। কিন্তু শনাক্তকরণের সময় ভ্যালেরি পিটারকে খুনি হিসেবে সনাক্ত করেনি। সে প্রথমে যাকে সনাক্ত করে সে আসল অপরাধী ছিল না। Identikit ছবির সাথে পিটারের তেমন মিল ছিল না। মিলেনি জেমস হ্যানর‍্যাটির সাথেও। প্রথমে ভ্যালেরি তাকেও শনাক্ত করেনি। যদিও পুলিশ রেকর্ডে তার নাম ছিল। তবুও তাকে সন্দেহ করা হয়নি; কেননা সে ছোটখাটো অপরাধের জন্য পরিচিত এক নগণ্য আসামি ছিল। তাকে পুলিশ তাড়া করছিল ঠিকই কিন্তু এসব খুনের খলনায়ক বা কুখ্যাত হিসেবে কেউ কখনো ভাবেনি। তবে সে নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যবস্থা ঠিকই করেছিল। এদিকে হাসপাতালে ক্রমাগত ভ্যালেরির নামে হুমকি দিয়ে বার বার ফোন করতে থাকে কেউ একজন। অজ্ঞাতনামা এই ব্যক্তিকে নিয়ে পুলিশ বিপাকে পড়ে যায়। ভ্যালেরিকে সুরক্ষিত রাখতে প্রতিরাতে তাকে নতুন স্থানে পুলিশ পাহারায় রাখা হতো। একদিন জেমস হ্যানর‍্যাটি ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট অ্যাকোটকে (Acott) ফোন করে। অ্যাকোট এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন। তাকে জেমস বলে যে, এসিক্স হত্যাকাণ্ডের

ঘটনায় তাকে খুনি হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে বলে তার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সে বার বার বলে যে সে এর সাথে কোনো ভাবেই জড়িত ছিল না। যেহেতু ফোনকলটি ছিল পুরোই অযাচিত। তাই অ্যাকোট তাকেই সন্দেহ করে। এর কারণে জেমস এই মামলার প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য কাজে লেগে যায় পুলিশ। পুলিশ উদঘাটন করল যে, তার একটি সহকারী ছিল, চার্লস ফ্রান্স (Charles Franie) ও বছরের শুরুর দিকে তার কাছে একটি ০.৩৮ এনফিল্ড রিভলবার (0.38 Enfield Revolver) থাকার ব্যাপারে পুলিশের কাছে খবর ছিল। তখন সেটি তার কাছে খুঁজে পায়নি তারা। পরে এসিক্স মার্ডারের তদন্তের সময় সেটি পাওয়া যায় লন্ডনের ৩৬নং বাসের ওপরের তলার একদম পিছনের সিটের পিছে লুকানো অবস্থায়। পুলিশ ভাবল সে জায়গাটিকে নিরাপদ ভাবছিল এবং নিশ্চিত হলো যে, চার্লস যে ওই বাসের ড্রাইভার ছিল সে তার সহকারী ছিল। পুলিশ আরও অনুসন্ধান করে বের করে যে, জেমস যেদিন ভিয়েনা হোটেলে ঘর ভাড়া করে তার ঠিক আগের রাতেই সেই ঘরে পিটার ছিল জে, রায়ান (J. Ryan) নাম নিয়ে। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, মাইকেলের বিধবা স্ত্রীও তাকেই তার স্বামীর হত্যাকারী বলছিল। সবাই অবাক হলো এটা ভেবে যে, তার পক্ষে কীভাবে জানা সম্ভব, সে তো আর ঘটনার সাথে জড়িত নয়। অবশেষে জেমসকে ৯ অক্টোবর ব্ল্যাকপুলে (Blackpool) গ্রেফতার করা হয়। তাকে এনে শনাক্তকরণের জন্য ভ্যালেরির সামনে আনা হলো। ভ্যালেরি শেষে বলেছিল যে খুনির চোখগুলো ছিল নীল, যা পিটার ও জেমস দু'জনের সাথেই মিলে যায়। আরও কয়েকজন সন্দেহভাজনকেও আনা হয়েছিল। এতগুলো উদঘাটন লোকের মধ্যে ভ্যালেরি আবারও সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারছিল না। শেষপর্যন্ত সে সবাইকে একটি বাক্য বলতে বলল, যা খুনি বার বার তাদের বলছিল। সে তাদের সবাইকে বলতে বলল, "Be quiet, will you? I am thinking." জেমস সবসময়ই thinking এর স্থলে finking উচ্চারণ করত। যখনই সে finking শব্দটি বলে ওঠে ভ্যালেরি তাকে শনাক্ত করে ফেলে।

১৯৬২ সালের ২২ জানুয়ারি জেমসের বিচারকার্য শুরু হয়। জেমসের প্রতিরক্ষা পক্ষের উকিল পুলিশের কাজে অঙ্গুলিনির্দেশ করে এবং তাদের বেশ হয়রানিও করে। সে বলে যে, পুলিশ রহস্য উদঘাটন না করে জেমসকে ফাঁসিয়ে তাদের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাচ্ছে। ভ্যালেরি বার বার শনাক্তকরণে ব্যর্থ হচ্ছিল এবং খুনির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য একদম শেষ সময়ে বলে যার কারণে প্রতিরক্ষা উকিল এ কথা বলার সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত জেমস নিজের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করতে পারেনি। যদিও সে বার বার দুর্বলভাবে বলেছে যে, সে খুন করেনি তার মধ্যে ভয় ও দ্বিধা দুইই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তার সাথে কারাগারে থাকা অন্য একটি আসামি যার এই মামলার সাথে কোনো যোগসূত্র

নেই এমন সব তথ্য দেয়, যা ভ্যালেরি ও পুলিশ ছাড়া একমাত্র খুনিরই জানার কথা। সে জানায় যে তাকে এসব জেমস বলেছে। বেশ কয়েক বছর ধরে জেলে থাকা কয়েদিটির সাথে জেমস ছাড়া সেদিন আর কেউ ছিল না। ফলে জেমসের অপরাধ বলতে গেলে প্রমাণিত হয়ে যায়। জেমস আদালতে বলে যে, খুন সংঘটিত হওয়ার রাতে সে তার বন্ধুবান্ধবের সাথে লিভারপুলে ছিল। যখন তাকে তার বন্ধুদের নাম ঠিকানা দিতে বলা হলো, সে এসব দিতে অস্বীকার করল। বলল যে, তার বন্ধুরা এসব ব্যাপারে জড়িত হলে তার প্রতি তারা বিশ্বাস হারাবে।

এরপরই সে আবার বলে যে, সেদিন লিভারপুলে নয় নর্থ ওয়েসসের রাইলে (Rhyl, North Wales) ছিল। সেক্ষেত্রেও সে কোনো উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারেনি। এই মামলাটি প্রমাণের ক্ষেত্রে তখন জটিলতা দেখা দেয়। ঘন ঘন মতামত ও কাহিনি বদলে বেশ সন্দেহের উদ্রেক ঘটে এবং এ মামলার বিচারকার্য চলে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১১ তারিখ প্রায় সাড়ে নয় ঘণ্টাব্যাপী চলে এ মামলার শুনানি। শেষপর্যন্ত জেমসকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। শেষ মুহূর্তেও জেমস দুর্বলভাবে একবার বলেছিল যে, সে নির্দোষ। কিন্তু তার সব আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া হয়। ২৫ বছর বয়সী জেমসকে এপ্রিলের ৪ তারিখে বেডফোর্ড প্রিজনে (Bedford Prison) ফাঁসি দেওয়া হয়।

কিন্তু আজও অনেকেই এ মামলার রায়ের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে। পিটার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় স্বীকারোক্তি দেয় যে, জেমসের সাজা হওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়, জেমসকে ফাঁসানো হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে সে এসব প্রত্যাহার করে নেয়। আরও উত্তেজনাকর খবর ছিল যে, তখন জেমসের বন্ধু চার্লস রিভলভারটির ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। পরে সে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে এবং রেখে যায় ছোট্ট একটি চিরকুট। তাতে জেমসের মামলা সম্পর্কিত কিছু তথ্য লেখা ছিল যা কখনই আদালতে প্রকাশ করা হয়নি। শুধু তাই নয়, অনেকেই সাক্ষ্য দিতে এসেছিল যে, তারা সে রাত্রে জেমসকে রাইলে দেখেছে। কিন্তু ততদিনে জেমসের ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল।

লুইস ব্লুম-কুপার (Louis Bloom-Cooper) পল ফুট (Paul Foot), লুডেভিক কেনেডি (Ludovic Kennedy) প্রমুখ লেখকেরা তাদের ব্যাপক লেখালেখির মাধ্যমে জেমসকে সেরা Cause celebre (উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো ঘটনার শিকার এমন ব্যক্তির জন্য প্রতিবাদমুখর প্রচার) হিসেবে তুলে ধরেন। টিমোথি ইভানস (Timothy Evans), আরেকজন যাকে এমন ঘটনার শিকার হতে হয়েছিল জন ক্রিস্টির (John Cristie) শয়তানি মিথ্যার জালে। টিমোথির পর আর কাউকে নিয়ে এতটা লেখালেখি ও প্রতিবাদ হয়নি যতটা জেমসের ক্ষেত্রে হয়েছিল। পার্থক্য ছিল এই যে, টিমোথিকে ক্রিস্টি ফাঁসিয়েছিল এবং তাকে মৃত্যুর পরও সম্মানের সহিত ক্ষমা করে নতুন করে কবর দেওয়া হয়

এবং জেমসকে দোষী প্রমাণিত করা হয়েছিল তার নিজের দোষে। সে যদি তার অ্যালিবাই (Alibi, অন্যত্রস্থিতি) বার বার না বদলাত তাহলে তাকে এতটা নিশ্চিতভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যেত না। পরবর্তীতে যারা জেমসের সাথে সংঘটিত ন্যায়হানি ও তাকে ফাঁসি দেওয়া নিয়ে কথা বলছিল তারা গোয়েন্দা কর্মকর্তা অ্যাকটের সাথে একমত পোষণ করে যে, বিগত বছরগুলোর অন্যতম কুখ্যাত খুনিদের একজন সে ছিল।

দ্য ম্যাস মার্ডারার অব হ্যানোভার

১৯২৪ সালের বসন্ত কালে নর্থ জার্মানের একটি শহর হ্যানোভারকে (Hanover) এমন এক ত্রাসের স্রোতে ভাসিয়ে নেয় যা ছিল মধ্যযুগীয় বর্বরতার চেয়েও ভয়ংকর। পুরাতন বসতবাড়িগুলো ও ঘুপচি অলি-গলির মানুষের মুখে মুখে একটি কথাই ছিল যে, একটি ওয়েরউলফ (Werewolf; নেকড়েমানব) বাইরে উন্মুক্ত চরে বেড়াচ্ছে। সে কোন মহাবোকাই হবে যে অন্ধকার হওয়ার পর বাড়ির বাইরে পা রাখে। কেউ কেউ তো এও বলছিল যে এই ওয়েরউলফ ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে নিয়ে জবাই করে ফেলে রাখে তার ভূগর্ভস্থ ঘরে। গৃহিনীরা অদ্ভুত ধরনের মাংস নিয়ে পুলিশ ডাক্তারদের কাছে আসত যা পরীক্ষা করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। আজব ধরনের মাংস তাদের কাছে মানুষের মাংসগুলো বলে মনে হতো যার কারণে তারা ভয়ে পুলিশের শরণাপন্ন হতো। এর সুরাহা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেয় যে, এগুলো 'ম্যাস হিস্টিরিয়া'র কারণে হচ্ছে। এমনকি ১৭ মে'তে যখন লিন নদীর তীরে বাচ্চারা সারি সারি মাথার খুলি আবিষ্কার করে তখন তারা এঘটনাকে মেডিক্যাল ছাত্রদের কারসাজি বলে উড়িয়ে দেয়। শেষপর্যন্ত সকল রহস্যের সমাধান হয় ৪৫ বছর বয়সী গণখুনি ফ্রিটজ হারমানের (Fritz Harmann) মৃত্যুদণ্ড ও তার ২৫ বছর বয়সী সহকারীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মাধ্যমে। একটি ভয়ংকর গুজব শেষপর্যন্ত পরিণতি লাভ করে।

ফ্রিটজ হারমান তার প্রায় সারাজীবন ভবঘুরে ফেরিওয়ালা হিসেবে কাটায়।তার জন্ম ১৮৭৯ সালের ২৫ অক্টোবর হ্যানোভারে। তার জন্মের পর তার মা জন্মদানে অক্ষম হয়ে পড়ে। সে তার মাকে অত্যন্ত ভালোবাসত কিন্তু একইসাথে তার বাবাকে অসম্ভব ঘৃণা করত। তার বাবা যাকে সবাই গোমরা-মুখো ওলি (Olle) বলে চিনত সে ছিল অত্যন্ত রুক্ষ ও কৃপণ একজন ইন্ধনিক (ফার্নেসে যে ব্যক্তি কয়লা ঢালে)। ফ্রিটজের ঘৃণা যখন হিংস্রতায় পরিণত হয় তখন তার বাবা তাকে পাগলা গারদে রাখার চেষ্টা করেন। চিকিৎসকেরা তাকে ফিরিয়ে দেয় এবং বলে যে, ফ্রিটজ রগচটা ও হীনচিত্তের মানুষ তবে পাগল নয় এবং তাকে

পাগলা গারদে ভর্তি করা সম্ভব নয়। বড় হয়ে ফ্রিটজ যখন উপার্জনের পথে নামে সে শহরে শহরে ঘুরে বেড়াত। বিভিন্ন শহরে পুলিশ ও অপরাধীচক্রে সে বেশ জনপ্রিয় চরিত্র ছিল। তার অপরাধী সঙ্গীরা তাকে মূর্খ ভাবলেও সে ছিল দয়ালু ও সাহায্যপরায়ণ মানুষ। সবসময় টাকা ও পরামর্শ দিয়ে তাদের সাহায্য করত যাদের অবস্থা তার চেয়েও গরিব ছিল। পুলিশেরা তাকে পছন্দ করার কারণ হলো যখনই তাকে গ্রেফতার করা হতো সে কোনো ঝামেলা ধস্তাধস্তি না করে ভদ্রভাবে তাদের সাথে হাসা-হাসি ও আলাপ করতে করতে চলে আসত। সে একটি আদর্শ কয়েদিও ছিল, কারাগারের সকল নিয়ম মেনে চলত এবং তা উপভোগও করত। বেশিরভাগ সময়ই তাকে পকেটমার বা ছোট খাট চুরি অথবা ছোট বাচ্চাদের সাথে অসভ্য ব্যবহারের দায়ে গ্রেফতার করা হতো।

১৯১৮ সালে ফ্রিটজ চুরি ও প্রতারণার দায়ে পাঁচ বছর জেল খেটে বের হয়। বেরিয়েই দেখে যুদ্ধপরবর্তী জার্মানির চরম বিশৃঙ্খলা। আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার চরম অবক্ষয়ে যাবতীয় মুনাফাখোর, ভণ্ড-প্রতারক চোর ও খুনিদের রাজত্ব ছিল তুঙ্গে। এসব মানুষের কর্মপন্থা ও মানসিকতাই ফ্রিটজ ভালো বুঝত। পরিস্থিতি দেখে সে নিজের এলাকার হ্যানওভারে চলে আসে এবং এলাকা কন-ম্যানদের (Con-men; প্রতারক। অন্যার্থে, যেসব অপরাধী তাদের মুক্তির বিনিময়ে পুলিশের হয়ে কাজ করে তথ্য জোগাড় করে।) সাথে বেশি সময় কাটানো শুরু করে। এ ছাড়া সে কেন্দ্রীয় রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে বিভিন্ন কালোবাজারে অসৎ ব্যবসায়ীদের সাথেও যোগাযোগ বাড়িয়ে দেয়। স্টেশনের ভেতরে সারা জার্মানি থেকে আসা রিফুজিতে ভরপুর ছিল। আশ্রয়হীন নিঃস্ব ও কর্মহীন কপর্দকশূন্য মানুষগুলো দিনের বেলায় খাদ্যের খোঁজে উন্মুখ হয়ে থাকতো ও চুলার কাছে গুটিসুটি মেরে বসে থাকত। রাত হলে স্টেশনের বেঞ্চগুলোতে গাদাগাদি করে শুয়ে থাকতো। তাদের এই দুর্দশা দেখে তার মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠত। সে জানত কীভাবে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে জীবিকা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু যতই সে এর সাথে অভ্যস্ত হচ্ছিল বুঝতে পারছিল যে আরও বড় সুযোগ তার জন্য অপেক্ষা করছে। এসব মানুষের মধ্যে এমন অনেক ছেলে ছিল যাদের বয়স ১২ এর বেশি হবে না। তাদের বেশিরভাগই তাদের যুদ্ধফেরত কঠোর বাবাদের সাথে বহুবছর আলাদা থাকার পর তাল মিলাতে না পেরে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। ফ্রিটজ তাদেরকে হাতের মুঠোয় আনার চেষ্টা করতে লাগল। সে তাদের দুঃখের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতো, তাদের সাথে হাসিতামাশা করত এবং ভালো পরামর্শ দিয়ে তাদের সাহায্য করে অনায়াসে তাদের মন জিতে নিল। প্রতিটি মানুষকে কঠোরভাবে হিসাব করে সে এমন একটি মানুষের দল আবিষ্কার করল যাদের সংখ্যার কমতি-বাড়তি নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। এসব ছেলেরা চিরতরে উধাও হয়ে গেলেও তাদের বাবা-মা বা পুলিশ খোঁজ করতে আসবে না।

সে ২৭ নং সিলাস্ট্রেসিতে (27, Cellastrasse) একটি বাসা ভাড়া করে সেখানে নতুন ব্যবসা খুলে বসল। সে ব্যবহৃত কাপড় ও মাংস ফেরি করা শুরু করল। সে পাইকারি বিক্রেতাদের কাছ থেকে প্রচণ্ড দরাদরি করে সবচেয়ে কম দামে জিনিস কিনে বিক্রি করত। এলাকার গৃহিণীরা কিছুদিনেই জেনে গেল যে তার ফেরি করা পণ্যগুলোই ছিল সবচেয়ে কমদামী মানসম্মত। ফলে তার ব্যবসায় ভালো লাভ হতে থাকল। তবে প্রতিদিনই সে সন্ধ্যার পর সব কাজ বাদ দিয়ে স্টেশনে সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলেগুলোর সাথে হাসাহাসি ও গল্প করে সময় কাটাত। সে তাদের চকলেট, সিগারেট ও খাবার দিত। এমনকি নতুন আসা ছেলেদের একবেলা খাবার ও একরাতের জন্য বিছানা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাত।

কিছুদিনের মধ্যেই সে এতটা জনপ্রিয় হয়ে গেল যে কল্যাণকর্মীরাও তাকে নিজেদের দলেরই একজন ভাবা শুরু করল। পুলিশও তাকে কাজে লাগাতে চাইল। অপরাধ জগতের সবকিছু সম্পর্কে সার্বক্ষণিক তথ্যের বিনিময়ে পুলিশ তার ছোট খাট কাজগুলোকে অদেখা করে দিত। ফ্রিটজ খুশিমনেই এ কাজ করত। অপরাধজগতের লোকজনের সাথে আন্তরিকতার মাধ্যমে অর্জিত তথ্যভান্ডার পুলিশকে দিতে দিতে একসময় সে সবার মুখে মুখে 'গোয়েন্দা' খেতাব পেয়ে যায়। তবে প্রকৃত সত্য ছিল অন্য কিছু। এই 'গোয়েন্দা'কে সদালাপী হিতকারী মনে হলেও সে ছিল এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ধাপ্পাবাজ। না, তার গোয়েন্দাগিরিতে কোনো খাদ ছিল না। আসল সত্য ছিল আরও ভয়ংকর ও নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ। যেসব হতভাগা ছেলেদের সাথে সে বন্ধুত্ব করত ও তাদের সাহায্য করত তার পেছনে কারণটি ছিল অত্যন্ত হিংস্র ও নির্দয়। পাষণ্ড ফ্রিটজ হতচ্ছাড়া ছেলেদের কাউকে ভালো খাবারের লোভ দেখিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাদের নির্মমভাবে ধর্ষণ করত। এরপর হিংস্র বর্বরভাবে তাদের গলায় কামড়ে হত্যা করত। রক্তচোষা বা ভ্যাম্পায়ারের কাহিনিও হয়তো এতটা ভয়াবহ নয়। অত্যাচারিত মৃতদেহগুলোর চামড়া ছিলে, তাদের মাংস টুকরো টুকরো করে বিক্রি করে দিত এই পিশাচ। শেষে মৃতের খুলি ও হাড়গোড় লিন নদীতে ফেলে দিত। এর ফলে ওয়েরউলফের গুজবটি বেশ ছড়িয়ে যায়।

১৯১৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পাবার পর ফ্রিটজ মোটেও সাবধান হয়নি। বরং আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। কেননা পুলিশ তার তথ্যের উপর বেশ ভরসা করত এবং তাকে বিশ্বাস করত। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে সে এমন এক সঙ্গী পায় যে তাকে আরও খুন করতে উৎসাহিত করে তোলে। তার সহকারী হ্যান্স গ্র্যান্সের (Hans Grans) বয়স ছিল মাত্র বিশ এবং সেও ঘর পালানো ছেলে ছিল। শুকনা গড়নের সুদর্শন ছেলেটি ছিল কঠোর ও আবেগশূন্য। অতি শীঘ্রই লাইব্রেরিয়ানপুত্র হ্যান্স তার অধীনস্থদের ওপর প্রভাব খাটানো শুরু করে তাদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও অপমান করার মাধ্যমে। কিছুদিন পর সে নির্দিষ্ট শিকারদের হত্যা

আরও পরিকল্পিত ভাবে করা শুরু করে। তবে এর আরও একটি কারণ ছিল তাদের কাপড়গুলো নিয়ে বিক্রি করা। কিছুদিন পর তারা নিউয়েস্ট্রেসিতে রোথ রেইহে (Rothe Reihe, Neuestrasse) নামের একটি গলিতে ঘর নিয়ে থাকা শুরু করে। তাদের নতুন বাসা লিন নদীর একদম পাশেই ছিল । প্রতিবেশীরা খেয়াল করত যে ঘন ঘন তাদের ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা যেত কিন্তু কখনই কাউকে সেখান থেকে বের হতে দেখেনি কেউ। অনেকেই তাদের ঘর থেকে কোন কিছু কাটার বা তরল ছিটানোর বা ঢেলে দেওয়ার আওয়াজ পেত। হঠাৎ হঠাৎ পুলিশ এসব নিখোঁজ ছেলেদের মা-বাবাকে ফ্রিটজের ঘরে নিয়ে আসত কেননা তারা খবর পেত যে তাদের ছেলেকে সর্বশেষ 'গোয়েন্দা'র সাথে দেখা গিয়েছে। প্রত্যেকবারই তারা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যেত যে তাদের ছেলেদের অন্তর্ধানের ব্যাপারে ফ্রিটজের কোনো যোগসূত্র নেই। একদিন একটি বালতি নিয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার পথে এক প্রতিবেশীর সাথে তার সিঁড়িতে দেখা হয়।

কুশল বিনিময় ও কিছু হালকা কথাবার্তা বলতে বলতেই বালতির উপর থেকে কাগজের ঢাকনাটি একটু সরে যায়। প্রতিবেশী মেয়েটি দেখে যে বালতি ভর্তি রক্ত। লাল রংয়ের তরলটিকে তার চোখে রক্ত বলেই বেশি মনে হচ্ছিল। তার মনে সন্দেহ জাগলেও সে তখনই কর্তৃপক্ষকে কিছু বলেনি। এর পর সে একদিন ফ্রিটজের ঘরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় মাংস কাটার আওয়াজ পেয়ে একটু উঁকি দিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করে, "কি বানাচ্ছ? আমি কি এক কামড় খেতে পারি?" ফ্রিটজ মৃদু হেসে বলেছিল, "আজ নয়, পরের বার।" এরপর একদিন সে একটি বাচ্চা ছেলেকে খুবই স্থিরভাবে ফ্রিটজের বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলে ফ্রিটজ বলে, "শসস! ওকে জাগিয়োনা, ও ঘুমাচ্ছে।" তার সন্দেহ বেড়েই চলল। এর মাঝে একদিন তার কাছে ফ্রিটজের কাছ থেকে কেনা মাংসের স্বাদ একটু অন্যরকম লাগল। তাকে বলা হয়েছিল এটি শুকরের মাংস কিন্তু স্বাদ গন্ধ ও দেখতে অন্যরকম। তখন মাংস নিয়ে তার গভীর সন্দেহ পাকা হয়। একটু মাংস সে পুলিশের কাছে দেয় পরীক্ষা করানোর জন্য। সেখানেও কোনো সন্দেহজনক ফলাফল আসেনি।

ফ্রিটজ এমনিতেই পুলিশের কাছে নির্ভরযোগ্য ছিল এবং ১৯২৩ সালের মধ্যে সে নিজেকে পুলিশের কাছে অপরিহার্য করে তুলল। সে শুধু অপরাধীদের সম্পর্কে খবরই দিত না, পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সে একটি বড় গোয়েন্দাসংস্থা খুলে বসেছিল। সে ব্ল্যাক রিশওয়ের (Black Reichswehr) নামের একটি গোপন সংস্থার সাথে ফ্রেঞ্চদের Ruhr এর বিরুদ্ধেও কাজ করছিল। সে একদম নিশ্চিত ছিল যে, পুলিশ তাকে সর্বাত্মকভাবে সুরক্ষা করবে তাই সে দুঃসাহসিকভাবে একের পর এক খুন করে দুই একদিনের মধ্যেই তাদের কাপড়চোপড় বিক্রি শুরু করল। এক মহিলা তার ছেলের জন্য কেনা মোজায়

রক্তের ফোঁটা পেয়েছিল। এক ব্যাক্তি হ্যান্সের গায়ের স্যুটটি আগের দিনই ষ্টেশনের একটি ছেলের গায়ে দেখছিল। ফ্রিটজের উপর কোনো প্রভাব না পড়লেও পুলিশকে চরম চাপ ও জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু হলো যে অসংখ্য কম বয়সী ছেলেরা দলে দলে নর্থ জার্মানি থেকে হ্যানোভারে এসে হঠাৎই উধাও হয়ে যাচ্ছে। একটি পত্রিকায় লেখা হলো যে, এক বছরের মধ্যেই নিখোঁজের সংখ্য বেড়ে ৬০০ তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওয়েরউলফ গুজবের রহস্য উদঘাটনে পুলিশ কোমর বেঁধে লেগে পড়ে। তারা এ ব্যাপারে ফ্রিটজের সাহায্য চাইলে সে এগিয়ে যায়। এতে করে তার ওপর সন্দেহ একটু জোরদার হয়। ফ্রিটজের বেশ দুর্নাম হওয়া শুরু হলো। পত্রিকায় এও লেখা হয়েছিল যে, বার বার ওয়েরউলফ সন্দেহের উদ্রেক করার কারণ হলো জনগণকে যতটা সম্ভব দূরে রাখা। ১৯২৪ সালের মে'তে লীন নদীর তীরে খুলির সারি হয়তো এটিরই একটি। যদিও ঘটনাকে চাপা দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চলছিল এবার পুলিশকে খেপা পিতা-মাতা ও চূড়ান্ত জনমতের সাথে কাজ করার সময় এসে গিয়েছিল। ২৯ মে'তে নদীতে আরও একটি খুলি পাওয়া যায়। খুলিটি বাচ্চা আকৃতিরই ছিল। আরও ছ'টি পাওয়া যায় ১৩ জুনে। অনেকেই বলেছিল এই হাড় হয়তো অ্যালফেল্ডের (Alfeld) থেকে ভেসে আসতে পারে কেননা সেখানে সাংঘাতিক জ্বরে বহুলোক মারা যাওয়ায় তড়িঘড়ি করে কবর দেওয়া চলছে।

এই ব্যাখ্যা আতঙ্কিত জনতা গ্রহণ করল না। তারা ভাবা শুরু করল যে শহরে কোনো দানব আছে শিকার করার জন্য। অনেকেই বলছে যে দানবটি রোথ রেইহেতে থাকে। ফ্রিটজকে অসংখ্য প্রত্যক্ষ সাক্ষী যখন দোষী বলছিল তখন পুলিশ প্রধান এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা করলেন। ফ্রিটজের তখনো অনেক শক্তিশালী বন্ধু বান্ধব ছিল। যারা তার তথ্য সরবরাহের কাজে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিল। পুলিশ প্রধান খুব সাবধানে কাজ শুরু করলেন। তিনি স্টেশনে ফ্রিটজের প্রতি নজর রাখার জন্য বার্লিন থেকে দুটি গোয়েন্দা আনিয়েছিলেন। ১৯২৪ সালের ২২ জুন ফ্রিটজ ফ্রোম নামক একটি ছেলের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে চাইল। এই ছেলেটি তার উদ্দেশ্যের প্রতিবাদ করছিল বলে সে তাকে জোর করে ধরে নিতে চেয়েছিল। ফলে সেখানে ধস্তাধস্তি ও মারামারি শুরু হয়ে যায়। গোয়েন্দা দুজন সেখান থেকে সরে যায় ও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে ফ্রিটজকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের একটি দল তার ঘরে ঢুকে তল্লাশী চালায়। তার ঘরের প্রতিটি দেওয়াল ছিল রক্তাক্ত এবং প্রচুর কাপড় স্তূপ করে রাখা হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত জিনিসও ছিল। এসব জিনিসপত্র ফ্রিটজের সামনে এনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে বলে যে মাংসবিক্রেতা ও ব্যবহৃত কাপড় বিক্রেতা হওয়ার ফলে তার ঘরে এসব জিনিস পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তখন একটি নিখোঁজ ছেলের মা তার ছেলের কোট ফ্রিটজের

পাড়িওয়ালার ছেলের গায়ে দেখে চিনে ফেললেন। ফ্রিটজ বুঝে গিয়েছিল যে তার খেলা এবার শেষ। সে দুর্বল হয়ে পড়ল এবং স্বীকার করল যে সে এবং হ্যান্স মিলে বেশ কয়েকটি খুন করেছে। একই সময়ে লিন নদীতে মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া যাচ্ছিল। ২৪ জুলাই মাঠে খেলার সময় কিছু ছেলে একটি বস্তায় এরকম বেশ কিছু দেহাবশেষ পায়। তারা সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিলে নদী থেকে আর দেহাবশেষ বা এ জাতীয় কিছু ছেঁকে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। যখন নদী থেকে কালো কর্দম ছেঁকে তোলা হয় সেখান থেকে প্রায় ৫০০ হাড় দেখে বের করা সম্ভব হয়। এত পরিমাণ হাড় দেখে বিস্ময় ও আতঙ্কে সবাই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ফ্রিটজ ও হ্যান্সকে ৪ ডিসেম্বর ২৭টি ১২-১৮ বছর বয়সী ছেলে খুন করার দায়ে মামলার শুনানির জন্য আদালতে আনা হয়। ভয়াবহ নারকীয় ঘটনা গুলোর আবর্তনের মধ্যেও ফ্রিটজের রসিকতা থামেনি। তাকে শুনানির মাঝে প্রয়োজন মতো কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যখন একজন সাক্ষী কথা শেষ করার সময় নিচ্ছিল তখন সে বলে ওঠে, "আরে বৃদ্ধ বন্ধু তুমি যা যা জান তা তোমাকে বলতেই হবে। আমরা তো এখানে সত্য জানতেই এসেছি।" যখন এক নিখোঁজ ছেলের মা সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে কেঁদে দেয় তখন ফ্রিটজকে বিরক্ত ও অধৈর্য হতে দেখা যায়। এমনকি সে এটাও বলে, "আদালতে মহিলার পরিমাণ বেশি হয়ে গেছে। এই কেসটি তো পুরুষদের আলাপের বিষয়।" তাকে ছেলেদের নামগুলো পড়ে শুনানো হলো। ১৩ বছরের আর্নেষ্ট এরেনবার্গের (Ernest Ehrenberg) নাম শুনে সে বলছিল যে এর ব্যাপারে সে নিশ্চিত যে সেই ছেলেটিকে খুন করেছিল। পল ব্রোনিজেভিসকির (Paul Bronischewski) কথা শুনে বলে যে সে নিশ্চিত না এর ব্যাপারে। তাকে যখন হারমান উলফের ছবি দেখানো হয় সে হঠাৎই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। রাগ ঝাড়ে ছেলেটির বাবার উপর। এবং বলে, "আমার এই কুশ্রী ছেলেটির দিকে দুইবার তাকানো উচিত না। এই ছবিটি অনুসারে তোমার ছেলে অবশ্যই কুশ্রী। তুমি বল যে তোমার ছেলের গায়ে একটি শার্টও ছিল না এবং তার মোজা দড়ি দিয়ে মুখ বাঁধা ছিল। তাহলে এই নাও শয়তান, তোমার তো ওকে এইভাবে ছেড়ে দেওয়ার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। একবার চিন্তা কর তুমি কী বলছ। এমন ছেলে তো আমার নজরে পড়ারই কথা ছিল না!"

আদালতে উপস্থিত সাংবাদিকরা খুনির প্রতি তাদের ঘৃণা ধরে রাখতে পারেনি। একজন সাংবাদিক লেখেন– "প্রায় ২০০জন সাক্ষীকে কাঠগড়ায় আসতে হয়েছে। যাদের বেশিরভাগই হলো সেই হতভাগা ছেলেদের বাবা-মা। সন্তানহারা বাবা-মায়ের নিহত ছেলের কাপড় বা অন্যকিছু ফিরে পাওয়ার এক করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। সেখানে ছিল একটি রুমাল, একজোড়া দস্ত

বন্ধনী, একটি চটচটে কোট যা ছিল প্রায় না চিনতে পারার মতই। এসব ফ্রিটজ ও নিখোঁজদের আত্মীয়দের দেখানো হলো। এসব বস্তুর মালিক যে কিশোর তার বাবা মা আর্তনাদ করে উঠেন। উপস্থিত সকলেই সেই করুণ দৃশ্য দেখে অশ্রু সিক্ত হয়ে যায়। হিংস্র পিশাচটি তখন এমনভাবে নাক টেনে চলছিল যেন সে দেখার চেয়ে সেগুলো শুকছে বেশি। সে কি স্বীকার করছিল যে সে তাদের এক সময় চিনত?"

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আজ পর্যন্ত তুমি কত জনকে হত্যা করেছ? উত্তর এলো ৩০ অথবা ৪০ জন হতে পারে। আমার সঠিক সংখ্যাটি মনে পড়ছে না। এটি ছিল উপস্থিত সকলের জন্য একটি ধাক্কার মতো। দ্বিতীয় ধাক্কাটি এল দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, তোমার শিকারদের তুমি কীভাবে খুন করছিলে? ভয়াবহ লোমহর্ষক উত্তরটি সবাইকে কাঁপিয়ে দেয়, "আমি তাদের গলায় কামড়ে তাদের মারতাম।"

যখন হ্যান্সকে আদালতে আনা হলো ফ্রিটজ ধৈর্য হারিয়ে ফেলল, বলল "হ্যান্স তুমি বলে দাও ও আমার সাথে কী রকম বিশ্রী ব্যববহার করছিল।" এরপর সে চিৎকার দিয়ে ওঠে, "খুনগুলো আমি করছি, এসব কাজের জন্য ও অনেক ছোট।" সে বলল যে হ্যান্স তাকে খুন করার জন্য খেপিয়ে তুলতো নির্দিষ্ট কারো কাপড় নেওয়ার জন্য। সে বলে যে হ্যান্স তাকে সারা রাত একা ছেড়ে যেত লাশটি চামড়া ছিলার জন্য। পরদিন সকালে সে আসত কাপড়গুলোর জন্য। একদিন আমি একটি মৃতদেহ আগেই কেটে ফেললাম হঠাৎ শুনি দরজায় আওয়াজ। লাশটি বিছানার নিচে ঠেলে দিয়ে দরজা খুলে দেখি হ্যান্স দাঁড়িয়ে। তার প্রথম কথাটিই ছিল, "আমার স্যুট কই।" আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলাম, ওটা তো কেটে ফেলেছি। তখন হ্যান্স আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিল, "থাক দুঃখ করো না। সামান্য একটা মৃতদেহের জন্য আর দুঃখ করে কী হবে।"

এরপর কাঠগড়ায় আনা হলো কঠোর শীতল হৃদয়ের হ্যান্সকে। তার ঘৃণাপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ছিল ফ্রিটজের অকৃত্রিম জড়তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হ্যান্স তার উপর আরোপিত সকল দোষ অস্বীকার করল। তবে এতে কোনো সন্দেহ ছিল না যে তারা একসাথেই এসব কুকর্ম করত। প্রত্যেকটি সাক্ষ্যপ্রমাণ তাদের বিরুদ্ধে ছিল। ফ্রিটজ বুঝতে পেরেছিল যে তারা ধরা পড়ে গেছে, এবার আর পালানোর পথ নেই। তার দুশ্চিন্তা ছিল যে তাকে পাগল প্রমাণিত করে যেন পাগলা-গারদে না পাঠানো হয়। যখন উকিল তাকে মানসিক বিকারগ্রস্ত বলে সে চিৎকার দিয়ে বলে উঠে, "দোহাই তোমাদের আমার শিরচ্ছেদ কর, কিন্তু আমাকে পাগলাগারদে পাঠিয়ো না।" বেশ কয়েকজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তাকে পর্যবেক্ষণ করে শেষপর্যন্ত তাকে সুস্থ ঘোষণা করেন। শেষে সিদ্ধান্ত হলো যে তার কথা মতই তার শিরশ্ছেদ করা হবে। ফ্রিটজকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। হ্যান্সকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বরে এই ঐতিহাসিক

মামলার শুনানির দিন বিচারকক্ষটি বারটি অস্ত্রধারী পুলিশের পাহারায় ছিল। অনেকেই হুমকি দিয়েছিল যে, যেকোনো সময় সুযোগমতো ফ্রিটজকে গুলি করা হবে। অজ্ঞাতনামা এই হুমকির কথা ভেবেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতটা জোরদার করা হয়েছিল।

মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত ফ্রিটজ শান্ত ছিল। তবে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগের রাতে সে চিৎকার করে বলে ওঠে, "তোমাদের কি মনে হয় আমি মানুষ খুন করা খুব উপভোগ করি? প্রথমবার খুন করার পর আমি আট দিন অসুস্থ ছিলাম। আমাকে মেরে ফেলো, আমি ন্যায় বিচার চাই। আমি পাগল নই কিন্তু এটাও সত্যি যে প্রায়ই আমি এমন অবস্থায় এসে পড়ি যখন আমি কী করব বুঝে উঠতে পারি না। দয়া করে তোমরা কাজটি শীঘ্র কর। আমাকে এই যন্ত্রণাদায়ক জীবন থেকে মুক্তি দাও। আমি ক্ষমা চাই না, মুক্তির জন্য আবেদনও করব না। আমি এই কারাগারে আমার শেষ দিনটি উদযাপন করতে চাই। আমি কফি, পনির ও সিগার খেতে চাই। এরপর আমি আমার বাবাকে অভিশাপ দিব এবং খুশিমনে মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুত হব যেন এটি আমার বিয়ের অনুষ্ঠান।"

তার আর্তনাদ কেউ কানে তোলেনি। পরদিন তার শিরচ্ছেদ করে হ্যানোভারকে মুক্ত করা হয় আধুনিক যুগের অন্যতম অভিশপ্ত গণখুনির কবল থেকে। কেউ আজও জানে না ফ্রিটজ ও হ্যান্স মিলে ঠিক কতগুলো খুন করেছে, কিন্তু পুলিশ ধারণা করে যে তাদের কুকর্মের আধিপত্যকালের শেষ ১৬ মাসে তারা প্রতি সপ্তাহে দুটি করে খুন করত। শুধু ১৬ মাসের আনুমানিক হিসাবটিই কি শিহরিত হবার জন্য যথেষ্ট নয়? তার আগে কী হয়েছিল তা আজও হিসাবের বাইরে।

দ্য স্যাডিস্টিক রোমিও

নেভিল জর্জ ক্লিভলি হিথের (Neville George Clevely Heath) চেহারার সাথে সেকালের কৌতুকাভিনেতাদের বেশ মিল ছিল। সুদর্শন এই ব্যক্তির বড় বড় নীল চোখ, ফর্সা গায়ের রং এবং মাথা ভর্তি ঢেউ খেলানো চুল যেকোনো নারীকেই আকৃষ্ট করত। লন্ডনের সুপরিচিত ক্লাব ও রেস্টুরেন্টগুলোতে তার ছিল নিত্য আসা যাওয়া। তার বিনয় ব্যবহার, মিষ্টি কথার চারুতায় কোনো সন্ধ্যায়ই একটি সুন্দরী সঙ্গীর অভাব হতো না। তার অনবদ্য আচরণ ও যুদ্ধকালীন সময়ের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের গল্পের আকর্ষণে কত নারী যে মোহিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু হিথের সুশ্রী চেহারার অন্তরালে ছিল এক ভয়ংকর রহস্য। মেয়েদেরকে মোহিত করা তার জন্য কোনো ব্যাপারই ছিল না এবং কোনো সুন্দরীর সাথে এক ইশারায় রাত কাটানো তার জন্য ছিল মামুলি ব্যাপার। সাধারণ প্রচলিতভাবে যৌনমিলনে বিরক্ত হয়ে সে একসময় জঘন্য ধর্ষণকারীর পথ বেছে নেয়। ১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মে তার এই কামবিকৃতি তাকে এক ন্যায়ভ্রষ্ট ও জঘন্য নারীঘাতকে পরিণত করে।

হিথের বয়স যখন ২৯ বছর, তখন সে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী উভয়ের কাছেই সুপরিচিত হয়ে ওঠে। সে বহুবার চুরি, জালিয়াতি এবং বিভিন্ন ধরনের ভণ্ডামির দায়ে অসামরিক কারাগারে সাজা ভোগ করেছে। ১৯৩৭ সালে থানায় হাজিরা না দিয়ে গাড়ি চুরি করে পালানোর দায়ে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ব্রিটিশ আরএএফ (British RAF) তাকে সামরিক বিচারে সংযুক্ত করে। এরপর ১৯৪১ সালে আবারও হাজিরা না দিয়ে জাল চেক ভাঙিয়ে পালানোর চেষ্টা কালে ব্রিটিশ আর্মি তাকে আটক করে। ১৯৪৫ সালে সাউথ আফ্রিকান এয়ারফোর্স তাকে অবৈধভাবে তাদের পোশাক পরে নিয়মবহির্ভূত কাজ করার দায়ে আটক করে। ১৯৪৬ সালে লন্ডনের উম্বলডনের (Wimbledon, London) ম্যাজিস্ট্রেট তাকে বেশ কিছু মেডেল ও সামরিক পোশাক পরিধানের দায়ে সাত পাউন্ড জরিমানা করে। ততদিনে কর্তৃপক্ষের অগোচরে সে আরও বেশি ভয়ংকর ও নাশকতামূলক কল্পনায় মেতে উঠতে শুরু করে।

মার্গারি গার্ডেনার ও নেভিল হিথ

এর একমাস আগে মার্চ এ লন্ডনের স্ট্র্যান্ডে (London's Strand) অবস্থিত একটি হোটেলে সেই হোটেলের ব্যক্তিগত গোয়েন্দা একটি ঘরের দরজা ভাঙতে বাধ্য হয়। ঘরটি থেকে একটি মেয়ের যন্ত্রণাকাতর আর্তচিৎকার শুনে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার পর পরিস্থিতি দেখে তাকে শিউরে উঠতে হয়। ঘরটিতে ঢুকেই হিথকে দাঁড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায়। তার পায়ের কাছে একটি মেয়ে নগ্ন অবস্থায় পড়ে ছিল, তার হাত-পা শক্ত করে বাঁধা ছিল এবং সারা শরীর অসংখ্য চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল। চাবুকটি তখনো হিথের হাতেই ছিল। একটি মেয়েকে এমন নিষ্ঠুরভাবে চাবুকপেটা করার পরও হিথ পার পেয়ে যায় কেননা মেয়েটি এবং হোটেল কর্তৃপক্ষের কেউই চায়নি ব্যাপারটি জানাজানি হোক। ছাড়া পেয়ে হিথ আরও বেশি সাহসী হয়ে পড়ে এবং মে মাসেই সে আরেকজন শিকার পেয়ে যায়। এবারে তার শিকার ছিল তার পৈশাচিক শারীরিক তৃপ্তির জন্য কিছুটা স্বেচ্ছাসেবী এবং অনেকটা এধরনের বিকৃত চাহিদাসম্পন্ন নারী মার্গারি গার্ডেনার (Margery Gardener)। ৩২ বছর বয়সী মার্গারি ছিল একজন মর্ষকামী নারী (যারা বিকৃত মনমানসিকতা নিপীড়ন ও যন্ত্রণার মাধ্যমে তার শারীরিক চাহিদা পূরণ করে)। সে পেশায় ছিল ফিল্মের এক্সট্রা। স্বামীর সাথে বহু আগেই তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। তাকে সবাই ওসেলট মারগি নামে চিনত কেননা সে ক্লাবগুলোতে একটি ওসেলট ফার কোট পরে যেত এবং সেখানে তার মতো বিকৃত মানসিকতার পিশাচ খুঁজে বেড়াত যারা তার দাসত্ব ও নিগ্রহের মাধ্যমে যৌনচাহিদা (Bondage and flagellation) পূরণ করতে পারবে। হিথের চাহিদা তার চেয়েও বেশি প্রকট ছিল যা মারগারি প্রথমে বুঝতে পারেনি। সে তাকে নটিংহিল গেটে অবস্থিত পেমব্রিজ কোর্ট হোটেলে (Pembridge Court Hotel, Notting Hill Gate) নিয়ে যায়। এবারও হোটেল কর্তৃপক্ষকে সেই কক্ষটির দরজা ভেঙে ফেলতে হয়েছিল কেননা সেখান থেকে আর্তচিৎকারের সাথে সাথে প্রচণ্ড চপেটাঘাতের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। তবে এবারও হিথ ছাড়া পেয়ে যায়। হোটেল কর্তৃপক্ষের প্রচারণায় আপত্তি থাকা ছাড়াও মারগারির কোনো অভিযোগ না থাকার কারণে আবারও জঘন্য অপরাধ করে হিথ ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। তবে প্রথমবার বেঁচে যাওয়ার পরও মারগারির শিক্ষা হয়নি। কিছুদিন পরই যখন হিথ তাকে ফোন করে দেখা করতে চায় এবং সে সাথে সাথেই রাজি হয়ে যায়। ঠিক হলো ২০ জুন, বৃহস্পতিবার তারা হিথের অন্যতম প্রিয় সাউথ কেনসিংটনে অবস্থিত পানামা ক্লাবে (Panama Club, South Kensington) সন্ধ্যার পর দেখা করবে। ক্লাবে কিছুক্ষণ মদ্যপানের পর হিথ তাকে আবার পেমব্রিজ কোর্ট হোটেলে নিয়ে যায়। সেখানে চারদিন আগেও সে একই কক্ষ ভাড়া করেছিল, সেদিন তার শিকার ছিল অন্য একটি মেয়ে। মদ্যপান করে হোটেলের কক্ষে যেতে যেতে প্রায় মধ্যরাত হয়ে গিয়েছিল।

আশপাশের ঘরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষেরা সে রাতে কোনো বিরক্তিকর আওয়াজ বা আর্তচিৎকার শোনেনি যা তাদের সুখনিদ্রা ভঙ্গ করতে পারে।

পরদিন দুপুরে কক্ষটি পরিস্কার করতে একজন পরিচারিকা আসে। ঘরটিতে প্রবেশ করা মাত্রই যে দৃশ্যটি সে দেখে তাতে তার পায়ের তলে মাটি সরে গিয়েছিল। তার আর্তচিৎকার হোটেলটির ১৯টি কক্ষের প্রতিটিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সবাই দৌড়ে আসে দোতলার ৪নং কক্ষে এবং উপস্থিত সকলেই শিউরে উঠতে বাধ্য হয়। কক্ষটিতে দুটি বিছানা একত্রিত করা ছিল যা ছিল সম্পূর্ণ ওলট পালট করা এবং রক্তাক্ত। শুধু রক্তাক্ত বললে হয়তো কম বলা হবে। বাস্তবে রক্তে থই থই করছিল সম্পূর্ণ বিছানাটি। একটি বিছানায় পড়েছিল মারগারির প্রাণহীন ও ক্ষতবিক্ষত দেহ। তার দেহে কোনো পোশাক ছিল না এবং পা অত্যন্ত শক্ত করে বাঁধা ছিল। বাঁধনের স্থানে ক্ষত দেখে বোঝাই যায় পা মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল সে। তার মুখে ও গালে রক্ত জমে কালশিটে পড়ে গিয়েছিল যেন কেউ সর্বশক্তি দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে ছিল। মুখে, দেহের সামনের ও পিছনের অংশে ছিল চাবুকের আঘাত, যা তার চামড়া কেটে তাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। সারা দেহে এছাড়াও ছিল অসংখ্য পৈশাচিক কামড়ের চিহ্ন। বিশেষ করে তার স্তনসহ শরীরের বেশিরভাগ স্থানেরই মাংস তার কামড়ে হয়ে পড়েছিল গভীরভাবে ক্ষত বিক্ষত। শুধু এতেই ক্ষান্ত হয়নি জঘন্য পিশাচটি। তার নিষ্ঠুর আঘাতে ছিন্নভিন্ন যোনীপথ দিয়ে তখনো রক্তপাত হচ্ছিল। এমন দৃশ্য যেন নরকের শাস্তির চেয়েও ভয়ংকর। কোনো রক্তপিপাসু জানোয়ার ছাড়া কারো পক্ষে এমন আচরণ করা সম্ভব বলে কল্পনাও করা যায় না। পুলিশের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও বলেছিল তারা এতটা পাশবিক হত্যা কাণ্ড কখনো দেখেনি। তারা ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডটির বেশ কয়েকটি ছবি তুলে নিয়ে কাজ শুরু করে দেয়। তারা বলে যে, শ্বাসরোধ করে মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছে। তার হাতের কবজিতে শক্ত বাঁধনের দাগ ও গভীর ক্ষত পাওয়া গেলেও যা দিয়ে বাঁধা হয়েছিল সেটি পাওয়া যায়নি। নরঘাতক মৃতদেহের শরীর থেকে রক্ত মুছে পরিষ্কার করে গেলেও চোখের পাতা ও পাপড়িতে, নাসারন্ধ্রে এবং ঠোটের পাশে তখনো শুষ্ক রক্ত লেগে ছিল। পুলিশ হতবিহবল হয়ে পড়ল এই চিন্তায় যে এতটা নিষ্ঠুরভাবে কে খুন করতে পারে। তারা রহস্যের সমাধানে কোমর বেঁধে লেগে পড়ল।

শনিবার হিথ সাসেক্সের ওয়ার্থিংয়ে (Worthing, Sussex) ছিল। তার সাথে ছিল নটিং হিলের হোটেলের ১৯ বছর বয়সী ইভোন সাইমন্ডস (Yvone Symonds) নামের সেই মেয়েটি যার সাথে সাতদিন আগে চেলসিতে (Chelsea) একটি নাচের অনুষ্ঠানে হিথের দেখা হয়। যখন হিথ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, সে তার মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে তার সাথে সময় কাটানো শুরু করে এমনকি সে রাতটি তারা একসাথে চেলসিতেই কাটায়। পরদিন মেয়েটি তার

বাবা-মার বাড়িতে ফিরে গেলে হিথ পার্শ্ববর্তী ওসান হোটেলে (Ocean Hotel) ঘর ভাড়া করে। এরই মাঝে আরও একটি মেয়ের সাথে রাত কাটিয়ে ২০ জুন মারগারিকে হত্যা করে সে অ্যাঙ্গমেরিংয়ে (Angmering) ফিরে আসে। এরপর ইভোনকে নিয়ে স্থানীয় ক্লাবে ডিনার করতে যায়। হিথ তার সাথে ২০ জুন তারিখের ঘটনা নিজের মতো করে কিছুটা বর্ণনা দেয়। তার ভাষ্যমতে, ২০ তারিখ তার মারগারির সাথে দেখা হলে সে হিথের কাছ থেকে একদিনের জন্য ঘরটি ধার নেয় অন্য একজন ব্যক্তির সাথে থাকার জন্য। সে এও বলে যে, মারগারির আর কোনো যাবার জায়গা না থাকায় সে রাজি হয়ে তাকে ঘরের চাবিটি দিয়ে দেয়। সে ইভোনকে বলে যে, সে অন্যত্র রাত কাটিয়েছিল এবং পরদিন সকালে ইন্সপেক্টর ব্যারাট (Inspector Barratt) তাকে মৃতদেহটি দেখাতে সেই ঘরটিতে নিয়ে যায়। সে ইভোনকে বলে যে, সে ছিল একটি ভয়ংকর দৃশ্য এবং এ বলে যে, খুনিটি নিঃসন্দেহে 'যৌন পিপাসু একটি পিশাচ'। খুনের বর্ণনা শুনতে শুনতে শিউরে উঠে ইভোন। সে হিথের প্রত্যেকটি কথাই বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু বাঁধ সাধল খবরের কাগজ। ইভোন ও তার বাবা হতবুদ্ধি হয়ে গেল এটা দেখে যে, ২০ তারিখ ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডের খুনি হিসেবে পুলিশ নেভিল জর্জ ক্লিভলি হিথ নামের ব্যক্তিকে খুঁজছে। সাথে সাথে ইভোন ওশান হোটেলে হিথের কক্ষে ফোন করে ব্যাপারটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে হিথ বলে, পত্রিকা সেও দেখেছে এবং সে এক্ষুনি লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে এই চরম ভুল বোঝাবুঝির মীমাংসা করতে। হিথ ওয়ার্থিং ছেড়ে এসেছিল ঠিকই তবে লন্ডনের উদ্দেশ্যে নয়। সে চলে গেল আরও দক্ষিণে, বোর্নমাউথে (Bournemouth) যেখানে সে টলার্ড রয়েল হোটেলে (Tollard Royel Hotel) গ্রুপ ক্যাপ্টেন রূপার্ট ব্রুক (Rupert Brooke) এর নামে একটি ঘর ভাড়া করে রেখেছিল। ওয়ার্থিং ছাড়ার আগে সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ইন্সপেক্টর ব্যারাটকে নিজের নামে একটি চিঠি লিখেছিল। সে লিখেছিল যে, সে রাতের খুনের ব্যাপারে সে যা জানে তা ইন্সপেক্টরকে জানানো তার কর্তব্য। সে ইন্সপেক্টরকে এও বলে যে মারগারি তার কাছ থেকে তার ঘরের চাবিটি চেয়েছিল এবং আর্থিক সংকটের কারণে অন্য এক ব্যক্তির সাথে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছিল। সে তাকে বলেছিল, যদি হিথ রাত ২টার দিকে আসে তাহলে সে বাকি রাত তার সাথেই থাকবে। হিথ যথাসময়ে ঘরে পৌঁছে এমন ভয়ংকর অবস্থা দেখে আতঙ্কে পালিয়ে যায় কেননা পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণ সবই তার বিরুদ্ধে। হিথ সেই খুনি, যে মারগারির সাথে ছিল তার বৈশিষ্ট্যমূলক বর্ণনাও দিয়েছিল। তার কথানুযায়ী, একহারা গড়নের লম্বা, কালোচুলের সেই ব্যক্তির নাম 'জ্যাক' (Jack)। সে চিঠিতে এও লিখেছিল যে, "আমার কাছে সেই অস্ত্রটি আছে যার সাহায্যে মারগারিকে আঘাত করা হয়েছে। আমি আজকেই সেটি আপনার কাছে

পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। অস্ত্রটিতে আমার হাতের ছাপ আছে কিন্তু সেই সাথে ওই খুনিরও হাতের ছাপ পাওয়া যাবে।"

অস্ত্রটি কোনোদিনই পৌঁছেনি এবং এতে ইন্সপেক্টর ব্যারাট মোটেও আশ্চর্য হননি। বরং তার সন্দেহ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল। তবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কাছে সন্দেহভাজনের কোনো ছবি ছিল না যার সম্পূর্ণ সুযোগ ভোগ করেছে হিথ। পরবর্তী ১৩ দিন সে বোর্নমাউথে ছুটি কাটাতে আসা মেয়েদের সাথে আকণ্ঠ মদ্যপান করে, নাচগান ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমোদ ফুর্তি করে কাটাল। ৩ জুলাই সে তার নৃত্যসংগীদের একজনকে চায়ের দাওয়াত দেয়। মিষ্টি কথায় মন্ত্রমুগ্ধ করে সে রাতেই তারা ডিনারে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। তারা এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল যে তারা সেই রাতটি একত্রে কাটানোর জন্য হোটেলে চলে যায়। মধ্যরাতের দিকে সে মেয়েটিকে তার বাসায় পৌঁছে দিতে হাঁটতে হাঁটতে সেখানকার পার্কের কাছে আসে। সে তার ঘরে ফিরে যায় কখন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। হোটেলের দারোয়ান তাকে ফিরে আসতে না দেখে যখন ভোর ৪.৩০ টার দিকে সর্বশেষ রিপোর্ট দেয় তখন তার ঘরটি খোলা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো তখন হিথকে বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনাটি সবাইকে অবাক করলেও তা দ্বাররক্ষীর গাফিলতি হিসেবেই ধরা হয়।

দুদিন পর পার্শ্ববর্তী নরফোক হোটেলের (Norfolk Hotle) ম্যানেজার পুলিশকে জানায় যে, তাদের একজন অতিথি নিখোঁজ হয়েছে। নিখোঁজ অতিথি ২১ বছর বয়সী মিস ডুরিন মার্শাল (Miss Doreen Marshall) মিডলসেক্সের পিনার (Pinner, Middlesese) অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। তাকে সর্বশেষ দেখা যায় টলার্ড রয়েল (Tollard Royal) হোটেল থেকে নৈশভোজ সেরে বের হওয়ার সময়। ম্যানেজার 'গ্রুপ ক্যাপ্টেন ব্রুক' এর ছদ্মবেশে থাকা হিথকে ব্যাপারটি জানিয়ে অনুরোধ করে পুলিশের সাথে কথা বলতে। সে অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতোই মিথ্যা নাম ও পদমর্যাদার আশ্রয় নিয়ে থানায় ফোন করেছিল। একজন অফিসার হিসেবে তার কাছ থেকে যতখানি গুরুত্বের আশা করেছিল হোটেল ম্যানেজার তার কিছুই পাওয়া যায়নি। সে সাধারণ জেরায় মেয়েটির ছবি সনাক্ত করেছিল এবং মেয়েটির বাবা ও বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখান থেকে সড়ে পড়ে। কিন্তু একজন চৌকস পুলিশ কনস্টেবল খেয়াল করে যে ছয় ফুট লম্বা এই ব্যক্তির সাথে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পাঠানো অপরাধীর বৈশিষ্ট্যগত মিল আছে। তার সন্দেহকে যৌক্তিক গুরুত্ব দিয়ে তাকে পুলিশ আবারও জিজ্ঞাসাবাদ করে। এবারের বিষয়বস্তু লন্ডনের খুন এবং তার আসল পরিচয়। হিথ বেশ কঠোরভাবেই পুলিশের সন্দেহকে অযৌক্তিক বলে সকল আরোপ অস্বীকার করেছিল কিন্তু পুলিশও ছেড়ে দেবার পাত্র ছিল না। তারা জিজ্ঞাসাবাদে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে সে সময়টুকু কাজে লাগিয়ে অন্যান্য অফিসারেরা তার ঘরের ও

জিনিসপত্রের তল্লাশী করে নিচ্ছিল। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছিল এবং তখনো তাকে ছাড়া হচ্ছিল না দেখে হিথ বলে যে তার শীত লাগছে এবং সে ঘরে যেতে চায়। তার পালানোর পরিকল্পনা নাকচ করে দিয়ে ইন্সপেক্টর উল্টো তার জ্যাকেটটাই ঘর থেকে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন কনস্টেবলকে। জ্যাকেটের পকেটে পাওয়া যায় হিথের আইডি কার্ড যা পুলিশের কাজকে আরও সহজ করে দেয়। তার ঘর থেকে আরও অনেক কিছুই পাওয়া যায়। একটি মুক্তার মালার ছেঁড়া অংশ, লন্ডন থেকে বোর্নমাউথ আসার ট্রেনের টিকেট এবং ২৩ জুন তারিখের সিলওয়ালা একটি লাগেজ টিকেট যা তার লন্ডন থেকে বোর্নমাউথ আসার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বাকি রাখে না। তার সুটকেসে ছিল কাপড় চোপড় এবং কাগজপত্র যা তার নামটি আবারও প্রমাণ করে। আরও ছিল একটি রক্তাক্ত স্কার্ফ যাতে অসংখ্য লম্বা লম্বা চুল আটকে ছিল, একটি ভয়ংকর দর্শন কালো চামড়ার চাবুক যাতে আঁকাবাঁকা নকশা করা ছিল। চাবুকটির মাথার দিকটি বেশ ছড়ে গিয়েছিল এবং তাতে অনেক শুষ্ক রক্ত লেগে ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল যে ভয়ংকর অস্ত্রটি অনেকবার যাচ্ছেতাইভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

হিথকে ৮ জুলাই মারগারি গার্ডেনারের খুনের দায়ে গ্রেফতার করে লন্ডন আনা হয়। সেদিন বিকালেই এক প্রকৃতিপ্রেমী মহিলা তার কুকুরকে হাঁটাতে বের হন ব্র্যাঙ্কসাম চাইন (Branksome Chine) নামক এক স্থানে যেখানে হিথের আরও একটি অপরাধ ধামাচাপা দেওয়া ছিল। জায়গাটি টলার্ড রয়েল থেকে এক মাইল পূর্বে অবস্থিত গাছপালাপূর্ণ একটি জঙ্গলের মতো ছিল। তিনি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটি রোডোডেনড্রনের (Rhododendron) ঝোপের আশপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি দেখে সেদিকে এগিয়ে যান। তিনিও নিখোঁজ মেয়েটির কথা শুনেছিলেন এবং ঝোপের পাশে মাছির ঝাঁকের মাঝে মেয়েটির পরিণতিও তার দেখা হয়ে গেল। সাথে সাথেই তিনি পুলিশকে খবর দিলেন। ভয়ংকর জঘন্য দৃশ্যটি দেখতে আসতে পুলিশের খুব বেশি সময় লাগেনি। হতভাগ্য ডুরিন মার্শালকে সেখানে শুধুমাত্র একটি জুতা পরা অবস্থায় পাওয়া যায়। তার হাত-পা শক্ত করে বাঁধা ছিল, এবং সেখানে এমন গভীর ক্ষত ছিল যেন ছুরি দিয়ে হাত-পা কাটা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছিল হাত-পা মুক্ত করার জন্য কতটা প্রাণপন চেষ্টা করেছে মেয়েটি। তার প্রাণহীন নগ্ন দেহটি তার কাল জামা, হলুদ জ্যাকেট দিয়ে কোনোমতে ঢাকা ছিল। তার পার্স, ছেড়া মুক্তার মালা, ছোট পাউডারের বক্স ও ছেড়া মোজা লাশের আশপাশেই ইতস্তত পড়ে থাকতে দেখা যায়। চোখ দুটো ছিল খোলা যেখানে আতঙ্ক ছাড়া কিছুই ছিল না এবং মুখে ছিল প্রচণ্ড যন্ত্রণার ছাপ। শুধু তাই নয়, মেয়েটির পাঁজরের একটি হাড় ভেঙে ফুসফুসকে এমনভাবে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছিল যে, ডাক্তারের মতানুযায়ী কেউ প্রচণ্ড জোড় হাঁটুতে ভর দিয়ে তার পাঁজরে বসে না পড়লে এমন হওয়া সম্ভব না। সারা শরীরের

মাংসপেশি অত্যন্ত জঘন্যভাবে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে বিকৃত ও ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল যা দেখে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও শিউরে উঠেছিলেন। পরে তারা বলেন যে, মেয়েটিকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। তার গলায় দুটি গভীর ক্ষত পাওয়া যায়, যা তার ধড়কে মাথা থেকে প্রায় আলাদাই করে ফেলেছিল।

ভয়ংকর এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে হিথ পুলিশকে বলে যে, সে ডুরিনকে পার্কের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল এবং সে সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার হেঁটে যাওয়া দেখে। ডুরিনের বাসা পার্কের একদম কাছেই ছিল তাই সে সেখানে ডুরিন বাসায় ঢোকার আগ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে তাকে দেখছিল। সে বলে যে সে রাত ১২.৩০ টায় হোটেলে ফিরে এসেছিল এবং জানত যে দ্বাররক্ষী তার জন্য অপেক্ষা করছে। দ্বাররক্ষীকে বোকা বানানোর জন্য সে মজা করে দালানটির পিছনের দিক দিয়ে মই বেয়ে তার ঘরে যায়। সে পুরো ব্যাপারটিকে একটি ছোট্ট দুষ্টুমি বলে। পুলিশ ঘটনাটিকে একটি বড় ধরনের প্রতারণা হিসেবে ধরে এবং হিথকে এর জন্য দায়ী করে।

২৫ সেপ্টেম্বর মারগারি হত্যাকাণ্ডের মামলার শুনানি শুরু হয়। তার অপরাধ খুব সহজেই প্রমাণিত হয় কেননা, সে অনায়াসেই আরও খুন করে যাচ্ছিল। একাধিক খুনের দায়ে সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তেমন কিছুই বলতে পারেনি। সে যদিও বলছিল যে, মারগারি স্বেচ্ছায় চাবুকের আঘাত ও অন্যান্য নিপীড়নের শিকার হয়েছিল এবং তার মৃত্যু বলতে গেলে একটি দুর্ঘটনা। যখন পরিস্থিতি তার নিজের আওতায় ছিল না, সেই চরম উন্মাদনার মাঝে মারগারির মৃত্যু ঘটে যা হিথের সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক বলে বর্ণনা করে। তবে পরবর্তী খুনের পৈশাচিকতা তার এ কথাকে নাকচ করে দেয়। হিথ জেনে গিয়েছিল যে এখানেই তার খেলা শেষ। সে ঠান্ডা মাথায় শান্তভাবে তার শাস্তি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। তবে তার পক্ষের উকিল এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র ছিল না। সে এই ভয়ংকর অপরাধীকে হতাকাণ্ডের দায় হতে নিস্কৃতি পাবার উদ্দেশ্যে উন্মাদ বা মানসিক বিকারগ্রস্তের পন্থা অবলম্বন করতে প্ররোচিত করে। উকিলের অনুরোধে মামলার শুনানির সময় বাড়ানো হয় এবং নামিদামি মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের আনা হয় ব্যাপারটি খতিয়ে দেখতে। তাদের দেওয়া তথ্যসমূহ ও প্রধান আলোচনার বিষয়ই ছিল এই দুদিনব্যাপী শুনানির সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত।

তখনকার শীর্ষস্থানীয় মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের একজন, ওয়ার্মউড স্ক্রাবস (Wormwood Scubs) কারাগারের সাবেক সাইকোথেরাপিস্ট ডাঃ উইলিয়াম হেনরি ডি বার্গ হিউবার্টকে (Dr. Willim Henry de Bargue Hubert) আদালত তার পদ থেকে অপসারণ করে এবং তাকে মার্যাদা দিতে অস্বীকার করে। এর কারণ তার মতামত কোনো সুস্থ মানুষের মতো ছিল না, যা তাকে আরও অপযশ ও কলঙ্ক এনে দেয়। এক বছর পর সে আত্মহত্যা করে। মামলার

জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ও বিভিন্ন বিষয়ের আলোকে মূল প্রশ্নকর্তা ছিলেন মিঃ অ্যান্থনি হক (Mr. Anthony Hawke)। ডাঃ হিউবার্ট তাকে বলে যে, হিথ অবশ্যই জানত যে সে কী করছে। যখন সে মেয়েগুলোকে বাঁধছিল অথবা তাদের ফাঁস দিচ্ছিল, তখন সে এ ব্যাপারে একদমই অবগত ছিল না যে, এটি সে সঠিক কিনা ভুল করছে। মিঃ হক প্রশ্ন করেন যে, তাহলে কি সে ভাবছিল যে সে সাঠিক কাজ করছে। ডাঃ হিউবার্টের কাছ থেকে উত্তর এল, "হ্যাঁ"। মিঃ হক আবারও বললেন, "আপনি কি নিজের দায়িত্বে এটি বলতে চাচ্ছেন যে, এ ধরনের মানসিকতার কোনো ব্যক্তি অপরাধী হিসেবে গণ্য হওয়া থেকে মুক্ত, যদিও তার কর্মকাণ্ডের ফলে ভয়ংকর শারীরিক ক্ষতি এমনকি কারো মৃত্যুও ঘটে?" মিঃ হককে অবাক করে দিয়ে ডাঃ হিউবার্ট বলে যে, "অবশ্যই মুক্ত হবে। কেননা বেশিরভাগ সময়ই ধর্ষকামী মানসিকতার ব্যক্তিরা অনুশোচনা প্রকাশ করে না। এর কারণ তারা ভাবে যে তারা সঠিক কাজ করছে।"

এবারে মিঃ হক জিজ্ঞেস করল, "যদি কোনো ব্যক্তি আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভেবে থাকে যে চেক জালিয়াতি করাটা ঠিক হবে এবং সঠিক ভেবে কাজটি করার পর কি সে তার কুকর্মের শাস্তি থেকে মুক্ত থাকবে? এ ব্যাপারে আপনার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিটি কী?" উত্তর এল, "হ্যাঁ, সে লোকটি এমনটি ভাবতেই পারে।" মিঃ হক আবারও বললেন, "আপনার প্রতি সম্মান সহকারে বলছি ডাঃ হিউবার্ট, আমি এটা জানতে চাইনি যে ঐ লোকটি কী ভাবতে পারে, আমি জানতে চাচ্ছিলাম আপনি কি ভাবেন যে এই লোকটিকে উন্মাদ বা মানসিক রোগী বলে তার অপরাধ থেকে মুক্ত করে দেওয়া উচিত?" উত্তর এল, "হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি।"

মিঃ হক বললেন, "আপনি বলতে চাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি যে তার ইচ্ছামতো কিছু একটা করেছে শুধুমাত্র তার কাছে এটি সঠিক মনে হয়েছে বলে, সে জন্যে কি সে দায় আরোপ থেকে মুক্ত থাকবে? এমনকি সে যদি কোনো অপরাধ করে বসে, তার মানসিকতাকে উন্মাদনা আখ্যা দিয়ে তাকে অপরাধের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে?"

ডাঃ হিউবার্ট বললেন, "যদি সেই অপরাধ এবং পরিস্থিতি কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক হয়ে থাকে, তাহলে আমি তাই মনে করি।"

এ ধরনের মানসিকতা ও দাবি নিঃসন্দেহেই ছিল অস্বাভাবিক। এমনকি হিথ নিজেও বুঝতে পারছিল যে এই ডাঃ তার মামলায় সাহায্যের চেয়ে বরং অসুবিধারই সৃষ্টি করছে বেশি। সে তার পক্ষের উকিলের কাছে মানসিক বিকারগ্রস্ততার ক্ষেত্রে বিচারের আবেদন প্রশমিত করার জন্য লিখিত অনুরোধ করে। ১৯৬৪ সালে মানসিক হাসপাতাল দ্বারা উন্মাদ প্রমাণিত হওয়া ও ফাঁসি কাষ্ঠের আরোহী হওয়ার পার্থক্য রেখা সুস্পষ্ট হয়ে যায় একটি ব্যাখ্যার মাধ্যমে:

সেটি হলো মানসিকভাবে পীড়িত ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্তের পার্থক্য অর্থাৎ Psychopath I Psychotic এর পার্থক্য। সাইকোপাথ যারা, তারা তাদের পৈশাচিক ও অশুভ অনুভূতি ও ইচ্ছাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। কিন্তু সে ক্ষমতা সাইকোটিকদের নেই। হিথের এই মামলায় দুজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক বলেন যে, হিথ নিঃসন্দেহে একটি অস্বাভাবিক এবং জঘন্য ধর্ষকামী ও কামবিকৃত ব্যক্তি, কিন্তু একজন সাইকোপাথ হিসেবে বা উন্মাদ হিসেবে কখনই নয়। ১১জন নারী পুরুষের জুরি মাত্র এক ঘণ্টার শুনানি বিরতির পরই তাকে দোষী ঘোষণা করে রায় দেন এবং হিথকে মৃত্যুদণ্ড দেন। হিথ নিজের পক্ষে কোনোরকম দাবি পেশ করেনি এবং শিকারদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি কোনো প্রকার অনুশোচনা বা সান্ত্বনা-সহানুভূতির প্রকাশ করেনি। এমনকি সে তার ব্যক্তিগত জীবন ও ধারণাসমূহ নিয়ে আলাপ করতে অস্বীকার করে। তার কাছে বহু বিশেষজ্ঞ গিয়েছিল কিন্তু সে তাদের কারো সাথেই নিজের সম্পর্কে কোনো কথা বলতে রাজি হয়নি।

জঘন্য এ নরপশুকে ১৯৬৪ সালের ২৬ অক্টোবর লন্ডনের পেন্টনভিল কারাগারে (Pentonville Prison) ফাঁসি দেওয়া হয়। ভয়ংকর এই খুনির জীবন অবসানের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে একটি হুমকির হাত থেকে বাঁচায়। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ছোট ছোট চিঠি পাঠিয়েছিল যার একটি ছিল তার বাবা-মার উদ্দেশ্যে।

"প্রিয় মা ও বাবা,

পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে আমার জীবনের একমাত্র আফসোস এই যে, আমি সারাজীবনই তোমাদের দুজনের কাছে অভিশপ্ত অযোগ্য পুত্র হিসেবে রয়ে গেলাম।"

দ্য হার্টলেস হাজব্যান্ড

জোহান অটো হচ (Johann Otto Hoch) কখনো দীর্ঘস্থায়ী প্রেম বা দীর্ঘকালীন বিবাহে বিশ্বাস করত না। তার বিবাহিত জীবনের ১৫ বছরের মধ্যে স্ত্রীর সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ২৪ জন। প্রত্যেক স্ত্রীকেই সে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। এই জঘন্য বহুপত্নীঘাতক (Bluebeard) তার শ্যালিকাকে নিজের স্ত্রীর অন্তিমশয্যার পাশে বসে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। তার স্ত্রী তখন আর্সেনিকের অতিরিক্ত মাত্রায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়ছিল। সে তার শ্যালিকাকে বলেছিল, "জীবন জীবন্তদের জন্য এবং মৃতরা মৃতদের জন্যই।" হতভাগ্য শ্যালিকা তার প্রস্তাবে রাজি হয়।

১৮৯২ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত জোহানের অদ্ভুত বিয়ে ও খুনে ভরা বছরগুলো ধরে একজন সুদক্ষ শিকাগো পুলিশ কর্মকর্তা নিরন্তরভাবে তার পিছে লেগে ছিল। অফিসার জর্জ শিপি (George Shippy) খুব ভালো করেই জানতেন যে জোহান এ যাবৎকাল রক্তাক্ত হিংস্র খুনের পথে চলছে। কিন্তু কখনো প্রমাণ করতে পারেনি। জোহানকে ধরার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় তার।

১৯৫৫ সালে জোহানের জন্ম হয় জার্মানিতে (Germany) জোহান স্মিদ (Johann Schmidt) নামে। ১৮৮৭-তে সে জার্মানি থেকে প্রবাসিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যায়। তখন তার এক স্ত্রী ছিল ক্রিস্টিন র‍্যাম্বেরও (Christine Ramb) তিনটি সন্তান ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে এসে সে জোহান অটো নাম গ্রহণ করে। এরপর আর কখনো সে তার প্রথম স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে ফেরত যায়নি। লম্বা ও আমুদে হওয়ায় খুব সহজেই সে তখন একজন ভ্রাম্যমাণ বারটেন্ডার হিসেবে চাকরি পেয়ে যায়। তার চেহারায় চোখে পড়ার মতো বিষয়টি ছিল তার মস্তবড় মোছটি। যুক্তরাষ্ট্রে এসেই শুরু হয় তার নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত তার খুনের সংখ্যা কেউ আন্দাজও করতে পারবে না। কত মহিলাকে যে তার হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে তার কোনো হিসাব নেই।

১৮৯৫ সালে ওয়েস্ট ভারজিনিয়ার হুইলিংয়ের (Wheeling, West Virginia) একটি দোকানে তার সাথে ক্যারোলিন হচ (Caraline Hoch)

নামক এক মধ্যবয়সী বিধবার দেখা হয়। অল্পদিনেই জোহান তার মন জয় করে ফেলে জেকব হফ (Jacob Huff) নাম নিয়ে। এপ্রিলে তারা বিয়ে করে ফেলে। বিয়ের তিন মাসের মধ্যে হঠাৎ ক্যারোলিন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। তিন মাস পর জোহান তাকে বিষ খাইয়ে দেয়, যার ফলে কয়েকদিন পর প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভুগে ক্যারোলিন মারা যায়। ক্যারোলিনের ৯০০ ডলারের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিমেষেই খালি হয়ে যায়, তার বাড়িও বিক্রি করে দেয় জোহান এবং জীবনবীমা থেকে ২৫০০ ডলার পায় সে। এরপরই হঠাৎ সে উধাও হয়ে যায়। বেশ কিছুদিন পর তার কিছু কাপড়চোপড় পাওয়া যায় অহিও নদীতে (River Ohio) এবং কাপড়ের সাথে একই সুইসাইড নোট পাওয়ার পর পুলিশ ভাবে সে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল ভিন্ন। নদীর পারেই ঠিক করা ছিল একটি নৌকা ও নতুন কাপড়, নৌকায় করে জোহান নদীর ওপারে চলে যায় ও হচ পদবি গ্রহণ করে। ডাক্তার ভাবল যে ক্যারোলিনের মৃত্যু হয়েছে বৃক্কের জটিলতায়, কিন্তু একবারও কেউ ভাবল না যে, আত্মহত্যার অজুহাতে ক্যারোলিনের সকল সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে জোহান। এ সময় ক্যারোলিনের চাকর অফিসার শিপিকে জানায় যে, তার মালিকের মৃত্যুর দু'দিন আগে সে জোহান ওরফে জোকবকে দেখেছে তাকে কিছু খাওয়াতে। তার তখন কোনো সন্দেহ না হলেও ক্যারোলিনের মৃত্যুর পর তার দৃঢ় বিশ্বাস যে সেটি বিষ ছিল এবং জেকব মৃত নয়। শিপি পত্রপত্রিকায় জোহানের ছবি ছাপিয়ে দেয় এবং অপেক্ষায় থাকে কখন সুযোগ পাবে তাকে ধরার।

মাঝে তার স্ত্রী ম্যারি, বামে-ম্যারির বোন যাকে জোহান পরে বিয়ে করে ১৮৯৮ সালে জোহান শিকাগোতে আসে। মার্টিন ডটজ (Mattin Dotz) নাম নিয়ে সে পুলিশের হাত থেকে বেঁচে যায়। জর্জ শিপি আপ্রাণ চেষ্টা করেও তার হদিস পাচ্ছিল না এবং ধরে নিচ্ছিল যে আসলেই হয়তো সে আত্মহত্যা করেছে। ঠিক সে সময়ই শিকাগোতে তাকে গ্রেফতার করা হয় সামান্য জুয়াচুরির দায়ে। সেখানেই একটি পত্রিকায় হুইলিংয়ের যাজক জোহানের ছবি দেখে জেকব হফ হিসেবে চিনে ফেলেন এবং জর্জ শিপিকে খবর দেন। জর্জ শিপি সেখানে গিয়ে জোহানকে গ্রেফতার করে। তাকে ক্যারোলিন ও আরও কয়েকজন মহিলার হত্যার সন্দেহে কুক কাউন্টি (Cook County) কারাগারে রাখা হয়। জোহানের অতীত অপরাধের সূত্র খুঁজতে গিয়ে শিপির হাতে এসে পড়ে ডজনখানেক অমীমাংসিত নারী হত্যার মামলা। সে হুইলিংয়ে গিয়ে কবর থেকে ক্যারোলিনের দেহ বের করার ব্যবস্থা করে। দেখা যায় যে, ক্যারোলিনের দেহের অধিকাংশ অংশই কেটে ফেলা হয়েছে। পরীক্ষা করে তার দেহে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া যায়। শিপি এসব তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করতে করতেই জোহান জেল থেকে পালিয়ে যায়। জেল থেকে বের হবার পর, ১৯০০ থেকে ১৯০৫

রিভলভার, বেশ কয়েকটি বিয়ের আংটি ও আর্সেনিকপূর্ণ ফাউন্টেন পেন উদ্ধার করে। জোহান বলছিল যে কলমটি সে আত্মহত্যা করার জন্য আর্সেনিকপূর্ণ করেছে। কিন্তু এবার আর পুলিশ তার আত্মহত্যার অজুহাতে কান দিল না। গ্রেফতার করে সোজা তাকে জেলে ভরা হলো। জর্জ শিপি অনেক কষ্ট করার পর শেষপর্যন্ত জোহানকে গ্রেফতার করে।

জোহানের মামলার বিচারকালে সম্পূর্ণ সময় সে বাচ্চাসুলভ আচরণ করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেয়েছে। এমনকি সে বার বার বলেছে, "এই পৃথিবীতে আমার কাজ শেষ, সবার সাথেই আমার কাজ শেষ, আমার কিছু আর বলার নেই। আমি নির্দোষ।" সে তার বিচারের রায় ঘোষণার আগ পর্যন্ত নিশ্চিত ছিল যে তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানোর আদেশ কখনই দেওয়া হবে না। কিন্তু তার ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো না। বিচারপতি রায় দিলেন যে, জোহানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং তার মৃত্যু হবে ফাঁসিকাষ্ঠে। ১৯০৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি যখন তাকে ফাঁসিমঞ্চে উঠানো হচ্ছিল সে হাসতে হাসতে বলছিল, "কী বল তোমরা? আমাকে কি দানবের মতো দেখায়?" তার প্রশ্নের উত্তর কেউ দিল না। ফাঁসিমঞ্চের ট্রাপডোরটি দিয়ে তার ভারী দেহটি সবেগে পড়ে যায়, মৃত্যু ঘটে জঘন্য এক অপরাধীর।

জোহানকে অন্য যেসব নারীকে খুনের জন্য সন্দেহ করা হচ্ছিল তার কাহিনি ১৯৩৫ সালের আগে উদ্ঘাটিত হয়নি। তখন শিকাগোতে অবস্থিত জোহানের বাড়িটি সরকারের পক্ষ থেকে ভেঙে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তখনই তার বাড়ির বেশ কয়েকটি দেওয়াল ও মেঝে থেকে বের হয় অসংখ্য মানুষের হাড়। কংক্রিটের আড়ালে চাপা পড়ে ছিল ভয়ংকর এক রহস্য। মৃত নারীদের নাম, সংখ্যা, তাদের ক'জন জোহানের স্ত্রী ছিল এবং কাকে কখন কীভাবে হত্যা করেছে এসব প্রশ্নের উত্তর জোহানের মৃতদেহের সাথে চিরদিনের জন্য চাপা পড়ে গেছে। অমীমাংসিত হত্যাগুলো আজও রহস্যই থেকে গেল।

সালের মধ্যে সে আরও ১৫ জন নারীকে খুন করে। তার অস্ত্র ছিল সব সময়ই আর্সেনিক, যা যেকোনো ওষুধের দোকানে খুব সহজেই পাওয়া যেত। সে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক ব্যবহার করত যেন মৃতের শরীরে শেষদিকে প্রয়োগ করা বিষের উপস্থিতি ধরা না পড়ে। সে সবসময়ই নিঃসঙ্গ কিন্তু ধনী মহিলাদের জালে ফেলার চেষ্টায় থাকত। বেশিরভাগ সময়ই তারা জোহানের চেহারা ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে যেত। বিয়ের পর থেকেই সে আর্সেনিক দেওয়া শুরু করত এবং তার স্ত্রীরা খুব তাড়াতাড়িই অসুস্থ হয়ে পড়ত। শেষদিকে তাদের বিষপ্রয়োগ করে মৃত্যুর আরও কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। বিশৃঙ্খল ও উদাসীন চিকিৎসকেরা ভাসা ভাসা পরীক্ষা করে কিডনি জটিলতা বা এ ধরনের কিছুর রিপোর্ট দিয়ে দিত।

শহর থেকে শহরে অভিশপ্ত ভূতের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল জোহান। তারপরও একের পর এক খুন করে যেতেই থাকল। সে ঘন ঘন বিয়ে করে এক সপ্তাহের মধ্যেই স্ত্রীকে খুন করা শুরু করল। ১৯০৪ সালে সে তার সর্বশেষ খুনের শিকার ম্যারি ওয়েলকারকে (Marie Walcker) বিয়ে করে। এক সপ্তাহের মধ্যেই ম্যারিকে খুন করে তার মৃত্যুর রাতেই তার বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ম্যারির বোন রাজি হলে ম্যারির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ছয় দিন পরই তারা বিয়ে করে। ম্যারির বোন তাকে নিজের ৭৫০ ডলারের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও একটি গাড়ি উপহার দিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে থাকার পরামর্শ দেয়। ম্যারির সব টাকা ও সম্পত্তি হাতিয়ে জোহান ম্যারির বোনকে নিয়ে অন্যত্র যায়। এর মধ্যে ম্যারির বোন পুলিশকে খবর দিলে তারা সেখানে জোহানের জন্য আগে থেকেই ওঁৎ পেতে থাকে। ম্যারির বোনের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। আবারও জর্জ শিপির চোখে ধুলা দিয়ে পালিয়ে যায় জোহান। এদিকে ম্যারির চিকিৎসক পোস্টমর্টেম করে ম্যারির দেহে আর্সেনিক ও বিষ দুটিই পান। তার শরীরে যে পরিমাণ আর্সেনিক ছিল তা দিয়ে দশ-বারজন মানুষকে অনায়াসে মেরে ফেলা যায়। এতখানি আর্সেনিকের মধ্যে বিষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ম্যারির দেহে একটি তরলের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যার সাথে আর্সেনিকের কোনো মিল নেই। এটি ছিল অন্য ধরনের বিষ, যা হয়তো ম্যারির মৃত্যু ঘটায়। আবারও সব পত্রপত্রিকায় জোহানের ছবি ও তার কর্মকাণ্ড বিস্তারিত ছাপানো হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই নিউইয়র্ক থেকে ফোন করে এক মধ্যবয়সী মহিলা। তার বাড়িতে নতুন আসা ভাড়াটিয়া হেনরি বার্টেলসকে (Henry Bartels) সে জোহান বলে শনাক্ত করে। সে পুলিশকে আরও জানায় যে, মাত্র ২০ মিনিট আগেই এই ব্যক্তি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। পুলিশ এক মুহূর্ত দেরি না করে মহিলার বাড়ি সম্পূর্ণ ঘেরাও করে ফেলে। ধীরে ধীরে জোহানের ঘরের কাছে গিয়ে আচমকা হামলা করে তাকে গ্রেফতার করে। তার ঘর থেকে একটি রিভলভার, বেশ কয়েকটি বিয়ের আংটি ও আর্সেনিকপূর্ণ ফাউন্টেন পেন উদ্ধার করে। জোহান বলছিল যে কলমটি সে আত্মহত্যা করার জন্য আর্সেনিকপূর্ণ করেছে। কিন্তু এবার আর পুলিশ তার আত্মহত্যার অজুহাতে কান দিল না। গ্রেফতার করে সোজা তাকে জেলে ভরা হলো। জর্জ শিপি অনেক কষ্ট করার পর শেষ পর্যন্ত জোহানকে গ্রেফতার করে।

জোহানের মামলার বিচারকালে সম্পূর্ণ সময় সে বাচ্চাসুলভ আচরণ করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেয়েছে। এমনকি সে বার বার বলেছে, "এই পৃথিবীতে আমার কাজ শেষ, সবার সাথেই আমার কাজ শেষ, আমার কিছু আর বলার নেই। আমি নির্দোষ।" সে তার বিচারের রায় ঘোষণার আগ পর্যন্ত নিশ্চিত ছিল যে তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানোর আদেশ কখনই দেওয়া হবে না। কিন্তু তার

ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো না। বিচারপতি রায় দিলেন যে, জোহানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং তার মৃত্যু হবে ফাঁসিকাষ্ঠে। ১৯০৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি যখন তাকে ফাঁসিমঞ্চে ওঠানো হচ্ছিল সে হাসতে হাসতে বলছিল, "কি বল তোমরা? আমাকে দানবের মতো দেখায়?" তার প্রশ্নের উত্তর কেউ দিল না। ফাঁসিমঞ্চের ট্রাপডোরটি দিয়ে তার ভারী দেহটি সবেগে পড়ে যায়, মৃত্যু ঘটে জঘন্য এক অপরাধীর।

জোহানকে অন্য যেসব খুনের জন্য সন্দেহ করা হচ্ছিল তার কাহিনি ১৯৩৫ সালের আগে উদ্ঘাটিত হয়নি। তখন শিকাগোতে অবস্থিত জোহানের বাড়িটি সরকারের পক্ষ থেকে ভেঙে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তখনই তার বাড়ির বেশ কয়েকটি দেওয়াল ও মেঝে থেকে বের হয় অসংখ্য মানুষের হাড়। কংক্রিটের আড়ালে চাপা পড়ে ছিল ভয়ংকর রহস্য। মৃত নারীদের নাম, সংখ্যা, তাদের ক'জন জোহানের স্ত্রী ছিল এবং কাকে কখন কীভাবে হত্যা করেছে এসব প্রশ্নের উত্তর জোহানের মৃতদেহের সাথে চিরদিনের জন্য চাপা পড়ে গেছে। অমীমাংসিত হত্যাগুলো আজও রহস্যই থেকে গেল।

ইস্ট এন্ড টেরর

১৮৮৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, লন্ডনের ফ্লিট স্ট্রিটে (Fleet Street London) অবস্থিত সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সিতে (Central News Agency) একটি চিঠি এল। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল এরকম–

"প্রিয় বস (Boss), বেশ কিছুদিন যাবৎ আমার কানে আসছে যে পুলিশ নাকি আমাকে ধরে ফেলেছে। কিন্তু এত সহজে তারা আমাকে ধরে ফেলতে পারবে না। আমি দমে যাইনি, আমি এখন কিছু নির্দিষ্ট ধরনের নারী নিয়ে ব্যস্ত আছি। আমি তাদের সবাইকে ছিঁড়ে ফেলব এবং আমাকে বেঁধে না রাখা পর্যন্ত আমি তা করতেই থাকব।"

আমার শেষ কাজটি ছিল অত্যন্ত উঁচু মাপের কাজ। আমি মেয়েটিকে বিন্দুমাত্র নালিশ করারও সময় দেইনি। আমি আমার কাজটি খুবই ভালোবাসি এবং আমি আবারও পুরোদমে কাজ শুরু করতে চাই। খুব শীঘ্রই আপনি আমার কাছ থেকে আমার এই ক্ষুদ্র মজার কাজটি সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন।

আমার সর্বশেষ কাজের নিদর্শনস্বরূপ কিছু লাল রঙের তরল পদার্থ একটি জিঞ্জার বিয়ারের বোতলে ঢেলে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম ওটা দিয়েই চিঠিটি লিখব। কিন্তু পরে সেটি ঘন ও চটচটে হয়ে যাওয়ায় আর ব্যবহার করতে পারলাম না। আশা করি লাল কালিতে ভালোই কাজ হয়েছে। তাই না? এরপর আমি কানগুলো কেটে রাখব এবং শুধু মজা করার জন্যই পুলিশকে পাঠাবো।

'জ্যা দ্য রিপার' নামে স্বাক্ষরিত এই চিঠিটি পাওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ এ নামটি শোনেনি। এই চিঠিটিই এই ভয়ংকর রহস্যময় খুনিটিকে আলোচিত করে রেখেছে যে কিনা তখন লন্ডনের অলিগলিতে প্রায় অদৃশ্য হয়েই ওঁৎ পেতে থাকত। 'জ্যাক দ্য রিপারের' ত্রাসের রাজত্বের সময়কাল খুব একটা লম্বা ছিল না। ১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসের এক ভ্যাপসা গরম রাতে সে প্রথম আঘাত হানে এক মহিলার উপর। প্রায় তিন মাস পর কুয়াশাচ্ছন্ন এক রাতে সে এই খুনটির কথা স্বীকার করে। জানা যায় যে সে পাঁচটি নারীকে খুন করেছিল। তবে কোনো কোনো অপরাধবিজ্ঞানী খুনের সংখ্যাকে ১১ বলে ধারণা করেন। তার সম্পর্কে খুব

কম তথ্যই জানা গিয়েছিল। যা জানা গিয়েছিল তা হলো, তার চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান ছিল এবং সে ছিল বাঁহাতি। এটি প্রমাণিত হয় তার শিকারদের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মৃতদেহ থেকে। ধারণা করা হয় যে, সে লম্বা, শুকনা গড়নের ফরসামতো ব্যক্তি ছিল, যার কালো মোছ ছিল। এই বর্ণনাটি এক সাক্ষী ও পুলিশ সদস্যর কাছ থেকে জানা যায়। তারা এরকম একটি ব্যক্তিকে অপরাধের ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত ত্রস্তপায়ে হেঁটে যেতে দেখেছে। প্রতিবারই সে একটি টুপি ও লম্বা কোট পরত এবং অত্যন্ত জোরে ও সবেগে হেঁটে চলত। তারপরও এক্ষেত্রে ঘটনাটি এমন ছিল যে কেউই তাকে খুনি হিসেবে শনাক্ত করতে পারেনি। এমনকি ১৯৯২ সালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এ ঘটনার সাথে জড়িত গোপন ফাইলপত্র জনগণের সামনে প্রকাশ করে তারা শুধুই আশা করেছিল যে হয়তো তা কোনো আশার আলোর সঞ্চার করে ব্যাপারটির কোনো সুরাহা করতে সহায়ক হবে।

লন্ডনের সবচেয়ে রহস্যময় ও হিংস্র গণ-খুনির ত্রাসের কাহিনি শুরু হয় ১৮৮৮ সালে ৭ আগস্টের ভোর ৫টার দিকে। এক ব্যক্তি খুব তাড়াহুড়ো করে হোয়াইট চ্যাপেল (Whitechapel) নামের এক ব্যক্তির জীর্ণশীর্ণ বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। তিনি ঐ জঘন্য ভাঙাচোরা বাড়িতে এটি রুম নিয়ে থাকতেন। তাড়া ছিল বলে সে দৌড়েই অন্ধকারের মধ্যে নামছিল। দরজার কাছে হঠাৎ কোনো বস্তা জাতীয় কিছু তার পায়ে বাঁধে। জিনিসটি এমন অবস্থায় ছিল যে, ওটা না সরিয়ে দরজা দিয়ে বের হওয়া সম্ভব ছিল না। সে পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সেটি সরিয়ে দিয়ে গিয়ে হঠাৎ অনুভব করে যে একটি কোনো মানুষের দেহ। সাথে সাথেই সে নিচের দিকে তাকায় এবং ভয়ে আতঙ্কে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। তার পায়ের কাছে পড়ে ছিল একজন নারীর দেহাবশেষ। রক্তাক্ত দেহটির চারপাশেই ছিল রক্ত আর রক্ত, যা তখন তার পায়েও লেগে গিয়েছিল। সে আর দেরি না করে সাথে সাথে পুলিশকে খবর দেয়। মেয়েটিকে মার্থা টার্নার (Martha Turner) বলে শনাক্ত করা হয়। পেশায় সে ছিল একজন যৌনকর্মী। মেয়েটির গলা কেটে ফেলা হয়েছিল। সারা গায়ে অসংখ্য ছুরির আঘাতের চিহ্ন ছিল। তার দেহটির উপর যে পৈশাচিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়েছে, তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। শুধু তাই নয় মেয়েটিকে নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণ করা হয়েছিল। এতটুকুতে ক্ষান্ত হয়নি উন্মাদ খুনি। বিবস্ত্রপ্রায় মেয়েটির শরীরের কয়েকটি অংশ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এদিক সেদিক পড়ে ছিল। তার স্তনে ছিল ছুরির আঘাত ও কামড়ানোর চিহ্ন। পেট চিঁড়ে ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ছুরি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছিল। এরূপ জঘন্য খুনের ঘটনা বিরল হলেও তখন যৌনকর্মীদের খুন কোনো বিরল ঘটনা ছিল না। শীঘ্র কোনো সুরাহা না হওয়ায় এই মামলাটি কাগজেই থেকে গেল এবং চাপা পড়ে গেল। আর কোনো তদন্তের প্রয়োজন বোধ করল না কেউ। এর ঠিক ২৪ দিন পরই যখন একইভাবে আরও একটি খুন হলো খন

আতঙ্ক ও ত্রাসের শিহরণ বইতে শুরু করে লন্ডনের ইস্ট এন্ডের (East End) নোংরা গলিগুলোতে। আগস্টের ৩১ তারিখের ভোরে ৪২ বছর বয়স্কা ম্যারি অ্যান নিকোলসের (Mary Ann Nicholls) ক্ষতবিক্ষত দেহ পাওয়া যায়।

ড্রইট- আসল জ্যাক দ্যা রিপার

মার্থার ভয়ংকর পরিণতিতে কারো টনক নড়েনি, তা বোঝা যায় ম্যারির মৃত্যু দেখে। বোঝাই যাচ্ছিল যে, ম্যারি এই ঘটনাটিকে তেমন পাত্তা দেয়নি। সে টাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। যখন একজন লম্বা ফরসা মতো মানুষের সাথে দেখা হয় সে শুধুই অর্থ উপার্জনের কথাই ভাবছিল। ঐ মুহূর্তে তার দরকার ছিল রাত কাটানোর মতো একটি ঘর, যেন সে এই অপরিচিত ব্যক্তির সাথে রাত কাটিয়ে কিছু টাকা ও এক বোতল জিনের যতখানি সম্ভব তা অর্জন করতে পারে। লোকটি তাকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। যখন সে বুঝতে পারে কী হতে যাচ্ছে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। লোকটি এক হাতে তার মুখ চেপে ধরে অন্য হাতে একটি ছুরি দিয়ে তার গলা কেটে ফেলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায় ম্যারি। এরপর নিথর দেহটির সাথে শুরু হয় খুনির জঘন্য পৈশাচিক খেলা। ছুরির ক্ষতবিক্ষত হয়নি এমন কোনো স্থান বাকি ছিল না ম্যারির শরীরে। তার মৃতদেহ

পর্যবেক্ষণ করে গোয়েন্দারা বলেন, "একমাত্র বদ্ধ পাগলের পক্ষেই এরকম কাজ সম্ভব।" ঐ মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, "আমি আমার চাকরি জীবনে এতটা ভয়ংকর ঘটনা দেখিনি। ম্যারির পুরো শরীর এমনভাবে চিড়ে ফেলা হয়েছিল, যা দেখে খুনিকে ওকাজে অত্যন্ত পারদর্শী মনে হয়েছে। এমন কোনো পদ্ধতি নেই যা সে ছুরি দিয়ে ব্যবহার করেনি। ম্যারি, যাকে সবাই প্রেটি পলি (Pretty Polly) বলে চিনত, তাকে চেনার কোনো উপায় ছিল না। এই ঘটনার তদন্ত শেষ হতে না হতেই ভয়ংকর এই খুনি আবারও আঘাত হানে। এবার তার শিকার ছিল ৪৭ বছর বয়সী ডার্ক অ্যানি চ্যাপম্যান (Dark Annie Chapman)। অ্যানি ছিল ধনুষ্টংকার রোগী এবং খুনের সময় তার অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। তার মৃতদেহ পাওয়া যায় হ্যানাবারি স্ট্রিটে (Hanbury Street)। অত্যন্ত সাবলীলভাবে তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহটি রাস্তায় শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তার ঘর থেকে তার সামান্য কিছু সম্পত্তি এনে তার মৃতদেহের চারপাশে ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল। হ্যানকরি স্ট্রিটের স্পিটালফিল্ড বাজারটির (Spitalfield Market) নিকটবর্তী ঐ স্থানটি রক্তে ভিজে গিয়েছিল যখন মৃতদেহটি মানুষের নজরে আসে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেউ রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ফেলে রাখে খুনি, যার ফলে রক্তের স্রোত অনেক বড় জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে'।

পরবর্তী শিকার ছিল এলিজাবেথ স্ট্রাইড (Elizabeth Stride) নামের এক যৌনকর্মী, যাকে সবাই লং লিজ (Long Liz) বলে ডাকত। এলিজাবেথের মৃতদেহ পাওয়া যায় ৩০ সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধ্যায়। একজন পুলিশ কনস্টেবল কোনো কাজে ওদিকে আসছিল এবং সে হঠাৎ খেয়াল করে যে ফ্যাক্টরির গেটে একটি সাদা রঙের মহিলাদের মোজা আটকে আছে। ওভাবে মোজা ঝুলে থাকাটা তার কাছে অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় সে এগিয়ে যায়। গেটের পাশেই অন্ধকার গলিতে পড়ে ছিল একটি নিথর দেহ, সেটি আর কেউ নয়, লং লিজ নামে পরিচিত এলিজাবেথ স্ট্রাইড। এটিই হয়তো দ্য রিপারের একমাত্র শিকার, যাকে ক্ষতবিক্ষত করে পুরো বিকৃত করা হয়নি। ব্যাপারটি একই সাথে পুলিশকে হতবাক করল এবং দ্বিধায় ফেলে দিল। তবে কি জ্যাক দ্য রিপারের জঘন্য কাজ এবার বন্ধ হবে? শীঘ্রই উত্তর পাওয়া গেল, না! এলিজাবেথের মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যে এই পিশাচ তার রক্তপিপাসা মেটানোর জন্য নতুন শিকার পেয়ে গেল। এই প্রথমবার জঘন্য খুনিটি তার সম্পর্কে কিছুটা সাক্ষ্য ফেলে যায়। এলিজাবেথের মৃতদেহ যেখানে পাওয়া যায় সেখান থেকে মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটাপথের দূরত্বেরই পাওয়া যায় আরও একটি লাশ। মৃত ব্যক্তি ছিল ৪০ বছর বয়স্ক ক্যাথরিন এডোয়েস (Catherine Edowes) নামক এক যৌনকর্মী। এ পর্যন্ত পাওয়া যাওয়া সকল লাশের মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে ভয়ংকরভাবে নির্যাতিত ও বিকৃত। ক্যাথরিনের কান দুটি কেটে ফেলা হয়েছিল। চোখ-মুখ ছিল

ক্ষতবিক্ষত, একটি চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল। প্রতিবারের মতো এবারও গলার ডান পাশের ধমনী কেটে খুন করা হয়েছে এবং গলার বাকি অংশ চিড়ে ফালি ফালি করে ফেলে তার জরায়ু ও বাম পাশের বৃক্ক (কিডনি) দেহ থেকে কেটে ফেলা হয়েছিল। জঘন্যতম এখানেই শেষ নয়। ক্যাথরিনের মাথা থেকে বের হওয়া রক্ত দিয়ে পাশের দেওয়াল পর্যন্ত তীর চিহ্ন এঁকে একটি লেখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা করেছিল খুনি। দেওয়ালে চক দিয়ে, রক্ত দিয়ে ঘিরে লেখা ছিল, "The Jewes are not men to be blamed for nothing", তবে এই মূল্যবান তথ্যরূপ ভয়ংকর লেখাটির গভীরে কেউ যায়নি। মেট্রোপলিটন পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তা স্যার চার্লস ওয়ারেন (Sir Charles Warren) ভয় পাচ্ছিলেন যে লেখাটি প্রকাশ পেলে হয়তো ইহুদিদের প্রতি ঘৃণার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। তিনি আদেশ দিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেখাটি মুছে ফেলে তা চিরতরে ধামাচাপা দিতে।

এদিকে লন্ডনের ইস্ট এন্ডের নোংরা অলিগলিতে দাবানলের মতো কিছু গুজব ছড়াতে থাকে। কেউ বলে জ্যাক দ্য রিপারের সাথে সব সময় একটি কালো ব্যাগে থাকে তার খুনের অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি। এর ফলে আতঙ্কগ্রস্ত জনগণ এমন ব্যাগ বহনকারী সকল পথিককে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করে। অনেক নির্দোষ মানুষকে জনগণের তাড়া ও পুলিশের হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আবার শোনা গেছে যে, জ্যাক দ্য রিপার একজন বিদেশি নাবিক। এর ফলস্বরূপ বিদেশি উচ্চারণের বাচনভঙ্গির লোকদের কারণে-অকারণে সন্দেহের স্বীকার হতে হয়েছিল। বিদেশিরা যেন মুখ খুলতেও ভয় পেত, যাতে তাদের সন্দেহ করা না হয়। আবারও কিছুদিন পর গুজব ছড়ায় যে, খুনি একজন ইহুদি কসাই। এর ফলে ইহুদিবিরোধী (Anti-Semitism) পরিবেশের প্রভাব পড়ছিল ইহুদি অভিবাসীদের উপর। এছাড়া রাশিয়ান ও পোলিশদের সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনের ফলেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সব সময় উত্তপ্ত হতে থাকল। এতে করেও সাধারণ জনগণের সন্দেহের তালিকার সমাপ্তি হয়নি। দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের মধ্যে এমন ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করে যে খুনি একজন পুলিশ সদস্য। তাদের কথা, পুলিশ সদস্য না হলে কীভাবে কারো সন্দেহের উদ্রেক না করে খুনি অবাধ চলাচল করে? এছাড়াও অন্যান্য সন্দেহের মধ্যে ছিল যে, খুনি একজন বিকৃতমস্তিস্ক উন্মাদ চিকিৎসক। অথবা, সে জারের (Czar's) গোপন পুলিশ বাহিনীর একজন নরঘাতী পিশাচ, যাকে লন্ডনের শান্তি বিনষ্ট করতে পাঠানো হয়েছে। সে এক পিশাচ ছাড়া কিছুই নয়, যার মধ্যে যৌনকর্মীদের প্রতি তীব্র উন্মাদপ্রায় ঘৃণা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি নেই।

নভেম্বরের ৯ তারিখ, জ্যাক দ্য রিপার আরও আঘাত হানে। এবারের শিকার ম্যারি কেলি (Mary Kelly) যে কিনা অন্যান্য শিকার থেকে একদম আলাদা

ছিল। তার বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। সুন্দরী এই স্বর্ণকেশী মেয়েটি সর্বশেষ জীবিত দেখে জর্জ হাচিনসন (George Hutchinson) নামের এক ব্যক্তি। তাকে কেলি তার ঘর ভাড়া মেটাতে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছিল। জর্জ টাকা দিতে অস্বীকার করলে সে লম্বা একহারা গড়নের একটি ছেলের কাছে যায়। তার পরনে ছিল দামি পোশাক ও মাথায় ছিল ডিয়াস্টকার (Deerstalker) টুপি। চেহারায় সবার আগে নজর কাড়ে তার সুরু করে ছাঁটা মোছটি। এরপর তাকে আর কেউ জীবিত দেখেনি। পরদিন ভোরে হেনরি বোওয়ারস (Henry Bowers), পরদিন যার কাছে সে ঘর ভাড়া নিয়েছিল, এসে কেলির দরজায় কড়া নাড়ে। তার বেশ কিছুদিনের ভাড়া পাওয়া ছিল বিধায় সে একটু বেপরোয়া হয়েই দরজায় আঘাত করে। অনেকক্ষণ ধরে বারবার কড়া নাড়ার পরও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে হেররির মনে ভয় জাগে যে মেয়েটির কিছু হয়ে গেল নাকি? সে তাড়াতাড়ি ঘরটির জানালার কাছে গিয়ে তা খোলার ব্যবস্থা করে। পর্দাটি সরাতেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে হেনরি। ঘর ভাড়ার কথা নিমেষেই ভুলে গিয়ে সে দৌড়ে যায় পুলিশকে খবর দিতে। পরবর্তীতে তাকে বলতে শোনা যায়, "আমার বাকি জীবনে এই ঘটনা আমাকে আতঙ্কিত করে রাখবে।" ধরে ঢুকেই সে দেখতে পায় সারা ঘরের দেওয়ালে রক্তের ছোপ। বিছানাটি ছিল সম্পূর্ণ রক্তে লাল। এরপর আর এগোতে সাহস পায়নি সে। পুলিশ এসে উন্মাদ পিশাচের রক্তলোলুপতা প্রত্যক্ষ করে। গলার ধমনী তো কেটে ফেলা হয়েছেই-কান, চোখ ও জিহ্বা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছিল। পেট চিড়ে জরায়ু, বৃক্ক ও যকৃত টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। স্তন ও যৌনাঙ্গের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। ছুরির আঘাতে সারা দেহ ছিল বিকৃত। কয়েক স্থানে মাংসও ছিল না।

তবে মেরি কেলির মৃত্যুর পর জ্যাক দ্য রিপারের ত্রাসের রাজত্ব হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়। যেমন রহস্যময়ভাবে তা শুরু হয়েছিল, রহস্যের আড়ালে থেকেই তা শেষ হয়ে যায়। দুজন গ্রেপ্তারকৃত খুনি নিজেদের জ্যাক দ্য রিপার বলে দাবি করে। এদের একজন যে তার মালকিনকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছিল, গ্রেপ্তার করার পর পুলিশকে বলেছিল, "শেষ পর্যন্ত তোমরা জ্যাক দ্য রিপারকে ধরেই ফেললে।" তবে তার এই কথাটি সত্য প্রমাণিত কার জন্য যেমন কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না। দ্বিতীয়জন ফাঁসিকাঠের ঠেলা দরজাটি খুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত চিৎকার করতে থাকে যে সেই জ্যাক দ্য রিপার। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে সে জ্যাক দ্য রিপার নয়। কেননা, রিপারের অপরাধ সংঘটনের সময় সে আমেরিকাতে জেল খাটছিল। কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা একজন নিশ্চিত ছিলেন যে তারা জানেন জ্যাক দ্য রিপারের আসল পরিচয়। ১৯০৮ সালে পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বলেন, "খুনিকে আমি একজন পোলিশ ইহুদি বলে ঘোষণা করছি এবং আমি বলতে পারি যে আমি একটি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত

তথ্য দিচ্ছি বলছি।" কিন্তু ইন্সপেক্টর রবার্ট সেজার (Robert Sagar) যিনি জ্যাক দ্য রিপারের মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলেন, "আমাদের কাছে যথার্থ কারণ ছিল অ্যাল্ডগেইটের বুচার'স রো'তে (Butcher's Row, Aldgate) বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে সন্দেহ করার। এতে কোনো সন্দেহ ছিল না যে সে মানসিক বিকারগ্রস্ত ছিল। তার বন্ধু-বান্ধব এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে তাকে পাগলা গারদে সরিয়ে নেওয়াটাই উত্তম হবে। এই ব্যক্তিকে পাগলা গারদে নিয়ে যাবার পর থেকে রিপারের আর কোনো নৃশংসতার ঘটনা ঘটেনি।"

জ্যাক দ্য রিপারের নিষ্ঠুরতায় সবাই এত আতঙ্কিত ছিল যে বলতে গেলে কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিল এই মামলার রহস্যেদঘাটনের পিছে। এমনকি রানী ভিক্টোরিয়ার (Queen Victoria) জ্যেষ্ঠ পুত্র (Grandson) প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টর, ডিউক অব ক্ল্যারেন্সকেও (Prince Albert Victor, Duke of Clarence) সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছিল। প্রিন্স অ্যালবার্ট জীবিত থাকলে তাঁর পিতা সপ্তম এডওয়ার্ডের (Edward VII) মৃত্যুর পর তিনিই ইংল্যান্ডের রাজা হতেন। তবে সকল সন্দেহের ইতি টানেন সম্ভবত একজন লেখক ও ঘোষক ডানিয়েল ফারসন (Daniel Farson) যিনি রিপার হিসেবে সন্দেহ করেন মন্টাগু জন ড্রইট (Montagy John Druitt) নামক এক ব্যক্তিকে। ড্রইট ছিল একজন ব্যর্থ আইনজীবী, যার চিকিৎসাজ্ঞান ছিল যথেষ্ট ভালো। শুধু তাই নয়, তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উন্মাদ বা বিকারগ্রস্তের উদাহরণ পাওয়া গিয়েছিল। ফারসন তার অনুযোগটি করেন স্যার মেলভাইল ম্যাকন্যাটেনের (Sir Melville Macnaghten) তথ্যের আলোকে। তিনি ১৮৮৯ সালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যোগদান করেন এবং ১৯০৩ সালে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের (Criminal Investigation Department) প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ৩ জনকে সন্দেহ করেন জ্যক দ্য রিপার হিসেবে, একজন ছিল পোলিশ ব্যবসায়ী এবং ইহুদি যে নারীদের তীব্র ঘৃণা করত, দ্বিতীয়জন ছিল একজন হত্যাবৃত্তিপূর্ণ চিকিৎসক ও তৃতীয়জন হলো ড্রইট।

ড্রাইটকে প্রায় নিশ্চিতভাবে জ্যাক দ্য রিপার বলে সন্দেহ করার কারণ হলো, ম্যারি কেলির মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পর টেমন নদীতে (River Thams) ড্রইটের লাশ ভাসমানরত পাওয়া যায়। ড্রইটের মৃত্যুর পর থেকে আর কখনো জ্যাক দ্য রিপারের আবির্ভাব ঘটেনি।

দ্য ওয়ান হু গট অ্যাওয়ে

যদি 'Kiss of death' শব্দটির অস্তিত্ব আগে থেকেই না থাকত হয়তো বেলা কিস (Bela Kiss) সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা দেওয়ার জন্য লেখকদের এটি আবিষ্কার করে নিতে হতো। মধ্যবয়সী সচ্ছল এই হাঙ্গেরিয়ান (Hungerian) ব্যক্তি তার তথাকথিত যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর আগে কমপক্ষে ২৩টি হত্যাকাণ্ড সংঘটন করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মৃত ঘোষিত হয়ে সে আমেরিকায় পালিয়ে যায়। বেলা কিস সে সব গুটিকয়েক ভয়ংকর গণহত্যাকারীদের মধ্যে একজন যে কিনা কৌশলে ন্যায়বিচার এড়িয়ে পালাতে সফল হয়েছিল। ১৯১৩ সালে কিস যখন তার ২৫ বছর বয়সী সুন্দরী স্ত্রী মারিয়াকে (Maria) নিয়ে জিঙ্কোটা (Czinkota) নামের হাঙ্গেরিয়ান গ্রামে আসে, তার বয়স ছিল ৪০ বছর। সেখানে সে বেশ বড় একটি বাড়ি কিনে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস শুরু করে। বাড়িতে বিভিন্ন কাজের জন্য সে বেশ কয়েকজন চাকরও রেখেছিল। প্রতিবেশীরা কিছুদিনের মধ্যেই নতুন আসা মানুষটির প্রতি কৌতূহলী হয়ে উঠল। তার শখ ছিল ডাকটিকেট সংগ্রহ করা ও গোলাপের বাগান করা। এছাড়া সে জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে কিছুটা লেখালেখিও করত। তাকে প্রায়ই তার সুন্দর লাল গাড়িটিতে করে ব্যবসার কাজে বুডাপেস্টে (Budapest) যেতে দেখা যেত। কনস্টেবল অ্যাডল্ফ ট্রবার (Constable Adolph Trauber) যে জিঙ্কোটার গ্রাম পুলিশ হিসেবে নিয়োজিত ছিল, খুব শীঘ্রই তার খুব ভালো বন্ধুতে পরিণত হয়। যখন কিস বুডাপেস্টে যেত ট্রবার স্বচ্ছন্দেই তার বাড়িটিকে একটু দেখে রাখত যেন কোনো বিপদ-আপদ না হয়। যুদ্ধের প্রায় একমাস আগে ট্রবার দেখল তার বন্ধু বুডাপেস্ট থেকে ফেরার সময় গাড়ি ভর্তি করে বেশ কয়েকটি তেলের ড্রাম নিয়ে ফেরা শুরু করল। কিস তাকে বলল যে, বুডাপেস্ট আসা-যাওয়ার পথে যেন কখনো পেট্রোলের অভাব না হয় তাই এই পেট্রোলের ড্রাম নিয়ে এসেছে সে। তার কথায় ট্রবার মোটেও আশ্চর্য হয়নি এবং সরলমনেই বিশ্বাস করল যে, ড্রামগুলো পেট্রোল ভর্তিই ছিল। এদিকে তার বাড়িতে কী ঘটছে সে সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না। ট্রবার, তার চাকর ও গ্রামবাসী সবাই জনত যে তার অবর্তমানে তার যুবতী স্ত্রী পল বিহারি (Paul

Bihari) নামের এক চিত্রশিল্পীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িত ছিল। মারিয়ার পরকীয়ার কথা কেউই তাকে জানায়নি। বুডাপেস্ট থেকে ফিরে এসে একদিন সে তার স্ত্রীর একটি চিঠি পায়, যাতে লেখা ছিল যে, মারিয়া ও পল পালিয়ে বিয়ে করেছে। উন্মাদপ্রায় অবস্থায় সে যখন সবাইকে চিঠিটি দেখাচ্ছিল তখন সবাই সহানুভূতি দেখিয়েছিল। কিন্তু তখনো কেউ বলেনি যে, তারা এমনটি হবে জানত। বেশ কয়েক মাস কিস সবার আড়ালে থাকল। কারও সাথে সে দেখা করত না, এমনকি ট্রবারের সাথেও না। এরপর ১৯১৪ সালে ট্রবার এক প্রকার জোর করেই তাকে স্বাভাবিক জগতে ফেরত আনে ও তার দেখাশোনার জন্য জাকুবেক (Jakubec) নামের একজন বয়স্কা বিধবা মহিলাকে নিযুক্ত করে। কিস আবারও বুডাপেস্টে তার ব্যবসা শুরু করে এবং প্রতিবারই গাড়িতে করে বড় ড্রাম নিয়ে ফিরত। সে ট্রবারকে বলেছিল যে, বুডাপেস্টের এক গ্যারেজ মালিক তার পাওনা মেটাচ্ছে এই পেট্রোল দিয়ে। তবে আসল কাহিনি ছিল অন্য কিছু। ড্রামে করে প্রতিবার কিস পেট্রোল নয় মেয়ে নিয়ে আসত। মারিয়ার মতো কমবয়সী নয়, এমন কি কোনো কোনো সময় তার নিজের চেয়ে বয়স্ক মহিলাও নিয়ে আসত সে। তার গৃহপরিচালিকা এসব মেয়েদের কথা জানত এবং কখনো কাউকে কিছুই বলত না। তবে প্রায়ই সে ক্ষুব্ধ হতো যখন মাঝে মাঝে তার গোছালো রান্নাঘরটি তছনছ করা হতো। সে বাহির থেকে ফিরে এসে রান্নাঘরের করুণ অবস্থার কথা জিজ্ঞাস করলে কিস তাকে বলত যে, বুডাপেস্ট থেকে আনা মেয়েটিই এসব করেছে এবং সে চলে গিয়েছে।

কিস ও ট্রবার প্রায়ই সন্ধ্যায় একসাথে গল্পগুজব করে সময় কাটাতো। একদিন কথা বলতে বলতে ট্রবার তাকে জানায় যে বুডাপেস্টে দুজন বিধবা নিখোঁজ হয়েছে। একটি লোনলি হার্টস ম্যাগাজিনের (যেসব প্রত্রিকায় নিঃসঙ্গ লোকেরা সঙ্গীর খোঁজ করে বিজ্ঞাপন দেয়) চিঠির উত্তর দেওয়ার পর থেকেই তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ট্রবার বলে যে, হফম্যান (Hofmann) নামের এক ব্যক্তির বিজ্ঞাপনের দুই উত্তরদাতার সাথেই এমন হয়েছে। লোকটি প্রথমে তাদের সকল সম্পত্তি হাত করে পালিয়েছে এবং দুজনকেই বলতে গেলে উধাও করে দিয়েছে। এ ঘটনা শুনে কিস রসিকতা করে বলে যে, সেও দুই একবার মধ্য বয়স্ক বিধবাদের সাথে সম্পর্ক করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যাপারটি নিয়ে দু'জনেই বেশ হাসাহাসি করে। তখন চারদিকে যুদ্ধ। তবুও কিসের বুডাপেস্টে যাওয়া বন্ধ হয়নি। সে তখনো সেখানে গিয়ে ড্রামে করে মেয়েদের নিয়ে ফিরতে থাকল। যুদ্ধের কারণে যখন তাকে বাধ্যতামূলকভাবে তালিকাভুক্ত করা হলো তখন সে বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় ট্রবারকে দায়িত্ব দিত তার বাড়ি ও পেট্রোলের সম্ভার পাহারা দিতে। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত এভাবেই যত্নসহকারে ট্রবার কিসের বাড়ি ও পেট্রোলভাণ্ডারে রক্ষণাবেক্ষণ করে যায়। ১৯১৬-তে বাড়িতে

একটি চিঠি আসে, যাতে লেখা ছিল, কিস যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছে। ট্রবার তার বন্ধুর মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হলো। এরপরও সে বাড়িটি ও পেট্রোলসহ অন্যান্য জিনিস সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে যায়। সে বছর গ্রীষ্মেই তাদের গ্রামে সৈনিকেরা আসে পেট্রোলের খোঁজে। ট্রবারের হঠাৎই মনে পড়ে কিসের পেট্রোলভাণ্ডারের কথা।

সৈনিকদের সেকথা জানানোতে তারা অত্যন্ত খুশি হয়। ট্রবার সৈনিকদের কাছে পেট্রোলের ড্রামগুলো বুঝিয়ে দেয়। সে তখনো জানত না যে, একটি ভয়াবহ আবিষ্কার তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ড্রামগুলো নিয়ে যাবার পর সৈনিকেরা টের পেল যে, ড্রামগুলো থেকে একটু অস্বাভাবিক বোটকা গন্ধ বের হচ্ছে। ডিটেকটিভ চিফ চার্লস ন্যাজি (Charles Nagy) ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার জন্য আসলেন। তিনি একটি ড্রাম সাবধানে খুললেন। পুরোপুরি খোলার পর বোটকা গন্ধের রহস্য দূর হয়ে গেল। ড্রামটির ভেতরে পেট্রোলের বদলে ছিল অ্যালকোহল ও তাতে একটি নগ্ন নারীদেহ পাওয়া যায়। পচন ধরা মৃতদেহ থেকেই দুর্গন্ধ আসছিল। দ্রুত বাকি ছয়টি ড্রামও খুলে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটিতেই এমন একটি করে অ্যালকোহলে ডুবানো লাশ রয়েছে। মেয়ে গুলিকে শ্বাসরোধ করে বা বিষপান করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। দ্রুত কিসের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তার বাড়ির বাগান খুঁড়ে সেখানে অনেকগুলো টিন-ক্যান কফিন পাওয়া যায় যার প্রতিটিতেই ছিল এমন মৃতদেহ। মৃতদেহগুলির মধ্যে কিসের স্ত্রী মারিয়া ও তার প্রেমিক পলের মৃতদেহও পাওয়া যায়। মারিয়ার পালিয়ে যাবার কাহিনি এতদিনে পরিষ্কার হয়। কিস বহু আগেই তাকে হত্যা করেছিল। ২৩টি মৃতদেহের প্রত্যেকটির গলায় ফাঁসের দাগ ছিল।

বেলা কিস, তার কয়েকজন শিকার, তার বাড়ি, মৃত্যদেহ বহনকারী ড্রাম, চার্লস ন্যাগি, একটি জামের ভেতরের দৃশ্য, ওয়াশ হাউস (এখানেও সে বেশ কয়েকটি খুন করে) পুলিশ আবিষ্কার করে যে, কিসের গৃহপরিচারিকাকে সে সব টাকা দিয়ে গিয়েছে। ফলে সন্দেহ তার উপরেও পড়ে। তাকে গ্রেফতার করে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে বলে যে, খুনের ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। সে কিসের গোপন ঘরটি পুলিশকে দেখায়। এই ঘরে তার প্রবেশ নিষেধ ছিল, এমনকি পরিষ্কার করার জন্যও নয়। ঘরটিতে অনেক বই ও একটি টেবিল ছিল। টেবিলের ড্রয়ারে অসংখ্য চিঠি পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে জানা যায় যে, কিসের সাথে ৭৪ টি মহিলার সম্পর্ক ছিল। সবচেয়ে পুরনো চিঠিটি ছিল ১৯০৩ সালের। অর্থাৎ সে তখন থেকেই মেয়েদের প্রতারিত করে টাকা আদায় করত। এটিও পরিষ্কার হয় যে, লোনলি হার্টস ম্যাগাজিনের হফম্যান ও বেলা কিস একই ব্যক্তি। বইগুলোর বেশিরভাগই ছিল বিষপ্রয়োগ ও শ্বাসরোধ করার পদ্ধতি সম্পর্কিত। সে মেয়েদের সম্পত্তি ও টাকা হাত করে তাদের এসব বইয়ের সাহায্যে হত্যা করত।

বেশিরভাগ সময়ই সে এমন মেয়েদের নিশানা করত যাদের টাকা আছে কিন্তু খোঁজ করার মতো আত্মীয় বা বন্ধু নেই। সে তাদের বাধ্য করত তাকে টাকা দিতে এবং কোনো প্রকার ঝামেলা হলেই তাদের খুন করে ফেলত। তার নামে এভাবে টাকা নেয়ার দায়ে দুইজন বিধবা দু'টি মামলাও করেছিল বলে জানা যায়। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল কেননা কিস তখন নিজেকে যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ ঘোষণা করে বহুদূরে পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে পাবার সম্ভাবনা নেই বলে মামলাটি সেখানেই সমাপ্ত করা হয়। ১৯১৯ সালে হঠাৎ কিসের কোনো এক শিকারের বান্ধবী তাকে বুডাপেস্টের মার্গারেট ব্রিজ (Margaret Bridge) পার হতে দেখে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে পুলিশকে খবর দিলে বিস্মিত গোয়েন্দারা বের করে যে, যুদ্ধকালীন সময়ে সে অন্য সহকর্মীর সঙ্গে তার পরিচয় বদলে ফেলেছিল। তাকে ধরার আগেই সে উধাও হয়ে গেল। এরপর ১৯২৪ সালে ফ্রেঞ্চ ফরেন লিজন (French Foreign Legion) থেকে পলাতক একজন হফম্যান নামে তার এক সহকর্মীর কথা পুলিশকে জানায়। লোকটি শ্বাসরুদ্ধ করার কাজ নিয়ে খুব গর্ব করত বলে তার সন্দেহ জাগে। তবে এবারও তাকে খুঁজে পাওয়ার আগেই সে আবারও পালায়। এরপর দশ বছরের মধ্যে কেউ তার কোনো খোঁজ পায়নি। ১৯৩৬ সালে নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারের (Times Square) একটি ছয়তলা বিল্ডিংয়ে দ্বাররক্ষক হিসেবে কাজ করতে দেখা যায়। তার হাঙ্গেরিয়ান সহকর্মীরা তাকে সাদাসিধে নির্দোষ ও অক্ষতিকর ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করে। তার বয়স ছিল তখন ষাটোর্ধ্ব। এই প্রবীণ ব্যক্তির নীরস নিরানন্দ ভবিষ্যতের ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত থাকলেও তার ভয়ংকর অতীতের কথা ক'জনই বা জানে? কেউ এব্যাপারে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি।

দ্য ভ্যাম্পায়ার অব ডাসেলডর্ফ

"সে হলো যৌন অপরাধ জগতের এক ঘৃণ্য সম্রাট। একজন মানুষের মধ্যে ধর্ষকামিতার (Sadism) সর্বোচ্চ সীমা বলতে যদি কিছু থাকে, তাও সে অতিক্রম করে গেছে। সে পুরুষ, নারী, শিশু এমনকি পশুপাখিও হত্যা করেছে। বলতে গেলে সামনে যা পেয়েছে তাই হত্যা করেছে।" শিউরে ওঠার মতো এ কথাগুলো বলা হয়েছিল পিটার কারটেন (Peter Kurten) সম্পর্কে বর্ণনা করতে। ভ্যাম্পায়ার অব ডাসেলডর্ফ (Vampire of Dusseldorf) নামেই সে কুখ্যাত ছিল। ১৯৩০ সালে তার মামলার শুনানিতে এ কথাগুলো বলা হয়। অবাক হওয়ার বিষয় হলো কথাগুলো না বিচারকের বলা, না প্রসিকিউশনের কারো বলা বরং এগুলো তার পক্ষ সমর্থনকারী কাউন্সিলের। কারটেনকে মানসিক ভারসাম্যহীন প্রমাণ করার জন্য তারা আপিল করার একপর্যায়ে এ কথাগুলো বলে। তবে ৪৭ বছর বয়সী কারটেনের ত্রাস সৃষ্টিকারী পৈশাচিকতা ক্ষমা করার যোগ্য ছিল না। তাকে শাস্তির হাত থেকে রেহাই না দিলেও, ভয়ংকর ওই খুনির মানসিকতা নিরীক্ষণের জন্য দেশের অন্যতম মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের ডাকা হয়। নিষ্ঠুর কারটেন ছিল অত্যন্ত ধূর্ত এবং একই সাথে খুবই শান্ত ও নম্র। ঠান্ডা মাথায় অবলীলায় এতগুলো নৃশংস হত্যাকাণ্ড করা হয়তো তার এ বৈশিষ্ট্যের জন্যই সম্ভব হয়েছিল।

মানসিক ভারসাম্যহীনতার ইতিহাস কারটেনের পরিবারেও আছে। তার পিতাও এরই মতো নিষ্ঠুর ও অস্থিরচিত্তের মানুষ ছিল। কারটেন ছিল ১৩ জনের পরিবারের ৫ম সন্তান। তার জন্ম ১৮৮৩ সালের ২৬ মে। তাদের বাড়ি ছিল জার্মানির কোলন-মালহেইমে (Cologne-Mulheim, Germany)। ছোটবেলা থেকেই সে অত্যাচার ও শোষণ করা দেখে এসেছে। তার পিতা প্রায় প্রতিদিনই মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরত। প্রথমত সন্তানদের নিষ্ঠুরভাবে পেটাত এবং তার স্ত্রীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তানদের সম্মুখেই জঘন্যভাবে যৌন নিপীড়ন করত! এই জঘন্য পিশাচ তার নিজের ১৩ বছর বয়সী মেয়েকেও ধর্ষণ করেছিল। কারটেন তার পিতার পথই অনুসরণ করেছিল এবং তার সেই বোনকে সেও ধর্ষণ

করেছিল! অল্প বয়স থেকেই সে এমন নোংরা প্রবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তার পিতার অন্যতম সঙ্গী হওয়াতে তাকে কখনো মার খেতে হতো না। সে তার অন্য বোনদেরও ভয়ংকরভাবে যৌন হয়রানি করত এবং ধর্ষণ করত। কারটেনের নিষ্ঠুরতার হাতেখড়ি তার পিতার হাতে ঘটলেও তার আরও একজন গুরু ছিল, যার কাছ থেকে তার নিষ্ঠুরতা নৃশংসতার রূপ লাভ করে। স্থানীয় কুকুর শিকারির কাছ থেকে সে কুকুরের ওপর অত্যাচার করা শেখে। ধীরে ধীরে কুকুর থেকে ভেড়া, শূকর, ছাগল এবং হাঁসের ওপর অত্যাচার শুরু করে। তার অস্বাভাবিক যৌনতা ও উত্তেজনার প্রকাশ পেত যখন সে এই প্রাণীগুলোর রক্ত দেখত। কিছুদিন এভাবে চলার পর সে হাঁসগুলোকে প্রথমে নিষ্ঠুরভাবে যৌন অত্যাচার করে তাদের মাথা কেটে ফেলত। এরপর ফিনকি দিয়ে বের হওয়া রক্ত পান করে সে শান্তি পেত।

খুনি পিটার কারটেন

খুব শীঘ্রই তার মনোযোগ চলে যায় মানুষের দিকে। দশ বছর বয়সে সে তার দুটি খেলার সঙ্গীকে হত্যা করে। তারা একটি র‍্যাফটে করে রাইন (Rhine) নদীতে গিয়েছিল সাঁতার কাটতে। সেখানে সে তাদের সাথে থাকা ছেলে দুটিকে ডুবিয়ে হত্যা করে। ১৬ বছর বয়সে সে বাড়ি থেকে টাকা চুরি করে পালায়। সে আশ্রয় নিয়েছিল এক মর্ষকামী (Masochistic, যে নারী অত্যাচার ও প্রহার গ্রহণের মাধ্যমে যৌনসুখ লাভ করে) যৌনকর্মীর বাড়িতে। সে মহিলা অত্যাচারের পাশাপাশি গলাটিপে ধরাতেও অস্বাভাবিক তৃপ্তি লাভ করত। সেখান থেকে কারটেনের পৈশাচিকতা আরও নতুনভাবে প্রকাশ পায়। সেই মহিলার ১৬ বছর বয়সী একটি মেয়ে ছিল যে তার মায়ের মতোই মর্ষকামী ছিল। কারটেন সেখানে থাকা অবস্থায় তারা তিনজন একসাথে ভীষণ নোংরা ও ভয়ংকর যৌন সম্পর্কে লিপ্ত ছিল, যা পৈশাচিকতার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তাদের নোংরা সহ-অবস্থানের ইতি ঘটে যখন কারটেনকে চুরি ও জালিয়াতির দায়ে জেলে যেতে হয়। পরবর্তীতে সে অনেকবার বলেছিল যে তখন সেই জেলের অমানুষিক অত্যাচার তাকে এই রক্তাক্ত খুনের পথে ঠেলে দেয়। প্রকৃতপক্ষে জেলে থাকা অবস্থায় সে আরও বেশি ধর্ষকামী হয়ে ওঠে। সে সারাক্ষণ এসব চিন্তায়ই মগ্ন থাকত। নির্জনে থাকার জন্য সে ইচ্ছা করে জেলের নিয়ম ভঙ্গ করত যেন তাকে সাজা হিসেবে নিঃসঙ্গ কারাগারে রাখা হয়। সেখানে সে তার জঘন্য পৈশাচিক কল্পনায় বিভোর থাকত। সে পরে বলেছিল যে, "আমি সব সময় চিন্তা করতাম। আমি অনেকগুলো ঘটনা কল্পনা করে রেখেছিলাম এবং সবগুলোর জন্য পরিকল্পনা করা ছিল। ভেবেছিলাম একটি ব্রিজ ধসিয়ে দেব অথবা ব্রিজের পিলারগুলো মাঝ বরাবর ভেঙে দেব। এরপর চেয়েছিলাম কোনোভাবে একটি ব্যাসিলাই ব্যাকটেরিয়াকে (Bacili, তড়কা ও অন্যান্য ভয়ংকর সংক্রামক রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া/জীবাণু) খাবার পানিতে মিশিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো, তাতে চরম দুর্দশা দেখতে পেতাম। স্কুল ও এতিমখানাগুলোয় এই পরীক্ষাটা করার চিন্তা করেছিলাম। অথবা সেখানে আর্সেনিক মেশানো চকলেটও বিক্রি করা যেত। একসাথে অনেক খুন করা যেত। এসব স্বপ্ন দেখতে আমার অত্যন্ত ভালো লাগত। অন্য পুরুষেরা নগ্ন নারীর ভাবনায় যে আমোদ পায় এসব চিন্তা আমাকে তার চেয়েও বেশি তৃপ্তি দিত।"

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরপরই সে তার দিবাস্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়িত দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে লাগল। সে ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া শুরু করল। আগুনের উজ্জ্বল শিখা তাকে অত্যন্ত উৎফুল্ল করত এবং যাদের সবকিছু ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে তাদের হতাশা ও দুঃখ তাকে শান্তি দিত। এরপর সে আত্মরক্ষায় অক্ষম নারী ও শিশুদের আক্রমণ করত। তার প্রথম

হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এ কথা সে নিজেই কোর্টে বলেছিল। ডাসেলডর্ফের গ্রাফেনবার্গ উডসে (Dusseldorf Grafenburg Woods) সে জোর করে ভয় দেখিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে ধর্ষণ করে। এরপর তাকে মারধর করে মৃত ভেবে সেখানেই ফেলে আসে। তবে ওই স্থানে কোনো মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারটেন ধারণা করে যে মেয়েটি হয়তো বেঁচে ছিল এবং পরে জ্ঞান ফেরার পর পালিয়ে গিয়েছে। হয়তো লজ্জায় বা ভয়ে পুলিশকে জানায়নি। তার পরবর্তী শিকার ৮ বছর বয়সী ক্রিস্টিন ক্লেইন (Christine Klein) এতটা ভাগ্যবান ছিল না। তাকে তার বিছানায় পাওয়া যায় ধর্ষিত ও মৃত অবস্থায়। তার গলা কেটে ফেলা হয়েছিল। মেয়েটির চাচাকে অপরাধী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণের অভাব থাকায় তাকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি দেওয়া হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই অপমানের গ্লানি তার পিছু ছাড়েনি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সে মারা যায়। কারটেন এ ঘটনায় বেশ মজা পেয়েছিল বলে জানায়। তার মামলার শুনানি ছিল দীর্ঘদিনব্যাপী এবং চমকপ্রদ। কেননা সে ১৭ বছর আগে ঘটে যাওয়া কাহিনি নিজে থেকেই বলছিল এবং বর্তমান অবস্থার সাথে সেটির সম্পর্ক বর্ণনা করছিল। তার বলা আরও একটি কাহিনি এরূপ, "সময়টা ছিল ১৯১৩ সালের ২৫ মে।" সে ভয়ংকর হিসহিসে কণ্ঠে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে থাকে, যা তার কর্মকাণ্ডকে আরও ভয়াবহভাবে উপস্থাপন করছিল। "আমি তখন বার ও হোটেলগুলোতে চুরি করতাম, বিশেষ করে যেগুলোর ওপর তলায় মালিকেরা থাকত। একদিন, কোলন মালহেইমের একটি হোটেলে, ঠিক হোটেল নয়, অতিথিশালায় গিয়ে আমি একটি ঘুমন্ত বালিকা দেখলাম জানালার দিকে মুখ করে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল। আমি তার মাথাটা শক্ত করে ধরে ডান হাতে তার গলা টিপে ধরলাম। এক-দেড় মিনিট পরই মেয়েটি জেগে উঠেছিল কিন্তু কিছু করতে পারেনি, অজ্ঞান হয়ে গেল। এরপর আমি আমার হাতের আঙুল দিয়ে তার যৌনপথ বিকৃত করে ফেললাম। এরপর মাথাটা শক্ত করে ধরে গলাটা কেটে ফেললাম। রক্ত ফিনকি দিয়ে ছুটে গিয়ে বিছানার পাশে মাদুরে পড়ল, স্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলাম। সবকিছু করতে তিন-চার মিনিটের বেশি সময় লাগেনি। আমি দরজাটা আটকে দিয়ে ডাসেলডর্ফে ফিরে গেলাম। পরদিন আবারও সেখানে গেলাম এবং রাস্তার ওপারের পানশালায় বিয়ার নিয়ে বসলাম। বসে বসে খবরের কাগজের সব অপরাধের খবর বিশেষ করে খুনের খবরগুলো পড়লাম। গত রাতের খুনটি নিয়ে আমার চারপাশের মানুষ আলোচনা করছে। তাদের আলোচনা শুনে ও প্রচণ্ডভাবে আতঙ্কগ্রস্ত দেখে আমার বেশ খুশি খুশি লাগছিল।"

যখন যুদ্ধ শুরু হয় কারটেন তার ধর্ষকামিতা ও পৈশাচিকতাকে কাইজারের (Kaizer জার্মান শব্দ, অর্থ সম্রাট বা শাসক) পক্ষে ব্যবহার করার কথা তখনো ভাবেনি। তাই সকল যোগ্য ব্যক্তিকে যুদ্ধে যোগদান করার আদেশ ঘোষণার পর

সে উধাও হয়ে যায়। জানা যায় যে, সে সময়টা তার কাটে কারাগারে, পালিয়ে বেড়ানো এবং অন্যান্য ছোট ছোট অপরাধ সংঘটনের মধ্য দিয়ে।

১৯২১ সালে ছাড়া পাবার পর সে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে আল্টেনবার্গের (Altenburg) এক যৌনকর্মীকে তার স্ত্রী হওয়ার জন্য নির্বাচিত করে। বিয়েতে রাজি না হলে সে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে তাকে বিয়ে করে এবং আল্টেনবার্গে বসবাস শুরু করে। এখানে সে বড় ধরনের অপরাধ করা ছেড়ে দিয়ে একটি ফ্যাক্টরিতে চাকরি করা শুরু করে, সেই সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যও শুরু করে। শীঘ্রই সে বেশ বড় ব্যবসায়ী ও ঐ এলাকার একজন সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। সে এমনিতে সুদর্শন ও শান্ত স্বভাবের ব্যক্তি ছিল। পোশাক নিয়ে সব সময়ই সাবধান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী থাকায় বেশ সুবিবেচনাপূর্ণ ভাবমূর্তি ছিল তার। অন্য নারীদের সাথে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা অনেকে জানা সত্ত্বেও তার স্ত্রীর কাছে কেউ বলত না। এমনকি তার সাথে প্রণয়ে জড়িত নারীরাও গোপনীয়তা রক্ষা করত। কেননা তারা কারটেনের প্রহার ও প্রায় শ্বাসরোধ করে ফেলা যৌনাচার যথেষ্ট উপভোগ করত।

১৯২৫ সালে কারটেন ও তার স্ত্রী ফ্রাও (Frau)-কে নিয়ে ডাসেলডর্ফে ফেরত আসার পরই সব আগের মতো হয়ে গেল। কারটেনের রক্তপিপাসা আবারো জেগে উঠল এবং ওটা তাকে পুরোপুরি পেয়ে বসল। ফ্রাওয়ের সাথে তার সম্পর্ক মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও দিনে দিনে অন্য নারীদের প্রতি তার ধর্ষকামিতা বেড়েই চলছিল। রক্ত দেখে যৌন উত্তেজনা পাবার জন্য সে রাস্তাঘাটে ছুরি ও কাঁচি নিয়ে মানুষের ওপর হামলা চালাতে লাগল। একদিন পুলিশ তাকে প্রায় ধরেই ফেলছিল, কিন্তু সে বেঁচে যায়। এরপর থেকে আক্রমণে বের হবার সময় সে ছদ্মবেশ ধারণ করত। তার গতিপথ যেন পুলিশ ধরতে না পারে সেজন্য প্রতিদিনই নতুন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করত। ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মের মধ্যে ডাসেলডর্ফের প্রতিটি মানুষ তার ত্রাসে তটস্থ হয়ে গিয়েছিল। পুলিশের কাছে ৪৬টি যৌন অপরাধের অভিযোগ ছিল, যার মধ্যে ছিল চারটি জঘন্য হত্যাকাণ্ড। প্রত্যেকটি মৃতদেহে যৌন অত্যাচারের বিভিন্ন চিহ্ন ছাড়াও রক্ত শুষে নেওয়ার চিহ্ন পাওয়া গেছে। গলায় ছুরির আঘাতে কেটে ফেলার চিহ্নের সাথে বিকৃত কামড়ের চিহ্নও ছিল। কিন্তু কোনোভাবেই এই পিশাচের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রত্যেকবারই সে হত্যা বা কোনো অপরাধ করে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাচ্ছিল।

সে বছর আগস্টের ২৯ তারিখ সন্ধ্যায় দুই বোন ফ্লেহের (Flehe) একটি শহরতলির বার্ষিক মেলা থেকে বের হয়ে কাছাকাছি আবাসিক এলাকায় বাড়ি ফিরছিল। বড় বোন লুইস লেনজেনের (Louise Lenzen) বয়স ছিল ১৪ বছর এবং তার ছোট বোন জারট্রুডের (Gertrude) বয়স ছিল ৫ বছর। হঠাৎ একজন মানুষের কথা শুনে তারা থেমে পেছনে ঘুরে কারটেনকে দেখতে পায়। সে বেশ

আফসোস করে বলছিল, "ইস, আমি তো সিগারেট কিনতেই ভুলে গিয়েছি। এখন কী হবে?" লুইস ঘুরে তাকালে সে তাকে বলে, "দেখ লক্ষ্মীটি, তুমি কি দয়া করে এক দৌড়ে মেলার সামনের দোকানটি থেকে আমার জন্য এক প্যাকেট সিগারেট এনে দেবে? আমি এই ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে রাখব।" লুইস সুদর্শন ও সম্ভ্রান্ত পোশাক পরা কারটেনকে দেখে রাজি হয়ে যায় এবং তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে মেলায় যায়। সাথে সাথে কারটেন ছোট মেয়েটিকে রাস্তার পাশে অন্ধকার জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গলাটিপে হত্যা করে এবং ধারালো ছুরি দিয়ে তার গলাটি কেটে ফেলে। কয়েক মুহূর্ত পরই লুইস ফিরে আসলে তারও একই পরিণতি হয়। এর বারো ঘণ্টা পর জারট্রুড স্কুটে (Gertrudr Schutte) নামের এক পরিচারিকাকে সে নির্জন রাস্তার মাঝে থামিয়ে নিউসের (Neuss) মেলায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি তার প্রস্তাব উপেক্ষা করে চলে যেতে চাইলে লোকটি তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে মেয়েটি বলে ওঠে যে তার সাথে দৈহিক সম্পর্কের চেয়ে মৃত্যুও ভালো। তখন সে লোকটি বলে, "তাহলে মারাই যাও" এবং একটি ছুরি বের করে তাকে আঘাত করে। উন্মাদের মতো দ্রুত ছুরি দিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ছুরিটি ভেঙে গিয়ে মেয়েটির পিঠে ফলাটি গেঁথে যায়। মেয়েটির ভাগ্য ভালো, সে কোনো মতে প্রাণ নিয়ে পালানোর সময় চিৎকার করে কয়েকজন পথচারীকে সাবধান করে হাসপাতালের দিকে ছুটতে থাকে। কারটেন আবারো পালাল। এর দেড় ঘণ্টার মধ্যেই সে আবারও আক্রমণ করল। এবারে একটি ১৮ বছর বয়সী মেয়েকে ধর্ষণ করে আহত করল এবং ৩০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি ও ৩৭ বছর বয়সী এক মহিলাকে ক্ষতবিক্ষত করে উধাও হয়ে গেল। আহতদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নেওয়াটা ভ্যাম্পায়ার খুনির প্রতি মানুষের আতঙ্ক বহুগুণে বাড়িয়ে দিল। খবরের কাগজে প্রতিদিনই তার সম্পর্কে ও তার কর্মকাণ্ডের বর্ণনা ছাপা হতে থাকল। পুলিশ তখনো কোনো সূত্র খুঁজে পাচ্ছিল না। পরবর্তী হত্যা হয় সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে। সেপ্টেম্বরে ইডা রিউটার (Ida Reuter) এবং ১২ অক্টোবর এলিজাবেথ ডরিয়ার (Eligabeth Dorrier)-কে পিটিয়ে হত্যা করে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে উভয়কেই জঘন্য যৌন নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। ২৫ অক্টোবর আরও দুজন মহিলাকে হাতুড়ি দিয়ে হামলা করে আহত করে সে। এরপর ৭ নভেম্বর ৫ বছর বয়সী বালিকা জারট্রুড অ্যালবারমান (Gertrude Albermann) নিখোঁজ হয়। এর দু'দিন পর খবরের কাগজে হাতে আঁকা ম্যাপসহ একটি চিঠি প্রকাশিত হয়, যেখানে কেউ একজন লিখেছে জারট্রুডের মৃতদেহ একটি কারখানার দেওয়ালের পাশে পাওয়া যাবে। হত্যাকারীর বর্ণনানুযায়ী অনুসন্ধান করে ঠিক সে স্থানেই ছোট্ট জারট্রুডের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ছোট্ট দেহটিতে ৩৬টি গভীর ক্ষত ছিল এবং ধর্ষণের চিহ্ন ছিল স্পষ্ট। একরাশ

ভাঙ্গা ইটের টুকরো দিয়ে দেহটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। নিষ্পাপ খোলা চোখ দুটিতে ছিল আতঙ্ক ও যন্ত্রণার ছাপ, গলায় করাল হাতের কালসিটে দেখে বোঝা যায় তার শ্বাসরোধ করা হয়েছিল কতটা নিষ্ঠুরভাবে। নিষ্পাপ এই শিশুটিই এই পিশাচের শেষ হত্যাকাণ্ডের শিকার ছিল। তবে সারা শীতকাল ও বসন্তের শুরু পর্যন্ত চলছিল তার ত্রাসের রাজত্ব ও চোরাগোপ্তা হামলা। প্রতিদিনই খবরের কাগজে তাকে নিয়ে সে জাতীয় সংবাদ ছাপা হচ্ছিল। পুলিশ বারবার ব্যর্থ হওয়াতে সাধারণ জনগণের আতঙ্ক বেড়েই চলছিল। সন্ধ্যার পর তো বটেই, দিনের বেলায়ও লোকজন দল বেঁধে চলাফেরা শুরু করল। সবার মনের মধ্যে একই দুশ্চিন্তা– 'এই বুঝি ভ্যাম্পায়ার হামলা করল।'

১৯৩০ সালের ১৪ মে, ডাসেলডর্ফের রেলস্টেশনে একটি মেয়ে নামল। ২১ বছর বয়সী মারিয়া বাডলিক (Maria Budlick) কোলনে একটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মারিয়া চাকরিচ্যুত হবার পর অত্যন্ত হতাশ হয়ে ডাসেলডর্ফে নিজের শহরে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। পত্র-পত্রিকার খবর পড়ে সে ডাসেলডর্ফের পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত ছিল। কিন্তু চাকরি হারানোর হতাশা ও দুঃখ তার মন থেকে ভ্যাম্পায়ারের ত্রাস মুছে দিয়েছিল। যেন ভুলেই গিয়েছিল ভ্যাম্পায়ার ডাসেলডর্ফেই থাকে। ট্রেন থেকে নামার পর একজন সুদর্শন ভদ্রলোক তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। মারিয়ার বাড়ি অনেক দূরে জেনে সে তাকে আশপাশে কোনো ছাত্রী হোস্টেলে থাকার পরামর্শ দেয়। এরপর নিজেই তাকে এই রাতে পথ দেখিয়ে হোস্টেলে পৌঁছে দেবার কথা বললে মারিয়া রাজি হয়ে যায়। কিছুদূর যাবার পর সে যখন ভক্সগার্টেন পার্কের (Volksgarten Park) দিকে ঘোরে তখন মারিয়া ইতস্তত করছিল। লোকটি তাকে আশ্বস্ত করে যে ভয়ের কিছুই নেই। তবুও মারিয়া তার সাথে পার্কে যেতে আপত্তি করে। যখন তারা তর্ক করছিল অন্ধকার ফুঁড়ে একটি লোক বেরিয়ে এসে বলে, "সবকিছু কি ঠিক আছে? মনে হচ্ছে কিছু একটা ঠিক নেই।" হঠাৎ একজনের আগমনে রেলস্টেশনের লোকটি দ্রুত প্রস্থান করে। মারিয়া সেখানে একা দাঁড়িয়ে ছিল নতুন ব্যক্তির সাথে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে মারিয়া তার ত্রাণকর্তা ভাবছিল, সে আর কেউ নয়, পিটার কারটেন। কারটেন সহৃদয়ভাবে তাকে প্রস্তাব দেয় প্রথমে তার বাড়িতে যেতে এবং কিছু খেয়ে নিতে। সে তার স্ত্রীর কথা বলে মারিয়াকে আশ্বস্ত করে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। তাকে এক গ্লাস গরম দুধ ও একটি স্যান্ডউইচ খেতে দেয়। এরপর সে তাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিতে চাইলে মারিয়া রাজি হয়। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই ভাগ্য মারিয়ার সাথে দুবার পরিহাস করল। এবারও তাকে ভুল পথেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কারটেন একটি ট্রাম ভাড়া করল। মারিয়া তখনো গন্তব্য সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিল, তাই সে কোনো প্রশ্ন করেনি। কারটেন তাকে সোজা গ্রাফেনবার্গের জঙ্গলে নিয়ে যায়।

জায়গাটি শহরের একদম উত্তরে অবস্থিত। সেখানে পৌঁছে সে হতবাক মারিয়ার ওপর উচ্চৈঃস্বরে হেসে তাকে টেনে-হিঁচড়ে একটি বড় গাছের কাছে নিয়ে যায়। মারিয়াকে গাছের সাথে আটকে সে তার গলা টিপে ধরে ধর্ষণ করে। মারিয়া বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়াতে পারছিল না, কেননা কারটেন অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। যখন সে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিল কারটেন তাকে ছেড়ে দিয়ে তার কানে ফিসফিস করে বলে, "যদি আবারও কোনোদিন আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তুমি কি আমার বাড়ি চিনবে?" মারিয়া মাথা নেড়ে না বললে সে নিজেই তাকে জঙ্গলের বাইরে এনে রাস্তায় একা ফেলে চলে যায়।

মারিয়ার স্পষ্ট মনে ছিল কারটেনের বাড়ির ঠিকানা। তবে সে ভয়ে পুলিশের কাছে না গিয়ে কোলনে তার এক বান্ধবীর কাছে চিঠি লেখে। তবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ততার কারণে ঠিকানা ভুল লিখে ফেলে। ঠিকানায় অসঙ্গতি দেখে পোস্ট অফিসে চিঠিটি খুলে দেখা হয় এবং সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পায়। একজন চৌকস অফিসার ঘটনার গুরুত্ব বুঝে চিঠিটি নিয়ে পুলিশের কাছে যান। পরদিন সাদা পোশাকের গোয়েন্দারা মারিয়াকে নিয়ে কারটেনের বাড়ির সামনে যায়। তার স্পষ্ট মনে ছিল সড়কটির নাম মেটাম্যানারস্ট্রেস (Mettamannerstrasse) এবং ৭১ নম্বর বাড়ি। সে বাড়ির উপর তলার জানালায় কারটেনকেও দেখে, তবে সাথে থাকা গোয়েন্দাদের দেখানোর আগেই সে উধাও হয়ে যায়। কারটেনও জানালা দিয়ে মারিয়াকে দেখে ফেলে এবং বুঝতে পারে যে পুলিশ প্রায় জাল গুটিয়ে ফেলেছে, এবার সে রক্ষা নাও পেতে পারে। সে তার স্ত্রী যে রেস্টুরেন্টে চাকরি করত সেখানে গিয়ে স্ত্রীর সাথে দেখা করে এবং তাকে সবকিছু খুলে বলে। সে তার স্ত্রীকে বলে, পুলিশ তার পিছে আছে এবং তাকে সাহায্য করতে বলে যেন পুলিশ তাকে ধরতে না পারে। কারটেন কখনই তার কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত ছিল না, যখন স্ত্রীকে বলে তখনো না, এমনকি যখন কোর্টে বলে তখনো না। এ কারণেই হয়তো সে তখন নিশ্চিন্ত মনে দুপুরের খাবার খেয়ে যাচ্ছিল। এমনকি যে খাবার তার হতভম্ব স্ত্রী ছুঁয়েও দেখেনি সেটিও সে তৃপ্তিভরে খেয়ে কাজে চলে যায়। ২৪ মে সকালে কারটেনের স্ত্রী ফ্রাও পুলিশের কাছে গিয়ে তাদের সব খুলে বলে এবং জানায় যে বিকাল ৩টার সময় সে তার স্বামীকে স্থানীয় গির্জার সামনে দেখা করতে বলেছে। সশস্ত্র পুলিশেরা পুরো এলাকা ঘিরে ফেলল। কারটেন সময়মতোই এসেছিল, সে আসার সাথে সাথেই চারজন পুলিশ অফিসার তার দিকে বন্দুক তাক করে এগিয়ে আসে। সে খুব হালকাভাবে হেসে অফিসারদের বলে, "ভয় পাবার কোনো দরকার নেই।" তারা যখন তাকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় সে বিন্দুমাত্র বাধা দেয়নি।

কারটেনের বিচারকার্য শুরু হয় ১৯৩১ সালের ১৩ এপ্রিল। ডাসেলডর্ফ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ড্রিল হলে তার বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার মানুষ

সেখানে ভিড় জমিয়েছিল একপলক দেখতে, যে ব্যক্তি ৬৮টি অপরাধের দায় স্বীকার করেছে। তবে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, যেসব অপরাধের জন্য সে সাজা খেটেছে সেগুলোর কথা সে প্রথমে স্বীকার করেনি। অর্থাৎ ৬৮টি অপরাধের বাইরেও সে বহুবার অপরাধ করেছে এবং সাজাও খেটেছে। তার বিরুদ্ধে ৯টি হত্যাকাণ্ড, ৭টি হত্যার চেষ্টা, ধর্ষণ, ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ ছিল। তদন্তকারী অফিসারদের কোনো তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজনই হয়নি। কারটেন অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে এবং ঠান্ডা মাথায় প্রত্যেকটি অভিযোগ স্বীকার করেছে। তার নিখুঁত বর্ণনা শুনে সকলেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত সাবলীলভাবে সে বলে যাচ্ছিল যে, সে একজন যৌনপিশাচ, ধর্ষক, রক্তচোষা, ধর্ষকামী (Sadist), খুনি এবং আরসোনিস্ট (Arsonist, পরের সম্পদে আগুন লাগিয়ে উপভোগ করে যে ব্যক্তি)। সে একে একে অত্যন্ত সজ্জিতভাবে তার প্রতিটি অপরাধের বর্ণনা, তার জেলে থাকা অবস্থায় উদ্ভট কল্পনা, কীভাবে গলা টিপে ধরত, কীভাবে ছুরির আঘাতে হত্যা ও গলা কেটে ফেলত– পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করেছিল। সে একথা স্বীকার করেছিল যে অনেক মেয়ের গলা থেকে, কারো হাত থেকে এবং একজন পুরুষের মাথার ক্ষত থেকে রক্ত পান করেছিল। সে খুব উৎসাহের সাথে বলে যে, সে জ্যাক দ্য রিপারের (Jack the Ripper, আরও একজন গণখুনি যার পরিচয় আজও অনিশ্চিত) কাহিনি কতটা উপভোগ করে, কীভাবে সে চেম্বার অব হররস (Chamber of Horrors, একহাতি উন্মাদ খুনিকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র)–এর মোমের তৈরি জাদুঘরে গিয়েছে। সে এও বলে যে, সে নিজেকে কথা দিয়েছিল, "আমি একদিন এ স্থানে আসবই।"

কারটেনের কাঁধ পর্যন্ত লম্বা একটি খাঁচা তৈরি করা হয়েছিল, যা তার হাত-পায়ের সাথেও শিকল দিয়ে যুক্ত ছিল। সে যেন পালাতে না পারে তাই সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছিল। তার চারপাশে সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকত চারজন অস্ত্রধারী পুলিশ। তার পেছনে রাখা হয়েছিল তার হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সকল তথ্য-প্রমাণ। তার ছুরি ও কাঁচি, ম্যাচের কাঠি, যা দিয়ে সে ঘরবাড়ি পোড়াত, কোদাল এবং নিষ্পাপ মানুষের মাথার খুলি, যা সে নিছক যৌন উত্তেজনা লাভের জন্য তাদের দেহ থেকে আলাদা করেছিল। বিচারকেরা তার সাথে নরমভাবেই কথা বলছিলেন। প্রত্যেকটি কথা ও প্রশ্ন তারা সাবধানে করছিল। কঠোর হওয়ার কোনো প্রয়োজন অবশ্য ছিল না, কেননা কারটেন অত্যন্ত ভদ্র, উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন ও সৌজন্যবোধের পরিচয় দিচ্ছিল। তার এ ধরনের আচরণের কারণেই এতদিন পর্যন্ত তার স্ত্রী ও প্রতিবেশীরা ঘুণাক্ষরেও তার আসল রূপ আঁচ করতে পারেনি। এতটা ঠান্ডা মাথায় এমন নৃশংস কর্মকাণ্ডের বর্ণনা কেউ দিতে পারে তা উপস্থিত সকলের ধারণার বাইরে ছিল। কারটেনের স্বীকারোক্তির শেষ পর্যায়ে সবচেয়ে কঠোর বিচারকও বেশ বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন।

তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, সবকিছু স্বীকার করার পর কারটেন নিজের আত্মরক্ষার জন্য শৈশবে জেলখানার অত্যাচারকে দায়ী করে। তার এমন খুনি হওয়ার জন্য সেই অত্যাচারকে ও অন্যদের অপরাধকে দায়ী করে সে নিজেকে নির্দোষ বোঝানোর চেষ্টা করে। সে বলে, "আমার কর্মকাণ্ডগুলো দেখলাম যে অত্যন্ত সাংঘাতিক এবং ভয়াবহ। এমনকি আমি এসবের জন্য কোনো অজুহাতও দিতে পারব না। তবে একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা আজও আমার মনে রয়ে গেছে। যখন আমি চিন্তা করি যে দুজন চিকিৎসককে কর্মজীবী মায়েদের গর্ভপাত করানোর দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তারা যে তাদের সাহায্য না করেই গর্ভপাতের উপদেশ দিল, তা কি ঠিক? যখন আমি ভাবি তাদের প্রায় ৫০০টি হত্যাকাণ্ডের কথা, মনটা তিক্ত না হয়ে পারে না। আমার এই স্বীকারোক্তির কারণটি হলো, প্রত্যেকটি অপরাধীর জীবনেই এমন একটি সময় আসে যখন সে আর অগ্রসর হতে পারে না। আর এই মানসিক ভাঙ্গনটি আমার সাথেও ঘটেছে। তবে আমি মনে করি যে আমাকে একটি বিবৃতি অবশ্যই দিতে হবে, কেননা আমার শিকারদের কয়েকজন আমার কাজকে সহজ করে দিয়েছে। বর্তমান যুগে মেয়েদের পুরুষকে খুঁজে বেড়ানোর তাড়না এমন রূপ ধারণ করেছে যে...।" এই পর্যন্ত বলার পর বিচারকগণ আর সহ্য করতে পারলেন না। তারা টেবিলে আঘাত করে কারটেনকে চুপ করার আদেশ দেন।

কারটেনের অভিযোগ ও স্বীকারোক্তির আলোকে তার সাজা নির্ধারণ করতে জুরির প্রায় ৯০ মিনিট সময় লেগেছিল। তাকে নয়টি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্ধারিত তারিখ দেওয়া হয় খুব শীঘ্র। ১৯৩২ সালের জুলাইয়ের ১ তারিখ সে আনুষ্ঠানিকভাবে তার সর্বশেষ ভোজ হিসেবে বাছুরের মাংস, আলু ভাজা ও রেড ওয়াইন খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সে খাবারটি এতটাই উপভোগ করেছিল যে দ্বিতীয়বার সমান পরিমাণ খাবার নিয়েছিল। পরদিন ভোর ৬টায় তাকে কোলনের কোইনগেলপুটজ কারাগারের (Koingelputz Prison) গিলোটিনে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তার কোনো শেষ ইচ্ছা আছে কিনা জানতে চাইলে সে না করে। অ্যাটর্নি জেনারেলের নির্দেশে তার শিরশ্ছেদ করা হয়।

যদিও সে না বলেছিল তবে তার একটি শেষ ইচ্ছা ছিল। কারাগার থেকে বের হবার কিছুক্ষণ আগে সে কারাগারের মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলতে চায়। তাকে সে জিজ্ঞেস করে, "যখন গিলোটিনে আমার মাথা কেটে ফেলা হবে, আমি কি অন্তত এক মুহূর্তের জন্যেও ফিনকি দিয়ে রক্তের সশব্দে ছুটে যাওয়াটা শুনতে পাবো?" ডাক্তারের স্তব্ধ দৃষ্টির দিকে চোখ রেখে সে অমায়িকভাবে হেসে বলেছিল, "এটিই সকল প্রমোদ শেষ করার আসল তৃপ্তি।"

দ্য কিলার হু কেপ্ট কোয়ায়েট

খুব কম হত্যা মামলার বিচারকার্য নিয়ে ইতিহাসে এতটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল যতটা হেনরি ডিসায়ার ল্যান্ড্রু এর (Henri Desire Landru) ক্ষেত্রে হয়েছিল। ১৯২১ সালের নভেম্বরে প্যারিসে তার মামলার শুনানি হয়। তাকে ১১টি হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু প্রসিকিউশন একটিও মৃতদেহ উদ্ধার করতে পারেনি। এমনকি কীভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছিল বা কীভাবে তাদের মৃতদেহ গুম করা হয়েছিল সে সম্পর্কিত কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাকে সারকামস্টেনশিয়াল এভিডেন্সের ভিত্তিতে বিচার করা হয়। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের সুযোগ দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে গিলোটিনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে নিজেকে নির্দোষ দাবি করছিল এবং আজও এমন অনেকেই আছে যারা তাকে বিশ্বাস করে। তার ঠান্ডা মাথায় কৌতুকোদ্দীপক জবাবে কোর্টের রায় হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সৈন্যদল ভেঙে যাওয়ায় সৈন্যদের মুক্তিতে দেশবাসী বেশ সুখী ছিল এবং সবদিকেই আমোদ প্রমোদের সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। যাবতীয় বিশ্বশান্তিমূলক আলোচনা ও সমালোচনা থেকে জনগণের মনোযোগ অন্য দিকে ঘুরে যাওয়ায় ফ্রান্স সরকার বেশ খুশিই হয়েছিল। যে জাতি প্রেমিকের জাতি, যাদের কাছে ভালোবাসাই সকল সুখের মূল তারা এই ছোটখাটো আজব দেখতে কালো চোখের টাক মাথা লোকটিকে ও তার অপরাধসমূহকে কোনোভাবেই বরদাস্ত করতে পারল না। ধারণা করা হয়, যে পাঁচ বছরে সে ২৮৩ জন নারীর সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছিল। কোর্টে সে তার প্রেমের ব্যাপার কোনোরকম তথ্য দিতে অস্বীকার জানায়। তবে যখন সে কোর্টে প্রবেশ করে উপস্থিত সকল নারীকে উড়ন্ত চুম্বন দেয় ও যৌননির্দেশক বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে। যখন একজন মহিলা লোকে ভর্তি কোর্টরুমে পৌঁছে বসার জায়গা পাচ্ছিল না, সে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে জায়গা দেয়। তার এসব রোমান্টিক আচরণ জনগণের মধ্যে কৌতুক ও কৌতূহলও সৃষ্টি করে।

তবে তার মামলার ঘটনাগুলো মোটেও রোমান্টিক ছিল না। হেনরি একজন দক্ষ চোর, প্রতারক ও জুয়াড়ি হিসেবে পুলিশের কাছে পরিচিত ছিল ১৯০০ সাল

থেকেই, যখন তাকে প্রথম গ্রেফতার করা হয়। সে অপহরণ ও ধোঁকাবাজি করে কত মেয়ের জীবন নষ্ট করেছে তার ইয়ত্তা নেই। প্যারিসের বিভিন্ন খবরের কাগজে নিঃসঙ্গ প্রেমিক-প্রেমিকা কলামে সঙ্গীর খোঁজে সে বিজ্ঞাপন দিত। এরপর সেখানে বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং বিজ্ঞাপনে সাড়া দিতে আসা মেয়েদের ফাঁসাত এবং অপহরণ করত। এছাড়া নিঃসঙ্গ বিধবাদের বিপদের বন্ধু হয়ে তাদেরকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে প্রতারণা করত। তবে পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পন্থাটি বেশিদিন কাজে লাগাতে পারেনি সে। যেসব মেয়েরা তার অর্থলোভী চরিত্র ধরতে পেরেছিল তাদের অনেকেই পুলিশের কাছে অভিযোগ করলে তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে রাখা হয় ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। তার বাবা ডোর্ডনে (Dordogne) একজন সম্মানিত ব্যবসায়ী ছিল। ১৯১২ সালে সে প্যারিসে ছেলের সাথে দেখা করতে এসে যখন তাকে কারাগারে দেখে এবং তার প্রতারণার ধরন জানতে পারে সে আত্মহত্যা করে।

১৯১৪ সালে জুলাইয়ে আবারও ফ্রেঞ্চ বিচারকদের তার মামলা নিয়ে ব্যস্ত ও অতিষ্ঠ হতে হয়। এবারে অভিযোগ ছিল মোটর সাইকেল ব্যবসায় প্রতারণার। তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যৎ অপরাধের দায়ে সহজাত অপরাধী (Habitual Criminal) হিসেবে নিউ ক্যালেডোনিয়ার (New Caledonia) দণ্ডদায়ক কারাগারে হস্তান্তরিত করার সুপারিশ করা হয়। হেনরি এবার বেশ বিপদে পড়ে যায়। সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং অপরাধস্থল দ্রুত পাল্টে ফেলা শুরু করল। সে বিবাহিত ছিল এবং তার চারটি সন্তান ও স্ত্রীসহ প্যারিসেই বসবাস করত। কয়েক মাস জেল খেটে বের হবার পর সে অত্যন্ত সাবধান হয়ে যায়, কেননা সে খুব ভালো করে জানত যে সামান্য একটি ভুলের মাশুল দিতে হবে নিউ ক্যালেডোনিয়াতে, যেখান থেকে পালানোর উপায় তার জানা নেই। তবে বেঁচে থাকার জন্য টাকারও প্রয়োজন তাই খুব শীঘ্রই আর্থিক টানাপোড়েনে তাকে নতুন পন্থার কথা ভাবতে হলো। সে অর্থের সন্ধানে অবৈধ সম্পর্কে ইচ্ছুক ধনী নারীদের আকর্ষণ করা শুরু করল এবং তার প্রেমের জালে ফাঁসাতে লাগল। তাদের কেউই যেন পরবর্তীতে পুলিশের কাছে যেতে না পারে সে ব্যাপারটি সে নিশ্চিত করেছিল তাদের হত্যা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর যদি পুলিশের তদন্তকার্য শিথিল না থাকত হেনরি কখনই এতদিন টিকে থাকতে পারত না। তাকে শনাক্ত করার অন্যতম উপায় ছিল তার মস্ত বড় বেমানান লাল দাড়ি, গোঁফ যা তাকে 'ব্লুবেয়ার্ড' (Blubeard) ডাকনাম লাভ করায়। এছাড়া সে তার অপরাধের স্থানে বার বার ফিরে যেত নিছক কৌতূহলের বশে। সবচেয়ে বেশি যেত প্যারিসে সেসব গাড়ির গ্যারেজে যেখানে সে তার চোরাই মাল গোপনে মজুদ ও বিক্রি করত। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারির এমনই একটি দিনে সেখানে তার দেখা হয় মাদাম জিয়ানে কুচেটের

(Madame Jeanne Cuchet) সাথে। জিয়ানে ছিল ৩৯ বছর বয়সী একজন বিধবা, সে প্যারিসের একটি নামকরা দোকানে চাকরি করত। তার ১৮ বছর বয়সী ছেলে আন্দ্রে (Andre) হেনরির কাছে চাকরির আশায় এসেছিল। জিয়ানে খুব শীঘ্রই এই মিষ্টভাষী ব্যক্তির প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে। হেনরি তার পরিচয় দিয়েছিল মি. ডাইয়ার্ড (Mr. Diard) হিসেবে এবং বলেছিল যে, পেশায় সে একজন ইঞ্জিনিয়ার। সে সব সময় সুন্দর পোশাক পরত এবং তার অভিজাত বেগুনি রিবনটি সকলেরই নজর কাড়ত। জিয়ানে দিন দিন তার প্রেমে মত্ত হতে থাকলেও তার বোন মি. ডাইয়ার্ডকে সন্দেহ করে বসে। শেষ পর্যন্ত এই সন্দেহ এতটাই বেড়ে যায় যে, সে হেনরির শ্যান্টিলির (Chantilly) বাড়িতে গিয়ে তার সমস্ত কাগজপত্র ঘেঁটে বিভিন্ন নামের পুরুষকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠি খুঁজে বের করে। কিন্তু জিয়ানে তার প্রেমে এতটাই অন্ধ হয়ে পড়ছিল যে, সে এসবের তোয়াক্কাই করেনি। হেনরি যখন তাকে একত্রে থাকার আমন্ত্রণ জানায় এবং প্যারিসের সীমান্তে কোনো বাড়ি ভাড়া নেওয়ার পরামর্শ দেয় সে সানন্দে রাজি হয়ে যায়। তারা ১৯১৪ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে ভার্নোইলেটে (Vernouillet) দ্যা লজ (The lodge) নামের একটি বেশ বড় বাড়িতে একত্রে বসবাস শুরু করে। জিয়ানে বেশ খুশি মনে প্রথম ছয় মাসের অগ্রিম ভাড়াসহ সব খরচ দিয়ে দেয়। ভদ্রমহিলা ও তার ছেলেকে ১৯১৫ সালের ৪ জানুয়ারিতে শেষবারের মতো বাড়ির বাগানে হাঁটতে দেখা যায়। জিয়ানের তার পরিবারের সাথে বেশ কিছুদিন কোনো যোগাযোগ না করায় তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা চিন্তাও করেনি যে ততদিনে জিয়ানে তাদের থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছে। পুলিশের কাছে নিখোঁজ অভিযোগ করা হয়েছিল, তবে সে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ ছিল। এদিকে জিয়ানের মৃত্যুতে তার গহনা, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি থেকে হেনরির প্রায় ১৫ হাজার ফ্রাঁ (Francs, ফ্রান্সের মুদ্রা) আয় হয়। এই প্রচেষ্টায় সফল হয়ে সে আরও লোভী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়ে পরবর্তী শিকার খুঁজতে শুরু করল। এরপর তার পরিচয় হয় আর্জেন্টিনার বুয়েনো এয়ারস (Buenos Airs, Argentina) থেকে আগত ৪৭ বছর বয়সী এক বিধবা মাদাম থেরিস ল্যাবোর্ডেলাইনের (Madame Therese Laborde-Line) সাথে। ফ্রান্সে তার কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল না। এবারে হেনরি নিজেকে মি. কুচেট পরিচয় দিয়ে তাকে বিমুগ্ধ করে প্রেমের ফাঁদে ফেলে। খুব শীঘ্রই সে মাদাম থেরিসের সব সম্পত্তি দখল করে ফেলে। ১৯১৫ সালের জুনে তারা ভার্নোইলেটের সেই বাড়িতে বসবাস শুরু করে। এর কিছুদিন পর সেও উধাও হয়ে যায়।

পরবর্তী শিকার হেনরির জন্য আরও সহজ হয়েছিল। মে মাসের ১১ তারিখ সে পত্রিকায় নিঃসঙ্গ হৃদয় কলামে সঙ্গীর জন্য একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। তার বর্ণনা ছিল সেখানে এরকম, "৪৩ বছর বয়সী বিপত্নীক, দু'টি সন্তান আছে।

সচ্ছল আয় সম্পন্ন স্নেহপরায়ণ ব্যক্তি যিনি আন্তরিকভাবে সংসার করতে ইচ্ছুক। তিনি একজন অমায়িক বিধবার অপেক্ষায় আছেন, যিনি পরিণয়ে আগ্রহী।" তিনজন বিধবা মহিলা এই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছিল, যাদের কাউকেই আর কখনো দেখা যায়নি।

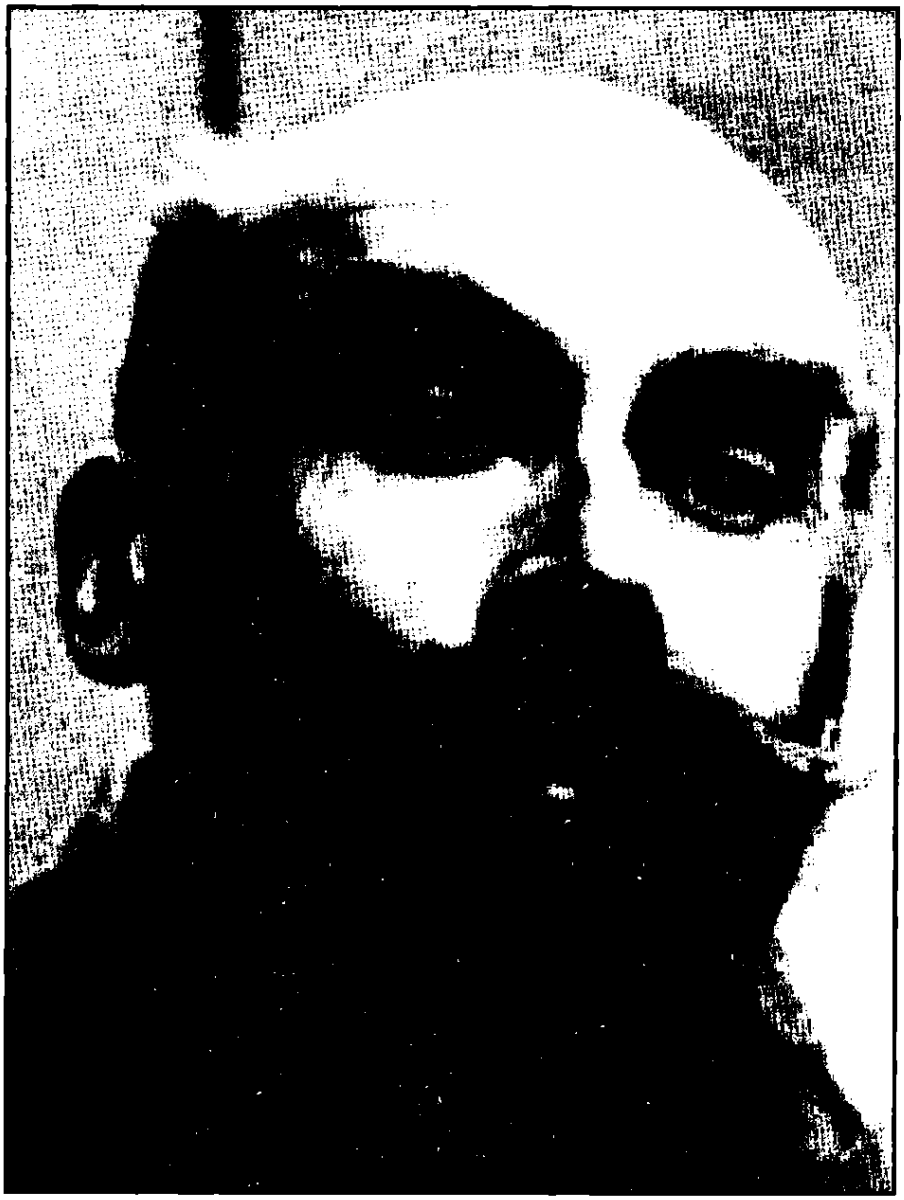

হুনি হেনরি ভিসায়ার ল্যান্ড্রু

মাদাম ডেসাইরি গুইলিন (Madame Desiree Guillin) ছিল ৫১ বছর বয়সী প্রাক্তন শিক্ষিকা। তার প্রায় ২২ হাজার ফ্রাঁ নগদ ও অন্যান্য সম্পত্তি ছিল। তার কাছে হেনরির পরিচয় ছিল মি. পেটিট (Mr. Petit) হিসেবে। মাদাম ডেসাইরি এই অমায়িক ব্যবসায়ী মি. পেটিটের স্ত্রী হিসেবে তার সাথে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ৪ আগস্ট তার সাথে 'দ্য লজে' যায়। অন্যদের

মতো তারও একই পরিণতি হয়, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। হেনরি তার আসবাবপত্র বিক্রি করে দেয় ও তার স্বাক্ষর জালিয়াতি করে তার সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নেয়। তার ব্যাংকের সব টাকা যখন সে প্রতারণা করে দখল করছিল ব্যাংকের উচিত ছিল ব্যাপারটি ধরতে পারা, কিন্তু আবারো যুদ্ধকে ওজর হিসেবে দেখিয়ে তা অব্যাহতি পেল। হেনরি এরপর 'দ্য লজ' ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। অবশ্যই তার মাথায় নতুন অভিসন্ধি এসেছিল। এবার সে চলে গেল সেইনের (Seine) দিকে, প্যারিসের র‍্যাম্বোইলেট (Ramboaillet) বনের বেশ নিকটে। সেখানে গাম্বাইসে (Gambais) ভিলা আর্মিটেজ (Villa Ermitag) নামের এক স্বল্প আসবাবপত্রের বাড়ি ভাড়া করল। বাড়ির কাছেই ছিল বনের হ্রদ ও পুকুরগুলো। ছিমছাম বাড়িটিতে একটি বড় স্টোভ বিশিষ্ট চুল্লি লাগানো ছাড়া আর কোনো মেরামত কাজ করাতে হয়নি হেনরির। সেখানে তার প্রথম অতিথি ছিল ৫৫ বছর বয়সী বিধবা মাদাম হেয়ন (Madame Heon)। সেও পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই হেনরির সাথে পরিচিত হয়েছিল। তাকে ডিসেম্বরের দিকে শেষ বারের মতো দেখা যায়। এরপর হেনরি তার পরবর্তী শিকার মাদাম অ্যানা কলাম্বকে (Madame Anna Collomb) আমন্ত্রণ জানায়। সে ছিল ৪৪ বছর বয়সী বিধবা। হেনরি তার কাছে মি. পেটিট নামে একজন যুদ্ধ ফেরত সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিল। সে বলেছিল যে, মন্টমার্ট্রেতে (Montmartre) তার কয়েকটি কারখানা আছে। তারা রু চ্যাটেডানে (Rue Chateaudun) একটি ফ্ল্যাটে একত্রে বসবাস শুরু করে। কিছুদিন পর তারা গাম্বাইসে চলে আসলে দেখা যায় যে, সেখানে হেনরি মি. ফ্রেমিট (Mr. Fremyt) নামে পরিচিত। অ্যানার মা এব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলে হেনরি বলে যে, যুদ্ধের খাতিরে তাকে ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হয়েছে। তবে এই ব্যাখ্যা তার সন্দেহ দূর না করে বরং তার জালিয়াতিকে প্রকাশ করে। কিন্তু অ্যানা তার প্রেমে এতটাই অন্ধ ছিল যে, সে হেনরিকেই বিশ্বাস করে। বড়দিনের আগের রাতে সে তার বোন মাদাম পিলাটকে (Madame Pelat) তাদের গাম্বাইসের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়। তাকে হেনরি বলে যে, সে অ্যানাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক এবং অতি শীঘ্রই সে এ ব্যাপারে তার সাথে কথা বলবে। ২৭ ডিসেম্বরে অ্যানা নিখোঁজ হয় এবং তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরবর্তী শিকারের সময় হেনরি প্রায় ৮০০০ ফ্রাঁর মালিক ছিল। ১৯ বছর বয়সী সুন্দরী আন্দ্রি বাবেলের (Andree Babelay) সাথে তার দেখা হয় প্যারিসে, মেট্রোতে যাতায়াতের সময়। আন্দ্রি কপর্দক শূন্য হওয়া সত্ত্বেও হেনরি তার সাথে চার মাস বসবাস করে এবং তার খরচও চালায়। এরপর তাকে ১২ এপ্রিল শেষবারের মতো গাম্বাইসে দেখা যায়। গাম্বাইসে সেই অভিশপ্ত বাড়িতে হেনরির পরবর্তী শিকার ছিল ৪৪ বছর বয়সী বিধবা মাদাম সেলেস্টাইন বুসিন (Madame Celestine Buisson)। সে

১৭ আগস্ট নিখোঁজ ও নিরুদ্দেশ হয়। গাম্বাইসে আরও তিনজন নারী একমুখী যাত্রা করেছিল। ৩৮ বছর বয়সী মাদাম লুইস জাউম (Madame Louise Jaume) একজন নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক ছিল, যার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে স্থানীয় গির্জা থেকে ফেরার কয়েক ঘণ্টা পরই সে নিখোঁজ হয়। এরপর ১৯১৮ সালের এপ্রিলে ৩৩ বছর বয়সী মাদাম অ্যান-ম্যারি প্যাসকেল (Madame Anne-Marie Pascel) নিখোঁজ হয়। হেনরি তার সম্পত্তি বিক্রি করে প্রায় ৪০০০ ফ্রাঁ পায়। ১৯১৯ সালের ১৩ জানুয়ারি নিখোঁজ হয় ৩৭ বছর বয়সী মাদাম ম্যারি-থেরিস মার্কাডিয়ার (Madame Marie-Therese Marchadier)। হেনরি তার প্যারিসের বাসার সব জিনিসপত্র বিক্রি করে ফেলেছিল।

ধীরে ধীরে হেনরির বোনা জালের রহস্য উদ্‌ঘাটন হতে থাকে। অ্যানা কলাম্বের বোন মাদাম পিলাট যখন ভিলা আর্মিটেজ থেকে চিঠির জবাব পাচ্ছিল না, সে কঠিন সমস্যায় পড়ে যায়। সে গাম্বাইসের মেয়রের কাছে একটি চিঠি দেয় মি. কুচেট ফ্রেমিট (Mr. Cuchet Fremyt) সম্পর্কে খবরাখবর নেওয়ার জন্য। এর কিছুদিন পরই মাদাম বুইসনের বোন মাদমোয়াজেল লাকোস্তের (Mademoiselle Lacoste) কাছ থেকে একই ধরনের চিঠি পায়। বাড়ির ঠিকানা হুবহু হলেও ব্যক্তির নাম এখানে ছিল মি. ডিউপোন্ট (Mr. Dupont)। মেয়র এই দুইজনকে চিঠিতে পরামর্শ দেয় যেন তারা নিজেরা পরস্পর যোগাযোগ করে। যখন তারা দেখা করল এটা বের হতে বেশি সময় লাগেনি যে, কুচেট ফ্রেমিট ও ডিউপোন্ট একই ব্যক্তি। তারা দু'জনে পুলিশের কাছে অভিযোগ করল। পুলিশ কর্মকর্তার কুচেট নামটি শুনে খটকা লাগলে সে পুরান ফাইল ঘেঁটে বের করে যে মাদাম কুচেট ও তার ছেলে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ করতে এসেছিল ডাইয়ার্ড নামক এক ব্যক্তি। ঘটনাটি আকস্মিকতা হিসেবে উড়িয়ে দেওয়ার মতো ছিল না, কেননা মহিলা দু'জনের বর্ণনার সাথে এই ব্যক্তির বর্ণনাও হুবহু মিলে যায়, বেমানান লাল দাড়ি, গোঁফ এবং টাকমাথা। শুধু তাই নয়, এই বর্ণনার সাথে প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত একজন ইঞ্জিনিয়ার গুইলেটেরও মিল পাওয়া যায়। ১৯১৯ সালের ১০ এপ্রিল এই ব্যক্তির জন্য একটি ওয়ারেন্ট প্রকাশ করা হয়।

তবে পরদিনই তাদের খোঁজ শেষ হয়। মাদমোয়াজেল লাকোস্তে রিউ ডি রিভোলিতে (Rue De Rivoli) হাঁটছিল তখন হঠাৎ সেই ব্যক্তিকে দেখতে পায়, যাকে সে ডিউপোন্ট নামে চিনত। লোকটি একজন সুন্দরী ও সুসজ্জিত মহিলার হাতে হাত রেখে হেঁটে যাচ্ছিল। সে তাদের পিছু পিছু একটি খাবার দোকানে ঢুকে এবং শুনতে পায় যে, তারা চাইনিজ খাবারের ফরমাশ করেছে। চোখের পলকেই তারা দু'জন দোকানের ভিড়ে হারিয়ে গেলেও লাকোস্তে সোজা পুলিশের কাছে যায়। পুলিশ সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, ওই নির্দিষ্ট খাবারের

ফরমাশটি আছে লুসিয়েন গুইলেট (Lucien Guillet) নামের এক ব্যক্তির নামে। পরদিন সকালে তারা সেখান থেকে প্রাপ্ত ঠিকানায় হানা দেয়।

রিউ ডি রোশোকুয়ার্টে (Reu de Rochechouart) গিয়ে হেনরিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে নিজেকে লুসিয়েন গুইলেট হিসেবে দাবি করে। বলে তার জন্ম রক্রোইতে (Rocroi) ১৮৭৪ সালে হয়েছে। কিন্তু যখন তার ঘর বাড়ির তল্লাশি নেওয়া হচ্ছিল সে একটি ছোট কালো বইয়ের মতো কিছু একটা জানালা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। সেটি তার ডায়েরি, যেখানে তার প্রতিটি প্রণয়ঘটিত ব্যাপার বর্ণিত ছিল। এই বইটিই তাকে গিলোটিনে পাঠায়। এখানে কার কাছ থেকে কত টাকা, কতগুলো আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সম্পত্তি পেয়েছে এবং তা কীভাবে কত দামে বিক্রি হয়েছে পুঙ্খানুপঙ্খরূপে লেখা ছিল। এমনকি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার নিজের কত খরচ হয়েছে তাও লেখা ছিল, বিশেষ করে যাতায়াতের টিকেটগুলো, প্রত্যেকবারই তার জন্য একটি রিটার্ন টিকেট ও মহিলাদের জন্য একমুখী যাত্রার টিকেট কাটা হয়েছিল। ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠায় একে একে তার সব সঙ্গীর নাম লেখা ছিল। যদিও পুলিশের কাছে মাত্র তিনটি নাম ছিল, কিন্তু তথ্য-প্রমাণের আলোকে উদঘাটিত রহস্যই তাকে হত্যার দায়ে গ্রেফতার করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তদন্তের মাধ্যমে বের হয় প্রত্যেকেরই নিখোঁজ হওয়ার তথ্য। পুলিশ পুরো বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো মৃতদেহ পায়নি। গ্রেফতারের পর তারা হেনরির সকল সম্পত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কয়েকজন মহিলার আইডি কার্ড, চিঠি, কাপড় ইত্যাদি খুঁজে পায়। আরও পাওয়া যায় ওয়ার্প কর্ড(শক্ত সুতা) যা দিয়ে অনেক অপরাধী শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। এপ্রিলের ২৯ তারিখ তারা আবারও গাম্বাইস বাড়িতে তল্লাশি চালায়। স্টোভের নিচের সব ছাই যখন বের করা হয় পুলিশেরও রক্ত হিম হয়ে যায়। সেখানে পাওয়া গিয়েছিল প্রায় ২৯৫টি হাড়ের টুকরা এবং বিভিন্ন রঙের বোতাম ও মেয়েদের কাপড়ের অন্যান্য অংশ।

ফ্রেঞ্চ জুডিশিয়াল সিস্টেম একটি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা করে। মামলার শুনানির একটি ভিত্তিপ্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হলো ম্যাজিস্ট্রেট বোনিনকে (Bonin)। সাক্ষী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে সে প্রায় আড়াই বছর ধরে হেনরিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সে বার বার তার কালো ডায়েরিটা পড়ত এবং সে অনুযায়ী তাকে প্রশ্ন করত। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা প্রত্যেকটি হাড়ের শনাক্তকরণ করে ফেলেছে, এমন হুমকিও মাঝে মাঝে দিত। কিন্তু প্রতিবারই হেনরি বলত, 'আমার কিছুই বলার নেই।'

নিখোঁজ মহিলাদের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তার ভাষ্য ছিল, 'আমি একজন প্রণয়াভিলাষী মানুষ। আমি তো আপনাকে নারী বিষয়ক কোনো প্রশ্ন করার অধিকার দিতে পারি না। তারা যদি নিখোঁজ হয়ে থাকে তবে তাতে আমার

কিছুই করার নেই। আপনারা তথ্য-প্রমাণ বের করুন, তদন্ত করুন, তাদের খুঁজে বের করুন, তারপর আমি আপনার সাথে কথা বলব।'

একবার বোনিন বলেছিল, 'তুমি একজন খুনি।' উত্তরে সে বলে, 'আপনি তো তাই বলেছেন, কিন্তু আগে প্রমাণ করুন। দেখুন, তদন্ত করুন, কল্পনা করুন, যাই করুন না কেন কিন্তু প্রমাণ করুন, যদি আপনি পারেন।' যখন তাকে মাদাম কুচেট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় সে বলে, 'তার লুকানোর জায়গা তার ও আমার মধ্যে একটি অপ্রকাশ্য কথা। আমি একজন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি এবং আমি আমার কথা রাখি। যদিও আমি বুঝি আপনারা যে অভিযোগ এনেছেন তার জন্য এটি দরকার তারপরও আমি তা ফাঁস করব না।' যখন বোনিন বলে যে, মাদাম কুচেট তার বান্ধবীদের সাথেও যোগাযোগ করে না। তখন সে বলে, 'তিনি হয়তো জগতের ভণ্ডামি দেখে ততটাই বিরক্ত, যতটা আমি নিজে।'

হেনরির সহনশীলতা প্রশংসা করার মতো ছিল, বিশেষ করে যখন গ্যাস্ট্রিকের যন্ত্রণা তাকে দিন দিন দুর্বল করে দিচ্ছিল। প্রতিবেশীরা বলেছে যে, গ্যাম্বাইসের বাড়ির চিমনি দিয়ে ঘন কালো দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া বের হতো মাঝে মাধ্যে। একজন লোক সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, তাকে হ্রদের পানিতে একবার বড় একটি প্যাকেট ফেলতে দেখা গিয়েছিল। স্থানটি ছিল ভিলা আর্মিটেজের পেছনের উঠান। সেখানে মাদাম মারকাডাইয়ার ও দু'টি গ্রিফন জাতের কুকুরের হাড় ও দেহাবশেষ মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করার মতো কিছু পাওয়া যায়নি। তবে ফ্রান্সের নিয়মানুযায়ী একজন মানুষ নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সে দোষী। এ কারণেই হেনরিকে কারাগারে রেখে দীর্ঘদিন জিজ্ঞাবাবাদ করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বরে বোনিন তার জিজ্ঞাসাবাদের ফলাফল পাঠায় ডিপার্টমেন্ট অব ক্রিমিনাল প্রসেকিউশনে (Department of Criminal Prosecution), প্রায় ৭০০০ ডকুমেন্ট। তার বিচারকার্য শুরু হয় ৭ নভেম্বর ভারসালিস পালাইস ডি জাস্টিসে (Versailles Palais de Justice)। তখন হেনরির বয়স ছিল ৫২ বছর। কিন্তু তার অসুস্থতা ও কারাজীবনের পান্ডুরতার কারণে তাকে আরও বৃদ্ধ দেখাত। তার অভিযোগপত্রটি তৈরি করতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগেছিল। তাতে ছিল প্রতারণা করে নীতি ভ্রষ্ট করা, জালিয়াতি, চুরি ও বহুবিধ হত্যার বিবরণ। যখন তার অভিযোগপত্রের নারী শোষণের অংশটি জোরে পড়া হচ্ছিল তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি বরং হেসেছিল। মামলার শুনানির দ্বিতীয় দিন সে বলে, 'পুলিশ সদস্যরা প্রায় ক্ষেত্রেই অকেজো।' যখন তাকে এ মন্তব্যের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়, 'পুলিশকে দিকনির্দেশনা দেওয়া আমার দায়িত্ব নয়, তারা কি আমাকে গত তিন বছর ধরে সেসব মানুষের নিখোঁজ হওয়ার জন্য দায়ী করে যাচ্ছে না, যারা এক মুহূর্তের জন্যেও কখনো আমাকে ভর্ৎসনা করেনি? তার কথা শুনে

বিচারক হেসে বলেন, 'আপনিই তো সেসব নারীদের জন্য অভিযোগ করাটা অসম্ভব করে দিয়েছেন।' একপর্যায়ে সাক্ষীদের দেখে হেনরির মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। যখন জিয়ানে কুচেটের বোন মাদাম ফ্রিডম্যান (Madame Friedmann) সাক্ষ্য দিতে আসে। সে চিৎকার করে বলছিল, 'আমার বোন তোমাকে এতই ভালোবেসেছিল যে আজ সে বেঁচে থাকলে তোমার মৃত্যুদণ্ড হতে দিত না।' এরপর সে কাঁদতে কাঁদতে তার স্বপ্নের কথা বলে। যেখানে সে দেখেছে যে, হেনরি তার বোনের গলা কেটে ফেলেছে। তবে স্বপ্ন তো হত্যার সাক্ষী হতে পারে না, তাই এই ধাপ তখনকার মতো শেষ করা হয়।

যদিও তখনো কেউ এটি প্রমাণ করেনি যে হেনরি কোন দেহ পুড়িয়েছে। তবে তার বাড়ি থেকে পাওয়া যাওয়া ছাই স্তূপের প্রতিটি দেহাবশেষ ফরেনসিক পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। সেসবই মানুষের এবং নারীদেহ থেকে এসেছিল বলে প্রমাণিত হয়। তারা আরও জানায়, একটি পা সম্পূর্ণ পুড়ে যেতে ৫০ মিনিট, মস্তিষ্কসহ অর্ধেক খুলির ক্ষেত্রে ৩৫ মিনিট ও সম্পূর্ণ খুলির ক্ষেত্রে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট সময় লাগে। তার বিরুদ্ধে মৃতদেহ টুকরা করে পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ আনা হয়।

হেনরির পক্ষের বিশিষ্ট আইনজীবী মরো-জিয়াফেরি (Moro-Giafferi) এক তুখোড় খেলা খেলল। হেনরিকে গ্রেফতারের মুহূর্তে তার সাথে থাকা মেয়েটিকে কোর্টে হাজির করা হলো। তার বর্ণনানুযায়ী হেনরি একজন বিশ্বস্ত প্রেমিক, ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ও আবেগি পুরুষ, যে তাকে অনেক খুশি রাখে। সে বলে, যে স্টোভে মানুষের খুলি পাওয়া গিয়েছিল সেখানে সে রান্না করেছে এবং চিমনিও পরিষ্কার করেছে। তবে কোনো হাড় বা খুলি দেখেনি। এরপর মরো-জিয়াফেরি আবেগপূর্ণ কথা বলা শুরু করে। সে বলে যে, নিখোঁজ মেয়েদের কাউকেই মৃত প্রমাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের খবর না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মানুষটি দোষী থাকবে, যা সম্পূর্ণ মানবতাবিরোধী। সে তার ধারণা প্রস্তাবিত করল যে, হেনরি একজন শ্বেতাঙ্গ নারী পাচারকারী, যে ব্রাজিলে তাদের পাচার করে দিয়েছে। তার ডায়েরিতে ব্রাজিল শব্দটি লেখা ছিল এবং তার কারণ হিসেবে এর চেয়ে গ্রহণযোগ্য আর কিছু নেই দাবি করে। তবে জুরি এটি পুরোপুরি মেনে নিতে পারল না যে, ব্রাজিলের লোকেরা এতটা মধ্যবয়স্ক নারী ক্রয় করবে। শেষ পর্যন্ত জুরি ক্ষমার আবেদন করার অনুমতি উঠিয়ে নেয় ও হেনরিকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

১৯২২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি যখন হেনরিকে গিলোটিনে নিয়ে যাওয়া হয় মরো-জিয়াফেরি সেখানে ছিল। হেনরি গণমাধ্যমে কোনো বক্তব্য বা স্বীকারোক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। এমনকি সে রাম ও সিগারেটকেও পাশ কাটিয়ে যায়। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে তার কিছু বলার আছে কিনা সে বলে, 'স্যার এই

সময়ে এ ধরনের প্রশ্ন করাটা এক ধরনের অপমান। না আমার কিছুই বলার নেই।' এরপর মরো-জিয়াফেরির সাথে হাত মিলিয়ে বলে, 'বন্ধু আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার কাজটি অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং সাংঘাতিক ছিল। এটি ইতিহাসে প্রথম ঘটনা নয় সেখানে নির্দোষ ব্যক্তি সাজা পাচ্ছে।'

সে তার দাড়ি গোঁফ কাটার ব্যাপারে অসম্মতি জানায় এবং কোনো পুরোহিতের উপস্থিতিও নিষেধ করে। আইনজীবীর পিছে পিছে সে খোলা মাঠে হেঁটে হেঁটে যায়। শীতের বাতাসে কিছুটা কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'আমি সাহসী থাকব।'

তার মৃত্যুতে আর কোনো প্রশ্নেরই উত্তর জানা যায়নি। সে কি আসলেই সেসব মহিলাদের হত্যা করেছিল? তাই যদি করে থাকে তাহলে কীভাবে? কীভাবে তাদেরকে এতেঠ সূক্ষ্মভাবে গুম করেছিল সে? টাকার জন্যই যদি সব খুন করে থাকে তবে কপর্দকহীন প্যাসকেল ও আন্দ্রিকেই কেন খুন করল? এর কারণ কী? তারা কি তার রহস্য জেনে গিয়েছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর ১৯৬৮ সালের আগে জানা যায়নি। ১৯৬৮ সালে একটি খবরের কাগজে হেনরির স্বীকারোক্তি ছাপে তারা। তারা দাবি করে যে, হেনরির আইনজীবীর কাছে একটি বাঁধানো ফ্রেমে একটি লেখা পাওয়া যায়–যার অর্থ, 'আমিই এটি করেছি, আমি তাদের শরীর আমার রান্নাঘরের চুল্লিতে পুড়িয়েছি।'

এখানেই হেনরির কাহিনির শেষ নয়। তার মৃত্যুদণ্ডের আগের রাতে সে একটি চিঠি লিখে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকারী প্রসিকিউটর এডভোকেট জেনারেল মাইত্রে গোড্রফ্রয়ের (Advocate General Maitre Godefroy) কাছে। চিঠিটি ছিল এ রকম–"আমাকে যখন আমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনানোর জন্য আবার কোর্টে আনা হলো, আপনি আমার আবেগ দেখতে পেলেন না কেন? আপনি কেন এতটা কঠোরভাবে কোর্টের দর্শকদের উল্লাস থামিয়ে দিলেন? আপনি যদি এতটাই নিশ্চিত হন যে, আমিই নিখোঁজ মহিলাদের হত্যা করেছি তাহলে এখনও তাদের কেন খুঁজে যাচ্ছেন?

সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছিল। আমি যথেষ্ট শান্ত ছিলাম। কিন্তু আপনি বিষণ্ন ছিলেন। এর কি কোনো কারণ আছে যে, অনিশ্চিত বিচারকেরও ততটাই অশান্তি হয় যতটা অপরাধীর হয়? বিদায়, জনাব। আমাদের এই সমকক্ষ ইতিহাসের আগামীকাল সন্দেহাতীত মৃত্যু হবে। আমি নির্দোষ ও শান্ত মন নিয়ে মৃত্যুবরণ করব। শ্রদ্ধার সাথে আশা করি যে, আপনিও একদিন ঠিক তাই করবেন।"

হেনরি ল্যান্ড্রুর মৃত্যুর ৫০ বছর পর 'Landru' শিরোনামে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। সেটি ছিল উপন্যাসিক ফ্র্যাঙ্কোইস সেগানের (Francoise Segan) লেখা। কিন্তু এতে হেনরির সর্বশেষ স্ত্রী ফার্নান্ডে সেগ্রেট (Fernande Segret),

যাকে আদালতে ডাকা হয়েছিল, চলচ্চিত্র নির্মাতাদের বিরুদ্ধে ২ লক্ষ ফ্রাঁর মামলা করে দেয়। শেষ পর্যন্ত সে ১০ হাজার ফ্রাঁ পেলেও সুখী হতে পারেনি। অনেক বছর তার কোন খোঁজখবর ছিল না। অনেকেই ধরে নিয়েছিল যে, সে এতট দিনে মৃত। আসলে সে লেবাননে (Lebanon) একজন শিক্ষিকা হিসেবে চাকরি করত। তার মামলাটি জেতার পর সে টাকা নিয়ে নরম্যান্ডিতে (Normandy) চলে আসে, সেখানে একটি বৃদ্ধাশ্রমে থাকত সে। কিন্তু টাকা তাকে শান্তি দিতে পারেনি। তাকে দেখলেই সবাই বলত 'ল্যান্ড্রুর মামলার সেই মহিলাটি' এবং এই নামেই সে পরিচিত ছিল। বার বার এই নামে পরিচিত হওয়া সহ্য করতে না পেরে সে পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করে।

দ্য মনস্টার অব দ্য অন্দিজ

কারারক্ষীরা তাদের অস্ত্র তাক করে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল এবং ভয়াতুর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল কেননা ১৪ নম্বর কারা প্রকোষ্ঠের ইস্পাতের দরজাটি ছিল খোলা। ইকুয়েডরের (Ecuador) বিখ্যাত আন্দিজ পর্বতমালার (Andes Mountains) সুউচ্চ কোলে অবস্থিত অ্যামবেটো কারাগারের (Ambato Jail) এই কক্ষে বন্দি ছিল এমন এক ব্যক্তি, যার মধ্যে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর বৈশিষ্ট্যসমূহ। কারাগারের নারী বিভাগের সেই কক্ষটির মধ্যে এক কোনায় গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকতো পেদ্রো অ্যালোঞ্জো লোপেজ (Pedro Alanzvo Lopes) তাকে এভাবে সংরক্ষিত করে রাখা হতো কেননা যে কোনো সময় কেউ হয়তো তাকে জীবন্ত পুড়ে অথবা জননশক্তি নষ্ট করে নপুংসকে পরিণত করে ফেলবে। এমন আশংকা ছিল তার আশপাশের অন্য বন্দিদের থেকে এমনকি কারারক্ষীদের থেকেও। আশংকার কারণ ছিল তার শত্রুর সংখ্যা, এমন কোনো স্থান বাকি নেই যেখানে তাকে ঘৃণাকারী ব্যক্তি পাওয়া যায়নি, কারাগারটি ছিল এমনই উদাহারণ, যার ফলে তাকে সংরক্ষিত কারাপ্রকোষ্ঠে রাখা হতো লোপেজকে বলা হয় আন্দিজের পিশাচ বা দ্য মনস্টার অব দ্য আন্দিজ (The Monster of The Andes) কেননা সে বিচারকালে ৩৫০ জনের বেশি বালিকার হত্যার কথা স্বীকার করেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে কুখ্যাত গণ যৌনহত্যাকারী (Mass sex killer) হিসেবে তাকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। তার শিকারের সংখ্যা এ ধরনের যেকোনো খুনির চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

অন্য সকল যৌনহত্যাকারীদের মতই লোপেজের হত্যার উদ্দেশ্যে ছিল যৌনতা। ৩৫০ হতভাগী মেয়ের প্রত্যেককেই নিষ্ঠুরভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার আগে তাদেরকে পৈশাচিকভাবে ধর্ষণ করা হয়েছিল। তার ত্রাসের রাজত্বের তিন তিনটি বছর সে বলতে গেলে নির্দিষ্টভাবে নিয়ম করে সপ্তাহে অন্তত দুটি করে খুন করত।

অ্যামবেটোতে নির্জনে আন্দিজের ৩০০০ ফুট উপরে একা থাকতে থাকতে একসময় সে পুলিশকে তার শিকারদের গোপন কবরে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছিল।

সেখানে ৫৩টি মেয়ের বিকৃত ধর্ষিত মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং তাদের প্রত্যেকেরই বয়স ছিল ৮ থেকে ১২-এর মধ্যে। এরপর সে পুলিশকে আরও ২৮টি স্থানে মেয়েদের কবরের ঠিকানা দেয় কিন্তু সেখানে কবরগুলোতে কোনো মৃতদেহ পাওয়াও যায়নি। ধারণা করা হয় জঙ্গলের পশুরা হয়তো মৃতদেহগুলি খুঁড়ে নিয়ে গেছে। কোনো কোনো মেয়েকে সেসব নির্মাণাধীন স্থানে মাটি চাপা দিয়েছিল, যেখানে বর্তমানে বিশাল বিশাল অট্টালিকা দাঁড়িয়ে গেছে। এই মৃতদেহগুলো হয়তো কংক্রীট সিমেন্টে মিশে গেছে, হয়তো আর কখনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। নির্মাণাধীন রাস্তায়ও সে অনেক মেয়েকে মাটিচাপা দিয়েছে যেখানে বর্তমানে পিচ ঢালা রাস্তা, প্রতিদিন হাজারো গাড়ি তাদের আরও গভীর ঠেলে দিচ্ছে।

লোপেজকে প্রথমত কয়েকটি ইকুয়েডরিয়ান বালিকার খুনের দায়ে গ্রেফতার করা হয়। তবে জিজ্ঞাসাবাদে এক পর্যায়ে সে প্রথমে ৫৩ জন ও পরে আরও ১১০ জনের কথা বলে ১৬৩টি খুনের কথা স্বীকার করে। এ সম্পর্কে মেজর লেসকানো (Major Lascano) বলেন, "যদি কেউ ৫৩টি খুনের কথা স্বীকার করে যেগুলো আপনারা খুঁজে পেয়েছেন এবং আরও ১০০টি স্বীকার করে সেগুলো না পাওয়া গেলেও আপনি সেটিই বিশ্বাস করবেন যা সেই হত্যাকারী বলছে। সে এমন কীই বা আবিষ্কার করবে যা তাকে আইনের হাত থেকে বাঁচাবে?"

কারাগারের নারী বিভাগের সেই ১৪ নম্বর প্রকোষ্ঠে তাকে রাখার একমাত্র কারণ ছিল তাকে ক্রুদ্ধ উন্মাদ কারারক্ষী ও পুরুষ কয়েদিদের তাৎক্ষণিক হামলা থেকে রক্ষা করা । নারী কয়েদিদের তার হামলা থেকে নিরাপদ মনে করা হতো কেননা তার পৈশাচিক যৌনতা ও জিজ্ঞাংসা শুধুমাত্র ছোট মেয়েদের প্রতিই সক্রিয়তা লাভ করত।

এই ভয়ংকর পিশাচের জন্ম হয় ১৯৪৮ সালের ৮ অক্টোর কলম্বিয়ার টলমিয়াতে (Tolmia, Colombia) যখন তার দেশ ছিল রাজনৈতিক অশান্তিতে ভরপুর এবং অপরাধজগৎ প্রতিদিনই বিস্ময়করভাবে প্রসারিত হচ্ছিল। তার মা ছিল ঐ ছোট্ট শহরতলীর এক যৌনকর্মী। তার ১৩ সন্তানের মধ্যে সপ্তম ছিল লোপেজ। আট বছর বয়সে তাকে তার মা ছোট বোনদের একজনকে যৌন হয়রানি করতে ধরে ফেলে এবং তাকে পিটিয়ে সারাজীবনের জন্য ঘর থেকে বের করে দেয়। ছোট বোন ও মায়ের প্রতি ক্ষোভ ও সর্বাঙ্গে ব্যথা নিয়ে আট বছর বয়সী লোপেজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। এমন সময় একজন অচেনা পথিক এগিয়ে এসে তাকে সান্ত্বনা দেয় এবং তাকে নিজের ছেলে হিসেবে লালন-পালন করবে বলে কথা দেয়। সে তাকে কোলে করে একটি নির্জন জনশূন্য ভাঙা বাড়িতে নিয়ে যায়। পিতাসুলভ আদরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোকটি তাকে নির্মমভাবে কয়েকবার ধর্ষণ করে সেখানেই ফেলে চলে যায়। লোপেজ রাগে উন্মাদ হয়ে নিজেকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে আজ তার সাথে যা হয়েছে এমনই সে

যতগুলি সম্ভব ততগুলি ছোট মেয়ের সাথে করবে এবং এ প্রতিশ্রুতি সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। সে রাতের পর সে ভয়ে ঘরের ভিতর ঘুমাতে পারত না, তার ভয় তাকে আরও রাগে উন্মাদ করে দিত, যা তাকে ভয়ংকর পিশাচে পরিণত করে। এ ব্যাপারে সে পুলিশকে বলে, "আমি রাস্তা ও দোকানের সিঁড়িতে ঘুমাতাম। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতাম একটি তারা দেখা যায় কিনা, আমি জানতাম আমি ঈশ্বরের কৃপায় আছি, তিনি আমাকে রক্ষা করবেন।"

বোগোটায় (Bogota) থাকাকালীন একটি দয়ালু আমেরিকান পরিবার সেখানকার পথশিশুদের খাবার ও কাপড় দিয়ে সাহায্য করত। তারা তাকে খাদ্য-বস্ত্র ছাড়াও শিক্ষা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল। অনাথ শিশুদের জন্য তৈরি একটি কলম্বিয়ান স্কুলে তারা তাকে ভর্তি করিয়ে দেয় কিন্তু এতে কোনও লাভ হয়নি। এখানেও একজন পেডোফাইল (Pedophile, Pedophilia আক্রান্ত পুরুষ যাদের যৌন আকর্ষণ শুধুমাত্র ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রতি সক্রিয় যাদের বয়স অন্তত ১৪ এর নিচে) শিক্ষক ছিল যে লোপেজের সাথে শারীরিক সম্পর্কে আগ্রহী ছিল ও প্রায়ই তাকে ধরে যৌন হয়রানির চেষ্টা করত। তখন লোপেজের বয়স ছিল ১২ বছর। সে একদিন স্কুল থেকে বেশ কিছু টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। ১৮ বছর বয়সে সে একটি গাড়ি চুরি করে সেটিতে করে কলম্বিয়া ফেরত আসে। এখানে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ও তাকে অনেক কয়েদিসহ কারাগারে রাখা হয়। দ্বিতীয় দিনই চারটি কয়েদি (পুরুষ) তাকে ভয়ংকরভাবে ধর্ষণ করে। এ ঘটনার পর সে নিজেকে ক্ষুরধার ছুরিতে পরিণত করে। পুলিশকে বলা তার কাহিনি অনুযায়ী দুই সপ্তাহের মধ্যেই সে ওই চারজনের তিনজনকে খুন করে। চতুর্থ জন ভয় পেয়ে অত্যন্ত জোরে চিৎকার করতে থাকলে তাকে খুন করা সম্ভব হয়নি। তিনটি খুনের জন্য তাকে মাত্র দুই বছর অতিরিক্ত কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। কেননা সে অত্যাচারিত হয়ে নিজে বাঁচার জন্য উত্তেজনাবশত খুন করেছিল। এই কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সে বিভিন্ন অশ্লীল সাহিত্যে ও পত্রিকার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এসব পত্রিকা তাকে উত্তেজিত করে তুলত কিন্তু তার মায়ের প্রতি ঘৃণা এতটাই তীব্র ছিল যে সে প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদের ঘৃণা করত। তার যে বোনকে হয়রানি করতে গিয়ে সে ধরা পড়েছিল তার প্রতি রাগ ও ঘৃণা তাকে পিশাচে পরিণত করে। সে পুলিশকে বলেছিল, "আমি আমার পবিত্রতা হারিয়েছি আট বছর বয়সে। আর তার জন্য সবার আগে দায়ী আমার বোন, মা ও সেই পথিক। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার সাথে যেমনটি হয়েছে ঠিক তেমনটিই আমি যতগুলি সম্ভব ছোট মেয়ের সাথে করব।"

সে কারাগার থেকে ছাড়া পায় ১৯৭৮ সালে। ছাড়া পাবার পর পরই সে তার কাজে লেগে যায়। সে পেরুতে চলে যায়, সেখানে সে পেরুভিয়ান মেয়েদের অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুন করতে লাগল। এভাবে সে প্রায় ১০০'র বেশি মেয়েকে

নির্মমভাবে ধর্ষণ করে গলাটিপে তাদের মেরে ফেলে। এই মেয়েগুলো বেশির ভাগ পেরুর ইন্ডিয়ান আদিবাসী (Red Indian) গোত্রের সদস্য ছিল। তার এই পৈশাচিক কর্মকাণ্ড ধরা পড়ে আসাকুচো (Ayacucho) ইন্ডিয়ান আদিবাসী গোত্রের লোকদের কাছে। পেরুর একদম উত্তর প্রান্তে সে এই গোত্রের একটি নয় বছর বয়সী মেয়েকে অপহরণ করেছিল। মেয়েটিকে ভয়ংকরভাবে, যত উপায়ে সম্ভব ধর্ষণ করে সে গলাটিপে হত্যা করে। এ সময় কিছু আদিবাসী লোকের কাছে ধরা পড়লে তারা তাকে ধরে নিয়ে আসে। তারা তার সারা গায়ে ছুরির আঁচড় দেয় ও তাকে পিটিয়ে গর্তে ফেলে বালি দিয়ে চাপা দেওয়া শুরু করে। তার দেহের বেশিরভাগ অংশই বালিতে চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং তাকে তারা জীবন্তই কবর দিত। এ সময় এক আমেরিকান ধর্মপ্রচারক নারী এসে তাকে রক্ষা করে। তিনি আদিবাসীদের বোঝান যে এভাবে কাউকে খুন করা উচিত নয়, অপরাধের শাস্তির জন্য আইনের সাহায্য নিতে হবে। তাদের বুঝিয়ে তিনি লোপেজকে গাড়িতে উঠিয়ে ইকুয়েডরের পুলিশের হাতে তুলে দেন। কিন্তু পুলিশ একটি আদিবাসী মেয়ের মৃত্যু নিয়ে তখন তেমন মাথা ঘামায়নি, তারা কিছুদিন লোপেজকে আটকে রেখে ছেড়ে দেয়, কিছু হুমকি দিয়ে শাসিয়ে তাড়িয়ে দেয় তাকে। পরে যখন আসল ঘটনা প্রকাশিত হয় তখনই যথাযথ তদন্ত শুরু হয়।

মুক্তির পর ইকুয়েডরের সীমান্তজুড়ে শুরু হয় তার প্রকৃত খুনের স্পৃহা। কলম্বিয়ায় ১০০টি ও পেরুতে আরও ১০০টি মেয়েকে খুন করার পর সে ইকুয়েডরে কমপক্ষে ১১০টি শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যা করে। সে পুলিশকে এ সম্পর্কে বলে, "আমি ইকুয়েডরের মেয়েদের বেশি পছন্দ করি, তারা বেশি নির্মল, ভদ্র এবং বিশ্বাসী। তারা কলম্বিয়ার মেয়েদের মতো সন্দেহবাতিক নয় যে অচেনা মানুষ দেখলেই চিৎকার করে।" শিকার ধরার জন্য লোপেজ বাজারের আশপাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করত ও 'লক্ষ্মী' মেয়ে খুঁজে বেড়াত। সে খুঁজে খুঁজে নিষ্পাপ কোমল চেহারার মেয়েদের নিশানা করত। তার খুনের বর্ণনা দিতে গিয়ে সে পুলিশকে বলে, "আমি প্রথমে তাদের জীবনের প্রথম যৌনতার সাথে পরিচয় করাতাম। তারা চিৎকার করত আমি তাদের আরও বৈচিত্র্য) 'উপভোগ' করাতাম। এরপর যখন আর ভালো লাগত না তখন তাদের গলা টিপে ধরতাম আর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতাম। তারা ছটফট করে মারা যেতে দেখে আমি অত্যন্ত উত্তেজিত ও আমোদিত হতাম। যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের চোখ থেকে জীবনের আলো নিভে যেত আমি তাকিয়েই থাকতাম। ছোট মেয়েগুলি খুবই ভালো। গলা টিপে ধরলে তারা বেশি ঝামেলা বা ধস্তাধস্তি করে না। সময় কোথায়? তারা তো সে সময়টিই পায় না।

আমি সবসময়ই তাদের দিনের বেলায় খুন করতাম, কখনো রাতের অন্ধকারে নয়। কেননা আমি তাদের মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের দেখতে চেয়েছি।

তাদের চোখ ঘোলা হওয়া না দেখলে এতটা কষ্ট বিফলে যেত। এরপর তাদের কবরে বসিয়ে আমি তাদের সাথে 'টি পার্টি' করতাম ও বিভিন্ন 'মজার' খেলা খেলতাম। তারা আমার ছোট্ট বন্ধু। কিন্ত যখন তাদের আমি তা জিজ্ঞেস করতাম এবং আমার সাথে ওদের ভালো লাগছে কিনা জানতে চাইতাম ওরা চুপ করে থাকত। তখনই আমার নতুন একজনের দরকার হতো।"

লোপেজের অসুস্থ খেলার বর্ণনা ও মৃত মেয়েগুলির প্রতি প্রশ্নের ধরন শুনে পুলিশেরাও শিহরিত হতে বাধ্য হয়েছিল। সে কোন পিশাচ না কি মানসিক রোগী বা উভয়ই তা তাদের ধারণারও বাইরে ছিল।

যখন বিভিন্ন এলাকা থেকে কিছুদিন পর পরই ছোট ছোট মেয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছিল এই তিন দেশের পুলিশই একই জিনিস ভেবেছিল। তারা বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করে তদন্ত চালাচ্ছিল কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে কোনো শিশু পাচারকারী চক্র হয়তো মেয়েদের অপহরণ করছে তাদের পাচার করার জন্য অথবা বিভিন্ন বড় শহরের পতিতালয়ে কৃতদাসী হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বিক্রি করছে। তাদের একবারও এই জঘন্য গণ খুনির কথা মনে হয়নি। তারা ছিল চক্রের সন্ধানে, তারা চিন্তাও করেনি যে এর সূত্র ধরে তারা একটি পিশাচের খোঁজ পাবে।

১৯৮০ সালের এপ্রিলে যখন পুলিশ বাহিনী কিছুদিন আগেই নিখোঁজ হওয়া মেয়েদের খুঁজতে খুঁজতে প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছে তখন তাদের সামনে আসে এক ভয়াবহ দৃশ্য, যা তাদের ব্যস্ততা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। অ্যামবেটার কাছাকাছি কয়েকদিন টানা ভারি বর্ষণে নদীতে পানি উপচে পড়ছিল। পানি ছাড়াও নদীতে যে সত্য লুকিয়ে ছিল হয়তো তা সহ্য করতে না পেরেই নদী তার দুকূল ছাপিয়ে পানি উপচিয়ে কিনারা ভাসিয়ে দেয়। পাড়ে রেখে যায় চার চারটি ছোট্ট মেয়ের মৃতদেহ। কাউকেই চেনার উপায় নেই, পানিতে ফুলে পঁচে মুখ প্রায় বিকৃত হয়ে ছিল। তবে প্রায় বিবস্ত্র শিশুগুলোর দেহে ধর্ষণের চিহ্ন মুছে যায়নি, বরং তা আরও প্রকট হয়েছিল। পুলিশ হন্যে হয়ে খুনিকে খুঁজতে লাগল, চারদিকে চিরুনি অভিযান চালিয়েও শেষপর্যন্ত খুনির কোনো খোঁজ পেল না। সম্পূর্ণ অভিযানই ব্যর্থ হলো। এর কিছুদিন পরই কার্লিনা র‍্যামন পোভেদা (Carlina Raman Poved) নামক এক মহিলা প্লাজা রোজা মার্কেট (Plaza Rosa Market) ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ খেয়াল করল যে তার মেয়ে মারিয়া (Maria) তার সাথে নেই। মারিয়ার বয়স ছিল ১২ বছর। মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার চিন্তায় শিহরিত মা 'মারিয়া' মারিয়া' বলে চিৎকার করতে লাগল। সে দৌড়ে প্লাজা চত্বরে চলে আসে এবং এদিক সেদিক তাকাতেই হঠাৎ নজরে আসে যে তার মেয়ে মার্কেটের বাইরের রাস্তায় কোন অচেনা লোকের হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে। পোভেদা চুপি চুপি তার মেয়ে ও লম্বা লোকটির পিছু নিল। যেতে যেতে যখন প্রায় শহরর শেষ প্রান্তে

চলে আসে আদিবাসীদের এলাকায়, সে চিৎকার করে উঠে সাহায্যের জন্য। আতঙ্কিত মায়ের চিৎকারে প্রায় সাথে সাথেই আশপাশ থেকে দশ-বারো জন স্থানীয় ইন্ডিয়ান আদিবাসী এসে লম্বা লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে চেপে ধরে। ছোট্ট মারিয়াকে তার মা বুকে চেপে ধরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে লোকটিকে গ্রেপ্তার করে নেয়। লম্বা এই আহরণকারী আর কেউ নয় নিষ্ঠুর পিশাচ, ধর্ষণকারী ও খুনি পেদ্রো লোপেজ।

লোপেজকে থানা হাজতে আটক করে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কিন্তু সে এতটাই শক্ত ছিল যে তার কাছ থেকে কোনো তথ্যই বের করা যাচ্ছিল না। সকল রেকর্ড ঘাটিয়ে পূর্বের সকল কারাগারে তার কর্মকাণ্ড বের করে পুলিশ। উপায় না দেখে তারা একটি ধূর্ত পরিকল্পনা করে। তারা স্থানীয় পাদ্রি পাস্তর করডোবা গুডিনের (Pastor Cordoba Gudino) সাহায্য নিল। তাকে কয়েদির পোশাক পরিয়ে লোপেজের সাথে একই কারাপ্রকোষ্ঠে রাখা হলো প্রায় এক মাস পাদ্রি সাহেব লোপেজের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করলেন ও তার কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য বের করে নিলেন। লোপেজ পাদ্রি সাহেবের বিচক্ষণ কথার বেড়াজালে পড়ে তার সকল কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়, তার কাছে সকল রহস্য ও গোপন কথা প্রকাশ করে। পাদ্রি গুডিনোর দেওয়া তথ্য থেকে ইকুয়েডরিয়ান পুলিশ লোপেজের স্বীকারোক্তি প্রস্তুত করে। কলম্বিয়া ও পেরু পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে লোপেজের কাহিনিকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বাস্তবায়িত করা হয় এবং সকল তথ্য নিয়ে আরও একবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এবার লোপেজ সকল দোষ স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং পাদ্রিকে সাক্ষী হিসেবে দেখে অত্যন্ত হিংস্র আচরণ করে। শেষ পর্যন্ত সে তার শিকারদের কবরের ঠিকানা দেয় পুলিশকে। সেখান থেকে ৫৩টি মৃতদেহ পাওয়া যায় ও বাকিদের অবস্থা আমরা কাহিনির শুরুর দিকেই জেনেছি। এরপর আর তার কথা যাচাই করার খুব বেশি প্রয়োজন ছিল না।

ইকুয়েডরে তার বিচার হয় এবং নৃশংস গণ খুনের দায়ে তাকে আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১৬ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রায় দেওয়া হয় যে সে যদি নিজেকে সংশোধন করে ও কারাগারের নিয়ম মেনে চলে তার সাজা থেকে ২ বছর ক্ষমা করা হবে। যদি তার বিচার কলম্বিয়াতে হতো তাহলে তাকে নিঃসন্দেহে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো, যা জনগণকে শান্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ দিত।

১৯৮৩ সালের মধ্যে সে ৩৫০ খুনের কথা স্বীকার করে। তাকে কিছুদিন পর অন্যান্য কয়েদি ও গার্ডের হাত থেকে রক্ষা করতে নারী প্রকোষ্ঠে একা বন্দি রাখা হয়। রায় অনুযায়ী ১৪ বছর পর তাকে অ্যামবেটো কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। দেশবাসী এত বছর পরও তার কথা ভোলেনি। এমনকি কারারক্ষীদেরও বিশ্বাস করতে কষ্ট হতো যে ১৪ নম্বর প্রকোষ্ঠে রাখা এই ভয়ংকর পিশাচ এখন

মুক্ত । ১৯৯৪ সালের ৩১ আগস্ট মুক্তির কয়েক ঘণ্টা পরই তাকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয়। অবৈধ অভিবাসী হিসেবে এবং তাকে কলম্বিয়ায় হস্তান্তর করা হয় সেখানে তাকে আবারও পূর্বের খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৯৮ সালে অদমনীয় উন্মাদনার কারণে তাকে বোগেটা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং নজরবন্দি রাখা হয়। কিছুদিন পরই তাকে সুস্থ ঘোষণা করে এবং ৫০ ডলারে তার জামিন হয়। এরপর বেশ কিছুদিন তার কোনো খবর ছিল না। ভাবা হয়েছিল হয়তো লোপেজ নিজেকে সংশোধন করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, দানব সত্যিই কখনো মানুষ হতে পারে না। ২০০২ সালে আবারও নতুন একটি খুনের দায়ে তাকে গ্রেপ্তারের আদেশ জারি করা হয় ইন্টারপোল থেকে। কিন্তু কলম্বিয়ান পুলিশ এ আদেশ পালনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তাকে ধরা সম্ভব হলে এবারে তার শাস্তি হতো ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড এবং পৃথিবী নিশ্চিত হতে পারত যে 'দ্য মনস্টার অব দ্য আন্দিজ' আর পৃথিবীতে নেই।

ভয়ংকর এই অপরাধীর গ্রেপ্তারের পরপর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে চমকে উঠেছিল সাংবাদিক রন লেটনার (Ron Laytner), লোপেজ খুশিতে উজ্জ্বল মুখে বলেছিল, "আমি চাই মুক্তি পেতে। যদি এখনই আমি মুক্তি পাই আমি খুশি মনে ছোট মেয়েগুলিকে মারার কাজে ফিরে যাব। যে শান্তি ও আমোদ আমি তাদের মৃত্যু থেকে পাই তার কাছে ভালো-মন্দের পার্থক্য, সঠিক ও ভুলের পার্থক্য কিছুই না। আমি এখনও অপেক্ষা করছি যে কখনো সুযোগ পাব ছোট কোনো গলা আমার হাতের আঙ্গুল দিয়ে জড়িয়ে ধরতে।"

২০০২-এর পর 'দ্য মনস্টার অব আন্দিজ'-এর কি পরিণতি হয়েছে তা কেউ জানে না। কেউ কেউ সন্দেহ করে আবার কেউ বা আশা করে যে লোপেজ জীবিত নেই। এত দিনের ত্রাসের রাজত্বে তার চেহারা চিনে না এমন লোক কমই ছিল। এমন কোনো পত্রিকা ছিল না যেখানে তার কাহিনি ও ছবি ছাপা হয়নি। কেউ কেউ বলেন যে, যদি সে তার ঘৃণাকারীদের হাত থেকে বেঁচে কোথাও যেতে পারে তাহলেও হয়তো তার আগের জীবনে ফিরে যায়নি। কেননা এরপর আর মনস্টার অব আন্দিজের হত্যা স্পৃহা বা লোলুপতার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

দ্য মার্ডারাস ফ্যামিলি

চার্লস ম্যানসন (Charles Manson) এক ভয়ংকর রক্তাক্ত বিপ্লবের দীক্ষা দান করত, যা একসময় শয়তানের উপাসনায় পরিণত হয়। তার আধিপত্যের ছত্রছায়ায় ছিল আরও অনেক পিশাচ উপাসক, যারা তার আদেশে হত্যা করত। তার ভয়ংকর কর্মকাণ্ড প্রকাশের পর তাকে গ্যাস চেম্বারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু তার ভাগ্য ভালো বলতে হবে কেননা সে সময় ক্যালিফোর্নিয়াতে (California) গ্যাস চেম্বারে মৃত্যুদণ্ড প্রথা বাতিল করা হয়। এরপর তাকে নয়টি খুনের জন্য নয়টি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সুপ্রীম কোর্ট তার মৃত্যুদণ্ডকে লঘু করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়।

চার্লস ও তার শয়তান উপাসক শিষ্যরা 'ম্যানসন ফ্যামিলি' হিসেবেই পরিচিত ছিল। তার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীতে সর্বদাই জাতি ও ধন-সম্পদের যুদ্ধ চলছে, আশপাশে সমাজের সকল মানুষ কলুষিত এবং তার খুনের মাধ্যমেই এই যুদ্ধ থেকে সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। তার আদেশে তার শিষ্যরা বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক রোমান পোলানস্কির (Roman Polanski) স্ত্রী শ্যারন টেট (Sharon Tate) এবং তার বান্ধবী লেনো (Leno) ও রোসমেরী লা বিয়াঙ্কাসহ (Rosemary La Bianca) আরও কয়েকজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ঘটেছিল ১৯৬৯ সালের আগস্টে, শ্যারনের হলিউডের বাড়িতে।

চার্লসের জন্ম ১৯৩৪ সালে কিনকিনাটি জেনারেল হাসপাতালে যা ওহাইয়োতে অবস্থিত (Cincinnati general hospital, Ohio)। তার মা, ক্যাথলিন ম্যাডোক্সের (Kathleen Maddox) বয়স তখন ছিল মাত্র ১৬ বছর। জন্মের পর তার নাম চার্লস মাইলস ম্যাডোক্স রাখা হলেও পরবর্তীতে তার মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর উপাধি গ্রহণ করে তা চার্লস ম্যানসন রাখা হয়। ধারণা করা হয় তার জৈবিক পিতা ছিল কর্ণেল ওয়াকার স্কট (Colonel Walker Scott) যার বিরুদ্ধে ১৯৩৭ সালে জারজ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করে। তার শৈশবের দিনগুলো মোটেও সুখকর ছিল না কেননা তার মা সর্বদাই মদ্যপানে মত্ত থাকত অথবা কারাগারে বন্দি থাকত। নয় বছর থেকে সে চুরি করার দায়ে বিভিন্ন

কিশোর সংশোধনাগারে থাকা শুরু করে। ১১ বছর বয়সে সে একটি মুদি দোকানে চুরি করে এবং বেশ কিছু টাকা লাভ করে যা তার সাহস বাড়িয়ে দেয়। এভাবে বিভিন্ন দোকানে চুরি ও ছিনতাই চলতেই থাকে। একটি সাইকেল চুরি করে ধরা পড়াতে তাকে কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। দুদিন পরই সেখান থেকে পালিয়ে গেলে তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে বয়েজ টাউন (Boys Town) সংশোধনাগারে রাখা হয়। এরপর ১৩ বছর বয়সে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ার পর তাকে ইন্ডিয়ানা বয়েজ স্কুল (Indiana Boys School) নামক সংশোধনাগারে রাখা হয়। সেখানে বহু ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে সে আরও দুটি ছেলের সাথে পালাতে সক্ষম হয়। ১৫ বছর বয়সে গাড়ি চুরির দায়ে তাকে পাঠানো হয় ন্যাশনাল ট্রেনিং স্কুল ফর বয়েজএ। সেখানে আই কিউ টেস্টে দেখা যায় চার্লসের আই কিউ ১২১ অথচ সে একেবারে অশিক্ষিত ছিল। এভাবে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত সে বিভিন্ন দণ্ডদায়ক সংশোধনাগারেই কাটায়। এর মধ্যে সে কোনদিনও কোনো নারী বা মাদকের সংস্পর্শে আসেনি। ১৯৫৫ সালে রোসালিজিন উইলিস (Rosalie Jean Willis) নামক এক ওয়েট্রেসকে বিয়ে করে চার্লস। ১৯৫৬ সালে যখন তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, তখন একটি গাড়ি চুরির দায়ে সে পাঁচ বছর সাজা লাভ করে।

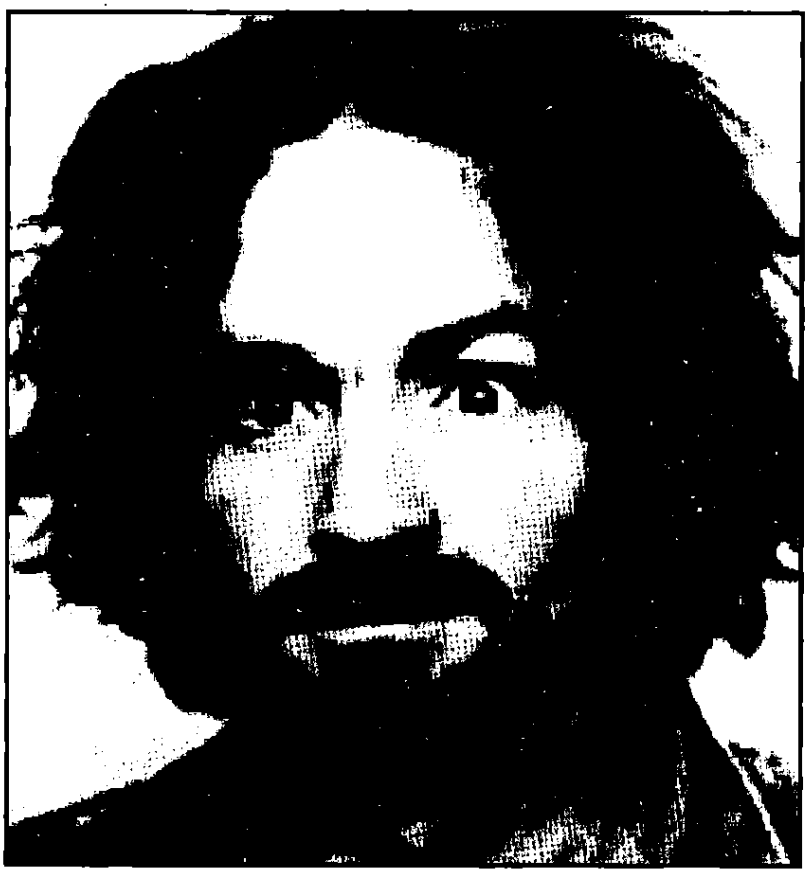

খুনি : চার্লস ম্যানসন

১৯৫৮ সালে পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে আবারও পাঁচ বছরের সাজা প্রাপ্ত হয় সে। সেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পরপরই পতিতাবৃত্তির ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার দায়ে তাকে দশ বছরের সাজা দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে জুলাইয়ে তাকে লস এঞ্জেলস কারাগার থেকে ম্যাকনিল আইল্যান্ডের (McNeil Island) ইউনাইটেড স্টেটস পোনটেশিয়ারিতে (United States Pontentiary) নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সে এক কয়েদীর কাছ থেকে গিটার বাজানো শিখে। ১৯৬৭ সালের ২১ মার্চ সে মুক্তি পায়। ততদিনে তার ৩২ বছরের জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় কারাবাস হয়ে গিয়েছিল।

১৯৬৭ সাল ছিল শান্তি ও ভালোবাসার যুগ এবং সে সাথে হিপিদের যুগ। চার্লস তার চুল ও দাড়ি লম্বা রাখল হিপিদের মতো এবং সঙ্গীত সাধনা ও মাদকে বুঁদ হয়ে গেল। খুব শীঘ্রই একদল ভক্ত তাকে ঘিরে ফেলল এবং সে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে লাগল। সে সান ফ্রান্সিসকোতে (San Franoisco) বসবাস করত। তার ভক্তের সংখ্যা বেশ বাড়তে থাকল, যার অধিকাংশই ছিল মেয়ে। তারা চার্লসের গিটার ও গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে ছুটে চলে আসত। একজন চার্লস সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল, "প্রথম যখন তাকে গান গেতে শুনি আমার মনে হয়েছিল সে কোনো দেবদূত হয়তো! সে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল।" লিনেট (Lynette) নামের এক মেয়ে বলেছিল "চার্লির সাথে থাকলে মনে হতো আমি যেন বাতাসে ভাসছি। ওর সকল পাপকর্ম নির্দোষ মনে হতো। ঠিক যেন একটি শিশু।"

কিন্তু নারীদের প্রতি চার্লসের বিন্দুমাত্র সম্মানবোধ ছিল না। ধীরে ধীরে সে তার সম্মোহনী আচরণের মাধ্যমে তার ভক্তদের উপাসকে পরিণত করে ফেলে। তাদের কাছে চার্লস ছিল দেবতা। তার পৈশাচিক পরিবারে নারীদের কোনো মূল্যই ছিল না। তবে সেখানে নারীর সংখ্যা ছিল পুরুষের চারগুণ। তাদেরকে সে শুধু অন্ধ উপাসকই নয় তুচ্ছ বস্তুর মতো ব্যবহার করত। এমনকি তার পোষা কুকুরদেরও মেয়েদের আগে খাবার দেওয়া হতো। তার ম্যানসন ফ্যামিলির নিয়মানুযায়ী চার্লস যার নাম উচ্চারণ করবে মেয়েদের তৎক্ষণাৎ তার কাছে সমর্পিত হতে হবে। মেয়েদের জন্য 'কেন' প্রশ্নটি ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। মেয়েদের জন্য সেখানে জন্মনিরোধক, মদ্যপান এমনকি চশমা পরাও সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের এবং ভয়ংকর বিষয় হলো যে প্রত্যেকটি নারী সদস্যই এসব নিয়ম বিনা প্রতিবাদে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলত। তারা চার্লসকে ঈশ্বর বলে উপাসনা করত। এমনও অনেক নারী ছিল, যারা চার্লসের সাথে এক রাত উদযাপনের আশায় মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে আসত এবং তার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করত। একবার একজন অভিনেত্রীকে চার্লসের আদেশে নিকটবর্তী পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠতে বাধ্য করা হয়েছিল। অপর একজন চার্লসের সহযোগিতার আশায় তার ১৫

বছর বয়সী মেয়েকে নিয়ে তার কাছে চলে এসেছিল। চার্লস শর্ত দেয় তার মেয়েকে রেখে যেতে এবং সে ঠিক তা-ই করেছিল। বলা বাহুল্য যে সে তার অগণিত ভক্ত ও উপাসকদের আনুকূল্যে সে হলিউডের আকর্ষণীয় পর্দার আড়ালে প্রবেশাধিকার পায়। ধারণা করা হয় যে হলিউডের অনেকেই তার উপাসক দলে ছিল। সন্দেহ করা হয়, যে রাতে শ্যারন ও তার বন্ধুদের হত্যা করা হয় সে রাতে চার্লসও তাদের আমোদ-প্রমোদের সঙ্গী ছিল।

চার্লস তার উপাসকদের আনুগত্যের এমন সব পরীক্ষা নিত যার সর্বোচ্চ সীমায় পড়ত ওসব হত্যাকাণ্ড। নিত্যদিনের বিকৃত আমোদ-প্রমোদ ও বন্দনা উপাসনায় অনেকটা উদাসীন হয়ে চার্লস নতুন নিয়ম জারি করে। ছোটখাটো চুরি করে অর্থ উপার্জনের সাথে যোগ হয় গাড়ি চুরি, ব্যাংক ডাকাতি এবং ধনীদের বাড়িতে চুপিসারে কালো কাপড়ে নিজের ছদ্মাবরণ করে চুরি করা। এসব সমাজবিরোধী কাজ তার উপাসকেরা করত তাকে খুশি করার জন্য। শ্যারনের মৃত্যুর রাতে সে তার শিষ্যদের বলে, শ্যারনের বাড়িতে আসা একজন ব্যক্তিকে ভয় দেখাতে। সে এও বলে যে, এই ব্যক্তি তার অসংখ্য প্রতিশ্রুতি ভেঙেছে, যা তার অন্ধ উপাসকদের রাগান্বিত করে তোলে।

সে সময় পোলনস্কি চলচিত্রের কাজে ইউরোপে ছিল। তার স্ত্রী শ্যারন তখন আট মাসের গর্ভবতী ছিল। তাই সে তার বন্ধু ভয়টেক ফ্রাইকোভস্কি (Voyetk Frykwski) এবং তার বাগদত্তাকে শ্যারনের সাথে থাকার অনুরোধ করে। ভয়টেকের বাগদত্তা অ্যাবিগাইল ফলগার (Abigail Folger) তার ছোট ভাইকেও সাথে নিয়ে আসে, যার বয়স ছিল ১৮ বছর। আগস্টের ৮ তারিখ সন্ধ্যায় শ্যারনের এক বন্ধু জে সেবরিং (Jay Sebring) ও আরও তিনজন বান্ধবী আসে পার্টি করতে। সেখানে উপস্থিত ছিল আরও চারজন। তিনটি মেয়ে এবং একজন ফুটবল তারকা, যারা সকলেই ম্যানশন ফ্যামিলির বিশ্বস্ত ও অনুগত উপাসক ছিল। সে রাতে এই চারজনের হাতেই নির্মমভাবে খুন হয় শ্যারন ও তার বন্ধুরা। চার্লসের এই পিশাচেরা নির্মমভাবে সন্তানসম্ভবা শ্যারনের সারাদেহে ছুরিকাঘাত করে। তার পেটে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ১৬টি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। অন্যদের অবস্থাও প্রায় একই রকম ছিল। শুধু তাই নয়, ঘরের দরজায় শ্যারনের রক্ত দিয়ে লিখে রাখা হয়েছিল 'চরম'।

পরদিনই সারা শহরে এ হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ে। সকালে শ্যারনের চাকর এসে রক্তাক্ত ঘর ও লাশগুলো দেখে সাথে সাথে পুলিশকে খবর দেয়। আগের রাতে শ্যারন তাকে ০৯.৩০ টার দিকে ছুটি দিয়েছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় মধ্যরাতের আগেই প্রত্যেকটি হত্যা সংঘটিত হয়েছিল। তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পুলিশ বের করে সেইদিন সন্ধ্যায় কারা শ্যারনের বাড়িতে উপস্থিত ছিল। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে যাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি,

তাদের সন্দেহভাজন তালিকায় রেখে পুলিশ কাজ করতে থাকে। প্রায় এক মাস পর পুলিশ অপরাধীদের হদিস পায় এবং তাদেরকে নজরবন্দি রেখে অনুসন্ধান কার্য অব্যাহত রাখে। শ্যারনের কুশনের পিছনে পাওয়া রক্তাক্ত ছুরির সাথে হাতের ছাপ মিলে গেলে অপরাধী শনাক্ত করা হয় এবং তাদের সাথে চার্লসের সম্পর্ক উদ্‌ঘাটিত হয়। চার্লসসহ তাদের চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। চার্লসের পিশাচ পারিবারের অধিকাংশই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। চার্লসকে ৯টি খুনের জন্য দায়ী করে ১৯৭০ সালের ১৫ জুন মামলার শুনানি শুরু হয়। মামলার আসামি ছিল চার্লস ও তার চারজন শিষ্য ক্যাসাবিয়ান (Kasabian), অ্যাটকিনস ভাই বোন (Atkins) এবং ক্রেনউইঙ্কেল (Krenwinkel) প্রথমে তাদের সবাইকে গ্যাস চেম্বারে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সাক্ষী হিসেবে সহযোগিতা করতে রাজি হওয়ায় ক্যাসাবিয়ানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। চার্লসের উপর আরও অনেক মামলা দায়ের করা হয় এবং এরই মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় গ্যাস চেম্বারে মৃত্যুদণ্ডের প্রথা বাতিল হয়। যার ফলে চার্লসের মামলার শুনানিতে পরিবর্তন আসে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে তার সাজা কার্যকর করা হয়।

বর্তমানে এই রক্ত পিপাসু পিশাচ ভ্যাকাভিল (Vacaville) কারাগারের ভজনালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কর্মরত আছে। বহু বছর সশ্রম কারাদণ্ডের পর ভজনালয়ের কাজ তাকে পরিবর্তন করবে বলে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু আজও তার মধ্যে কোনো অনুশোচনাবোধ নেই। বৃটিশ ফটোগ্রাফার অ্যালবার্ট ফস্টারকে (Albert Foster) সে বলে, "আমি মোটেও লজ্জিত বা দুঃখিত নই। যদি ডলার-নির্ভর সমাজের চোখ খোলানোর জন্য ভয় ও হিংস্রতার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে চার্লস ম্যানসনের নামটি হবে সেই ভয়।" চার্লসের মতো ভয়ংকর খুনি তারপরও জেল থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। বেশ কয়েকবার তার প্যারোল বাতিল করা হয়। ১৯৮৯ সালে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করে তারই এক উপাসক। যার ফলে তার প্যারোল ১০ বছরের জন্য বাতিল করা হয়। ২০০৯ এ তার কাছে মুঠোফোন পাওয়াতে আবারও প্যারোল বাতিল করা হয়। ২০১২ সালের এপ্রিলে তার মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রমাণ করে তার স্কিৎজোফ্রেনিয়া আছে এবং যে কারণে তাকে মুক্ত করা কোনোভাবেই নিরাপদ নয়। ১৫ বছরের জন্য প্যারোল বাতিল করা হলে পরবর্তী প্যারোলের সময় তার বয়স হবে ৯২ বছর।

ব্যাড বাট নট ম্যাড

১৯৫৮ সালের মে মাসে, গ্লাসগোতে (Glasgow) পিটার থমাস অ্যান্থনি ম্যানুয়েল (Peter Thonas Anthony Manuel)-এর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে গিয়ে বিচারক লর্ড ক্যামেরন (Lord Cameron) বলেন, "একজন মানুষ উন্মাদ না হয়েও অত্যন্ত খারাপ হতে পারে।" পিটার, যে নির্বিকারভাবে নয়টি খুন করেছে তাতে প্রমাণ করে নিঃসন্দেহে সে একজন অত্যন্ত জঘন্য ব্যক্তি। তবে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যাক্তি কি এভাবে এলোপাতাড়ি শিকার ধরে ধরে কোনো কারণ ছাড়া খুন করে? শুধু তাই নয়, যাকে বিপত্নীক বানিয়েছে তারই কাছ থেকে বলপ্রয়োগে টাকা আদায় করে সদিচ্ছায় নিজের খুনের তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেওয়াটা কি কোনো সুস্থ ব্যক্তি করে?

তবে পিটার কোনো বোকা-মূর্খ ছিল না। তার শুনানির মাঝপথে সে তার পক্ষের উকিলকে বাদ দিয়ে নিজেই নিজের পক্ষ নিয়ে মামলায় লড়তে শুরু করে। সে আত্মরক্ষাকল্পে তার মামলা এতোটাই নিপুণভাবে পরিচালনা করেছিল যে, লর্ড ক্যামেরন পর্যন্ত তাকে বাহবা দিয়েছিলেন। সে তার কৃত চুরি, ডাকাতি, যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের দায়ে কারাগারে অন্তরীণ সময়ে আইন সম্পর্কে পড়াশুনা করে যে জ্ঞানার্জন করেছিল তার সম্পূর্ণটাই সেদিন কাজে লাগিয়েছিল। তবে সে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বেমালুম ভুলে গিয়েছিল তা হলো, স্কটল্যান্ডে একজন গণখুনিকে প্রত্যেকটি খুনের জন্য আলাদাভাবে দায়ী করা হয় এবং বিচার করা হয়। অপরদিকে ইংল্যান্ডে একজনকে শুধু একটির জন্য দায়ী করে বিচার করা হবে এ কারণে যেন অন্যান্য অপরাধের সাক্ষ্য প্রমাণের প্রভাবে অযাচিত বা অনৈতিক বিচার যাতে না হয়।

পিটারের খুনি হিসেবে রেকর্ডগুলোর সাথে শিকাগোর বিভিন্ন দুর্বৃত্তের মিল আছে এবং এই তুলনাটি তাকে আরও গর্বিত করে তুলত। তার জন্ম হয় আমেরিকাতেই। ১৯২০ এর দিকে তার বাবা-মা স্কটল্যান্ড ছেড়ে নিউইয়র্কে চলে আসে। পিটারের জন্ম হয় ১৯২৭ সালে। কিন্তু অভাব ও হতাশা তাদের বৃটেনে নিয়ে যায় এবং সেখানেই তাদের সন্ত্রাসী পুত্র শীঘ্রই বিপদে পড়ে। তার বয়স

যখন প্রায় ১৬, তার সম্পর্কে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা মন্তব্য করেছিলেন যে, পিটার তার দেখা ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জঘন্য কাজ করে। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে সে এ সকল জঘন্য কাজের সাথে খুন সংঘটনে জড়িয়ে পড়ে।

১৭ বছর বয়সী অ্যান নিল্যান্ডস (Anne Knilands) তার বন্ধুবান্ধবের জন্য ইস্ট কিলব্রাইড স্ট্রিটে (East Kilbride Street) অপেক্ষা করছিল। এখানেই প্রথম তার দেখা হয় পিটারের সাথে। পিটারের খেটে খাওয়া মানুষের মতো রূক্ষ চেহারার মধ্যেও একটা সুদর্শন ভাব ছিল, যা তাকে ভদ্রলোকের মুখোশ পড়তে সাহায্য করত। কিছুদিনের পরিচয় ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে অ্যান তার সাথে একদিন ওই রাস্তারই একটি রেস্তোরায় যেতে রাজি হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন সন্ধ্যার পর পিটার মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল হঠাৎই সে মেয়েটিকে টেনে হিচড়ে জঙ্গলে নিয়ে যায়। এরপর এক টুকরা লোহা দিয়ে নির্মম আঘাতের পর আঘাত করে মেয়েটির খুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলে। দুর্ভাগা মেয়েটি কল্পনাও করেনি যে, সে তার সাথে এমন পাশবিক আচরণ করবে। এরকম একটি খুন যা আপাত দৃষ্টিতে ছিল মোটিভহীন (খুন করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট কারণ বিহীন), পুলিশকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত ও চিন্তিত করে ফেলে। তারা সকল সম্ভাব্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। চিহ্নিত অপরাধী হিসেবে পিটারও বাদ পড়েনি। তবে তার জীবনে এমন অসংখ্যবার জিজ্ঞাসাবাদের মুহূর্ত এসেছে, যে কারণে সে জানত তাকে ঠিক কী কী বলতে হবে। একে একে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ সুরাহা না করতে পেরে সন্দেহের তালিকা বাড়াতে থাকে। তারপর গ্রীষ্মের সময় এই জঘন্য পিশাচ ভাবল যে, তার একটি বন্দুকের প্রয়োজন এবং শীঘ্রই সে তা জোগাড় করে ফেলল। তার অপরাধী অহঙ্কার দিনে দিনে বেড়েই চলছিল। যেহেতু সে খুন করে একবারও ধরা পড়েনি, তার বিশ্বাস ছিল সে আবারও তা করতে পারবে।

১৯৫৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সে দুটি ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়ে শহরের ধনী এলাকা হাই বার্নসাইডে (High Burnside) ডাকাতির অভিযান চালায়। জায়গাটি গ্লাসগো থেকে কয়েক মাইল দূরে। তারা প্রথমে একটি খালি বাড়িতে লুঠতরাজ করে এবং সেখানে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে নাচ গান শুরু করে দেয়। এরপর পিটার পাশের বাড়িটিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে এবং সে একাই যায়। প্রথমে নিচতলায় ঢুকে একটু ঘোরাঘুরি করে সে সোজা দোতলায় চলে যায়। প্রথম ঘরে গিয়ে দেখে সেখানে দুটি মহিলা ঘুমিয়ে আছে। পাশের ঘরে গিয়ে দেখে ১৬ বছর বয়সী ভিভিয়েন ওয়াটকে (Vivienne Watt)। পিটার একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ মেয়েটির ঘুম ভেঙে যায় এবং সে পিটারকে দেখে ভয়ে বিছানায় উঠে বসে। মেয়েটি চিৎকার করে ওঠার আগেই সে লাফ দিয়ে বিছানার কাছে গিয়ে এক আঘাতে মেয়েটিকে অচেতন করে তাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলে।

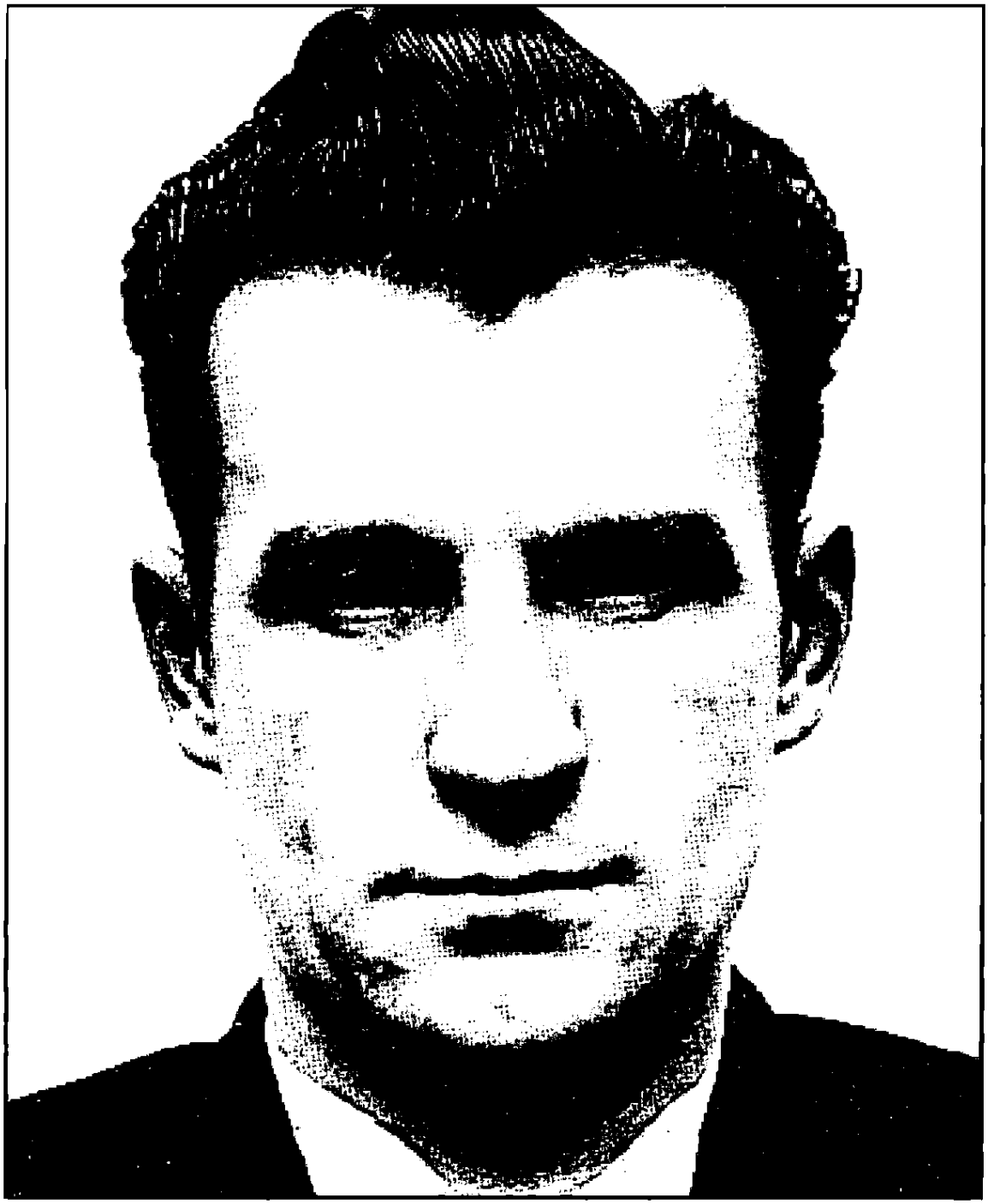

খুনি : পিটার থমাস এন্থনি ম্যানুয়েল

এরপর আবার প্রথম ঘরটিতে যায় যেখানে ভিভিয়েনের মা মিসেস ম্যারিয়ন ওয়াট (Mrs. Marion Watt) এবং তার বোন মিসেস মার্গারেট ব্রাউন (Mrs. Margaret Brown) গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। পিটার নিঃশব্দে তাদের মাথার কাছে গিয়ে তাদের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে তাদের হত্যা করল। এবার সে ভিভিয়েনের কাছে ফিরে এল। ততক্ষণে ভিভিয়েন কিছুটা সচেতন হয়ে শক্ত বাঁধন খোলার চেষ্টা করছিল। পিটার ভিভিয়েনকে লাথি দিয়ে ফেলে দিয়ে তার বাম চোখে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে। সে তিনজনেরই জামাকাপড় কিছুটা ছিন্ন

ভিন্ন করলেও তাদের কাউকেই ছুঁয়ে দেখেনি। বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, পিটার হয়তো মেয়েদের খুন করেই যৌন তৃপ্তি লাভ করে। এজন্যে তার কোনো শারীরিক সম্পর্কের প্রয়োজন হয় না। তিন তিনটি খুন করে সে আবারও প্রথম বাড়িটিতে তার বন্ধুদের কাছে ফিরে যায়। তখন প্রায় রাত তিনটা বাজে। তারা আরও কিছুক্ষণ সেখানে থেকে ৫টার দিকে গ্লাসগোতে ফিরে যায়। অবাক হবার বিষয় হলো, পিটারের গুলিতে ভিভিয়েন নিহত হয়নি। সকালে যখন পরিবারটির কাজের লোক এসে তাদের আবিষ্কার করে তখনো তার শরীর গরম ছিল। এ ঘটনা যদি তাকে তৃপ্তি দিয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে ভিভিয়েনের মৃত্যু যন্ত্রণা তার মনকে আরও নিষ্ঠুরভাবে বদলে দিয়েছিল।

পুলিশ তিনটি খুনের দায়ে ভিভিয়েনের বাবা উইলিয়াম ওয়াটকে (William Watt) গ্রেফতার করে। মিঃ ওয়াট একজন রুটি প্রস্তুতকারী ছিলেন এবং আগের রাতে তিনি লোচগিলফেডের (Lochgilphed) একটি হোটেলে রাত কাটিয়েছেন। জায়গাটি আর্জিল (Argyll) শহরে যা তার বাড়ি থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত। সাক্ষীরা তাকে সেখানে মধ্যরাতে ও সকাল ৮টায় কাজ করতে দেখেছে। তবে পুলিশ কোনভাবে প্রমাণ করে ফেলল যে তার পক্ষে খুব সহজেই এই ৮ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি চালিয়ে এসে খুন করে ফিরে যাওয়া সম্ভব। তারা এমনও সাক্ষী পেয়েছিল যারা কসম কেটে বলছিল যে তারা মিঃ ওয়াটকে তার গাড়িতে রাত ৩টায় রেনফু ফেরীতে দেখেছে। দুর্ভাগ্যবান নির্দোষ লোকটিকে নিজের পরিবারকে খুন করার দায়ে দুই মাস কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। পুলিশ শেষ পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ খুঁজে পায়নি যে একজন স্নেহময় পিতা ও সফল সচ্ছল ব্যক্তি কেন তার সুখী পরিবারকে হত্যা করবে। কিন্তু মিঃ ওয়াটের অগ্নি পরীক্ষা তখনো শেষ হয়নি। এর কারণ আর কেউ নয় সে হলো পিটার, যার কিনা ওয়াট পরিবারকে খুন করার পিছনে কোনো কারণই ছিল না।

পিটার এবার উইলিয়ামের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করতে লাগল। সে প্রথমে তাকে বলল যে সে খুনির নাম বলতে পারবে তবে এ জন্য তাকে টাকা দিতে হবে। এরপর সে মিঃ ওয়াটের সাথে দেখা করে তাকে প্রস্তাব দিল যে, মাত্র ১২০ পাউন্ডের বিনিময়ে সে খুনিকে হত্যা করবে এবং ঘটনাটি আত্মহত্যার মতো সাজিয়ে দিবে। তবে মিঃ ওয়াট এতে রাজি হননি। পিটার আগুন নিয়ে খেলা করছিল, তবে আশ্চর্যজনকভাবে এবারও সে পার পেয়ে গেল এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে লাগল। ১৯৫৭ সালের ৮ ডিসেম্বর সে টাইনের (Tyne) উপর দিয়ে দক্ষিণ সীমান্তের দিকে নিউ ক্যাসেলে (Newcastle) যাওয়ার ট্রেনে উঠল। নিউক্যাসেল পৌঁছে সে একটি ট্যাক্সি নিয়ে ড্রাইভার সিডনি ডানকে (Sidney Dunn) বলল এডম-বায়ার্সের জলাভূমি এলাকায় যেতে। জলাভূমি এলাকায় যাবার কারণ সম্পর্কে সেই ড্রাইভারটির কোনো আগ্রহই ছিল না। কেনইবা

থাকবে? সে কি জানত যে সেখানে তার মৃত্যু আছে? পথিমধ্যেই পিটার ড্রাইভারকে গুলি করে এবং ছুরি দিয়ে অসংখ্য আঘাত করে। তার রক্তাক্ত দেহটি সেখানেই পড়ে থাকে। পরবর্তী খুনটি হয় গ্লাসগোতে। বড়দিনের পরপরই তার সাথে ১৭ বছর বয়সী সুন্দরী ইসাবেল কুকের (Isabelle Cooke) দেখা হয় গ্লাসগোর সীমান্ত এলাকায়। এটি ছিল এ পর্যন্ত তার করা খুনের মধ্যে অন্যতম জঘন্য খুন। প্রথম মেয়েটির মতোই ইসাবেলের সাথেও পিটার বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। ঘুরতে যাবার কথা বলে সে ইসাবেলকে টেনে হিঁচড়ে একটি মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে তার পোশাক প্রায় সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন করে ফেলে ছুরির আঘাতে। কিশোরী মেয়েটির দেহও সে নিষ্ঠুরভাবে ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে। এরপর যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকা মেয়েটিকে সে গলাটিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিন্ন ভিন্ন পোশাক পড়া রক্তাক্ত নিথর দেহটিকে সেখানেই কোনমতে মাটিচাপা দিয়ে সেখান থেকে চলে আসে পিটার।

যখন স্কটল্যান্ডের উৎসব হগমানায়ে অর্থাৎ নতুন বছরের আগের দিন সবাই ঘুমাচ্ছিল, খুনি পিটার গ্লাসগোতে পিটার স্মার্ট (Peter Smart) নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সে মিঃ স্মার্টের পড়ার ঘরে প্রবেশ করে। টেবিলের উপর রাখা মিঃ স্মার্টের মানিব্যাগে সে ২৫ পাউন্ড পেয়ে, নোটগুলো তৎক্ষণাৎ পকেটে নিয়ে তাদের শোবার ঘরে যায়। মিঃ স্মার্ট, তার স্ত্রী ডরিস (Doris) ও ছেলে মাইকেল (Michael) তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। সে তখনই চলে যেতে পারত, কেননা তারা কেউই পিটারের উপস্থিতি টের পায়নি। কিন্তু পিটার তাদের প্রত্যেকের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে একটি করে গুলি করে তাদের হত্যা করে। এরপর তাদের ফ্রিজ থেকে দুই টিন স্যামন (Salmon) মাছ বের করে তাদের বিড়ালকে খাইয়ে খুশিমনে বাড়ি ফিরে আসে। তাকে দেখে কেউ চিন্তাও করতে পারবে না যে এইমাত্র সে তিন তিনটি নিষ্পাপ মানুষকে খুন করে এসেছে।

তবে সবকিছুরই একটি সীমা আছে যা অতিক্রম করা হলে প্রকৃতির নিয়মে শাস্তি পেতে হয়। পিটারেরও অবাধ অপরাধের দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। শেষ পর্যন্ত জঘন্য এই পিশাচ একটি ভুল করে বসায় তাকে ধরা পড়তে হলো। সে মিঃ স্মার্টের মানিব্যাগ থেকে চুরি করা পাঁচ পাউন্ড খরচ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। পুলিশ মিঃ স্মার্টের ব্যাংক থেকে কিছুদিন আগেই আনা নোটের সিরিয়াল নম্বর মিলিয়ে নোট খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং এভাবেই পিটার ধরা পড়ল। পুলিশ পিটার ও তার বাবাকে গ্রেফতার করে আনল। পিটার সব দোষ স্বীকার করবে এবং জবানবন্দী দিবে এই শর্তে যে, তার বাবাকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর সে পুলিশকে যা বলে, তা ছিল একটি পাষাণ ব্যক্তির অনুভূতিহীন ভয়াবহ কাহিনি। প্রত্যেকটি খুনের বর্ণনা শুনে পুলিশও শিউরে উঠছিল। তার ঠান্ডা মাথার

স্বীকারোক্তি সব অফিসারদের হতভম্ব করে দিয়েছিল। যখন তাকে ইসাবেলের মৃতদেহ খুঁজে বের করতে নিয়ে যাওয়া হয়। সে মাঠটিতে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলছিল, "হ্যাঁ, এটাই সেই জায়গা, হয়তো আমি এখন তার উপরেই দাঁড়িয়ে আছি।"

পিটার খ্যাতির জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল। সে চাইত যেন সবাই তাকে ভয় পায়। কিন্তু কোর্ট বা পুলিশ কেউই তার কীর্তিকলাপে ভয় পায়নি। প্রায় ২৫০ সাক্ষী এবং শুনানিতে পিটারের ৩ ঘণ্টার বক্তব্যের পর জুরি তাকে মোট ৭টি খুনের জন্য দায়ী করে। কেননা, নিউক্যাসেল স্কটল্যান্ডের বিচারের আওতায় পড়ে না এবং অ্যান নিল্যান্ডসের হত্যাকাণ্ডের কোনো সাক্ষী পাওয়া যায়নি। ৭টি খুনের দায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই হিংস্র, পৈশাচিক ও জঘন্য খুনিকে ১৯৫৮ সালের ১১ জুলাই গ্লাসগোর বার্লিনিন কারাগারে (Barlinnin Prison) ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়।

দ্য প্রিন্স অব পয়জনার্‌স

উইলিয়াম পালমারের (William Palmer) নাম 'প্রিন্স অব পয়জনার্‌স' হিসেবে ইতিহাস হয়ে আছে। ভয়ংকর এই খুনি এতটাই কুখ্যাত ছিল যে, সে যে শহরে তার পৈশাচিক কর্মকাণ্ড চালাত, সে শহরবাসীরা প্রধান মন্ত্রির কাছে শহরটির নাম বদলে দেওয়ার আবেদন করেছিল। ঊনবিংশ শতকের অন্যতম চাঞ্চল্যকর মামলার মধ্যে একটি হলো পালমারের মামলা। এতটা কুখ্যাত হওয়ার কারণ এই নয় যে সে ই সর্ব প্রথম স্ট্রিকনিন ব্যবহারকারি খুনি, বরং তার খুনের পদ্ধতি যা ভয়ংকর হত্যা পিপাসা ও নৃশংসতার এক নতুন অধ্যায়ের আলোকপাত করে।

পালমার এবং তার হতভাগ্য আত্মীয়স্বজনরা প্রথম থেকেই সামাজিকভাবে অবহেলিতদের মধ্যে অবস্থান করছিল। তাদের সবচেয়ে তীব্র বৈশিষ্ট্যগুলো রানি ভিক্টোরিয়ার পিউরিটানিজমে (Puritanism, ক্যাথলিক নীতি, বিশুদ্ধ জীবন যাপনের পদ্ধতি) অভ্যস্ত হতে থাকা দেশ ইংল্যান্ডে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে বিবেচ্য ছিল। পালমার ও তার পরিবারে অবাধ যৌনাচার, জুয়া, মদ্যপান, ধর্মহানি, মানহানি ও হত্যা এসব জঘন্য ঘটনাই ছিল বনেদিয়ানা। উইলিয়াম পালমারের জন্ম হয় ১৮২৪ সালে স্ট্যাফর্ডশায়ারের রুগেলিতে (Rugeley, Staffordshire)। তার পিতা সেখানে মারকিস অব অ্যাংসলি (Marquess of Angsley) নামক এক কাঠের কোম্পানিতে কাঠমিস্ত্রি হিসাবে চাকরি করত। সে তার মালিককে প্রতারণা করে তার সত্তর হাজার পাউন্ড মূল্যের কাঠ ও কোম্পানি বিক্রি করে দেয়। তার মা এমন এক পরিবারের মেয়ে ছিল যেখানে তার চাচা নিজের অবৈধ কন্যা সন্তানের সাথে ঘৃন্য শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত ছিল। এমনকি তার সাথে একটি কন্যা সন্তানের জনকও হয়েছিল। এধরনের পারিবারিক ইতিহাস বালক উইলিয়ামের মধ্যেকার পৈশাচিকতাকে তখনো জাগরিত করেনি। উইলিয়াম ও তার অন্যান্য ভাইবোনেরা নিজেদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছিল শুধু তাদের বড় বোন ম্যারি অ্যান বাদে। সে তার মায়ের মতই বাছবিচারহীন যৌনসম্ভোগে উৎসাহী ছিল। তার বড় ভাই ওয়াল্টার (Walter) পরবর্তিতে একজন মদ্যপে পরিণত হয়। উইলিয়াম

নিজে তার জীবনকে মদ, নারী ও জুয়ার নেশায় নিমজ্জিত করে। সে সাথে জালিয়াতি ও চুরি তো আছেই।

উইলিয়ামের বয়স যখন ১২ বছর তখন তার বাবা মারা যায়। সে আশা করেছিল যে বাবার সম্পত্তি তাকে সারাজীবনের মতো ফুর্তি করার সুযোগ করে দিবে। কিন্তু সে আশার গুঁড়ে বালি পড়ে। সে মাত্র সাত হাজার পাউন্ডের ভাগ পেল। স্কুল শেষ করার পর সে লিভারপুলের একটি কেমিস্ট ফার্ম, ইভান্স এন্ড ইভান্সে (Liverpool firm of chemists, Evans & Evans) শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ শুরু করে। তবে তার উড়নচণ্ডী জীবন যাপন, ঘোড়দৌড়, নারীদের আমোদ প্রমোদে মাতিয়ে রাখা, ধনী বন্ধুদের সাথে তাল মিলিয়ে চলা ও অলসতা খুব শীঘ্রই তার আয়ের সীমা ছাড়িয়ে গেল। সে ফার্মের জন্য বিভিন্ন অর্ডার ও টাকার চালান সংগ্রহ করতে পোস্ট অফিসে যেত এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে টাকা চুরি করা শুরু করে। একসময় তার চুরি ধরা পরলে তাকে চাকরিচ্যুত হতে হয়। উইলিয়ামের মা তার চুরির ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাকে নতুন কাজের সন্ধানে একজন সার্জন, এডওয়ার্ড টাইলকোটের (Edward Tylecote) কাছে পাঠায়। উইলিয়াম ছিল অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু সেই সাথে প্রচণ্ডরকম দুশ্চরিত্র ও লম্পট। তার একমাত্র মনোযোগ ছিল কম সময়ে অর্থ উপার্জন ও উড়নচণ্ডীপনা। সে তার মালিকের কাছ থেকে প্রতিনিয়তই চুরি করত এবং তার অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে তার রোগীদের অবৈধভাবে ব্যবহার করত। সে তার ৫ বছরের চাকরিজীবনে কমপক্ষে ১৪ জন মেয়েকে গর্ভবতী করেছিল। সার্জন টাইলকোট ধীরে ধীরে রোগী হারাতে শুরু করল উইলিয়ামের এসব কর্মকাণ্ডে। শেষ পর্যন্ত সে ধৈর্য হারিয়ে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে স্ট্যাফর্ড ইনফারমারিতে (Strafford Infirmary) বদলি ছাত্র হিসেবে পাঠিয়ে দেয়। পালমার ততদিনে বুঝে গিয়েছিল যে চুরি ও যৌনাচার থেকে ফিরে আসার কোনো উপায় নেই। অবশ্য সেও ফেরার পথ খুঁজছিল না। তার কাছে এসব কাজের সুযোগের কোনো অভাব হতোনা। এরই মধ্যে সে নতুন এক জিনিসের উপর আসক্তি লাভ করে যা ছিল বিষ। হাসপাতালের ঔষধালয় তাকে শুধু মাত্র বিষের জন্যই টানত। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবগত ছিল এবং তাকে শীঘ্রই ঔষধালয়ের পদ থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু পালমারকে দমন করা এতটা সহজ ছিল না।

১৮৪৬ সালে স্ট্যাডফোর্ডে অ্যাবলি (Abley) নামের এক ব্যক্তির মৃতদেহ আইনত অনুসন্ধানের জন্য আনা হয়। তার বোকামি ছিল এটাই যে, সে মদ্য পান করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নয়, পালমার নিজে, যে কিনা তার স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িত ছিল। মাত্র দুইবার বড় পাত্রে ব্র্যান্ডি পান করার পরই সে ভয়াবহরকম অসুস্থ হয়ে পরে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। কর্তৃপক্ষের সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও পালমারের বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ

করা সম্ভব ছিলনা। অ্যাবলির মৃত্যুর কিছুদিন পর সে পড়াশোনা করতে লন্ডনের সেন্ট বার্থোলোসিও হসপিটালে (St. Bartholomew's Hospital) চলে যায়। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, অ্যাবলি ছিল এই খুনির প্রথম শিকার। হয়তো বিষশাস্ত্রের কোনো পরীক্ষা করে দেখছিল সে। অ্যাবিলর সাথে কোনো আর্থিক লেনদেনের বিষয় ছিল কি না জানা যায়নি।

খুনি উইলিয়াম পালমার

লন্ডনের প্রথম বছরে সে প্রায় দুই হাজার পাউন্ড খরচ করে ফেলেছিল। সে সময়ে উড়িয়ে বেড়ানোর জন্য এটি অনেক বড় অঙ্ক ছিল। এর মধ্যে সে একজন চিকিৎসক হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। চিকিৎসক হিসেবে সে যেমনই হোক একটি বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল ক্লাসের সবার উপরে। বোঝাই যাচ্ছে তা ছিল বিষশাস্ত্র ও বিষক্রিয়া। তার সমস্ত পাঠ্যপুস্তক ঘেঁটে হাতে লেখা নোট হিসেবে একটি বাক্যই পাওয়া গিয়েছে, "স্ট্রিকনিন মানুষের শ্বসনতন্ত্রের মাংসপেশিকে ধনুষ্টংকারের ন্যায় অচল করে দিয়ে মৃত্যু ঘটায়"।

১৮৪৬ সালের আগস্ট মাসে পালমার রুগেলিতে ফেরত আসে এবং ট্যালবট আর্মস ইন (Talbot Arms Inn) নামের এক অতিথিশালার বিপরীতে একটি

বড় বাড়িতে হাতযশ শুরু করে। পালমার ও তার বিধবা মা উভয়েরই কামোদ্দীপক ভাবমূর্তির জন্যেই স্থানীয় মানুষজন তাদের কাছে আসার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠে। রোগীদের আনাগোনায় তার ব্যবসা বেশ জমে ওঠে, যা তাকে ঘোড়দৌড় ও জুয়া খেলা থেকে বেশি কিছুদিন দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। চিকিৎসকের জীবন থেকে আয় করা অর্থ তার সব চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল না। বনেদি জীবন যাপনের জন্য সে তখন দেনায় ডুবে ছিল। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পালমার তার খরচ ও আয়ের পথ কিছুটা পরিবর্তনের চিন্তা করল। একদিন সে তার এক অবৈধ কন্যা সন্তানের সাথে দেখা করতে চাইল (যার মা ছিল ডাঃ টাইলকোটের পরিচারিকা)। মেয়েটি সারাদিন বাবার সাথে কাটানোর পর সন্ধ্যায় মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার পর পরই অসুস্থ হয়ে পরে। বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি মারা যায়। এর কিছুদিন পর পালমারের আরও একটি অবৈধ সন্তান তার কাছ থেকে মধু খাওয়ার পর ভয়ংকর অসুস্থ হয়ে পরে। তার পরিণতিও একই, কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু। এদের মৃত্যুতে সে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান থেকে বেশ কিছু টাকা পায়, সেই সাথে তার খরচও কমে যায়।

১৮৪৭ সালে পালমার অ্যান ব্রুকস (Ann Brooks) নামের এক মেয়েকে বিয়ে করে। অ্যান নিজেও এক ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেলের অবৈধ সন্তান। তার বাবা অনেক আগেই আত্মহত্যা করেছে এবং তার মা সারাদিন মদ্যপানে ডুবে থাকত। পরিবারটি ঠিক তেমন ছিল যেমনটি পালমার চেয়েছিল। অ্যানের বিধবা মা বারো হাজার পাউন্ডের সম্পত্তির মালিক। অ্যান আদালতের অভিভাবকত্বের কাতারে ছিল এবং সে প্রায় আট হাজার পাউন্ডের মালিক ছিল। তার দুইজন অভিভাবকের একজন ছিল পালমারের আগের মালিক ডাঃ টাইলকোট-এর আত্মীয়। সে এই বিয়েতে মোটেও রাজি ছিল না। কিন্তু পালমার সফলভাবে আদালতে অ্যানকে বিয়ে করার আবেদন করে। সবদিক থেকেই তাদের সম্পর্ক ছিল ভালোবাসাপূর্ণ। কিন্তু একটি জিনিসই তাদের সুখের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তা হলো একের পর এক সন্তানের মৃত্যু। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে তার চারটি সন্তানের মৃত্যু হয় রহস্যজনকভাবে প্রচণ্ড খিঁচুনি হয়ে। দুঃখের বিষয় হলো যে প্রত্যেকটি সন্তানের বয়স কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের বেশি ছিল না। শুধুমাত্র তাদের বড় ছেলে উইলি (Willy) বেঁচে ছিল। সন্তানদের মৃত্যুতে আবারও সে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান থেকে মোটা অংকের টাকা পায়।

পালমারের আত্মীয় এবং ঘোড়দৌড়ে বাজি ধরার সঙ্গীরাও সৌভাগ্যবান ছিল না। একদিন সে তার চাচা জোসেফ বেন্টলিকে (Joseph Bentley) তার বাড়িতে ডাকে। জোসেফ ছিল অত্যন্ত মদ্যপ ব্যক্তি, সারাক্ষণই কিছু না কিছু পান করেই যেত। পালমার তার মদ্যপানের ক্ষমতা দেখানোর জন্য প্রতিযোগিতায় নামতে বললে সে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যায়। এবারও পালমারের সাথে ব্র্যান্ডি পান

করাটা কাল হয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পান করার পরই তার শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। বমি ও খিঁচুনিতে ভুগে তিন দিন পর জোসেফ মারা যায়। তার মৃত্যুর পর তার ভাতিজা পালমার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রায় কয়েকশ পাউন্ডের মালিক হয়। ১৮৪৮ সালে সে তার শাশুড়িকে রুগেলিতে তাদের সাথে থাকার আমন্ত্রণ জানায়। যদিও সে ছিল অতিরিক্ত মদ্যপ। কিন্তু সে তার মেয়ের স্বামীকে ঘৃণা করত এবং খারাপ স্বভাবগুলোর সম্পর্কে অবগত ছিল। রুগেলিতে মেয়ের কাছে যাওয়ায় আগে সে তার এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছিল যে, "আমি জানি আমার সেখানে দুই সপ্তাহের বেশি থাকা উচিত হবে না"। তার ধারণাই সঠিক হলো। রুগেলি পৌছার দশদিন পরই সে মারা যায়। পালমারের আশপাশের সকলের মৃত্যুতে একবারও তার উপর কেউ সন্দেহ করেনি। এক্ষেত্রে অবশ্য তার অভিনয়পটুতাই তাকে রক্ষা করেছিল। প্রতিবেশীদের কাছে সে ছিল একজন সম্মানিত চিকিৎসক, নম্র-ভদ্র সুদর্শন পালমারকে সবাই দয়ালু ও ঈশ্বরভক্ত লোক হিসেবেই চিনত। সে নিয়মিত প্রতি রবিবার গির্জায় যেত। তার স্ত্রীও বিশ্বাস করত যে নিয়মিত ওষুধ দিয়ে এবং নিজ হাতে তার পথ্য তৈরি করে সে তার মাকে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল। পালমারের সন্দেহের উর্ধ্বে থাকার আরও একটি কারণ হলো যে সে স্থানীয় সম্মানিত চিকিৎসক ডাঃ বামফোর্ডের (Dr. Bamford) সাথে এব্যাপারে আলোচনা করেছিল। ৮০ বছর বয়সী বামফোর্ড সবসময় পালমারকে স্নেহ করত এবং তার গুণমুগ্ধ ছিল। পালমারের চিকিৎসাজ্ঞান সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিল। পালমার যখন তাকে বলেছিল যে, তার শাশুড়ির মৃত্যুর কারণ ইংলিশ কলেরা (English Cholera), সে তাই বিশ্বাস করে ডেথ সার্টিফিকেটে সই করে দিয়েছিল। তবে শাশুড়ির মৃত্যুতে পালমার যততা লাভবান হবে ভেবেছিল ততটা হয়নি। তার সম্পত্তি প্রায় শেষ হয়ে আসছিল এবং পালমার যা পেয়েছিল তা ছিল তার দেনা শোধ করার জন্য সমুদ্রে এক বিন্দু পানির সমান। এদিকে জুয়া খেলে তার দেনা ছিল প্রায় কয়েক হাজার পাউন্ড। বিখ্যাত আইনজীবী থমাস প্র্যাটের (Thomas Pratt) তার কাছে চার হাজার পাউন্ড পাওনা ছিল। প্যাডউইক ও রাইট (Padwick & Wright) নামক দুই সুদ ব্যবসায়ীর কাছে কয়েক হাজার পাউন্ডের মতো ঋণ ছিল। এরপর এক এক করে আত্মীয়স্বজন সরানোর চেষ্টা বজায় রাখে পালমার। তার এক চাচি অসুস্থ হয়ে পড়লে ওষুধ নিয়ে তার সাথে দেখা করতে গেলে সে ওষুধগুলো জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয় এবং তার কোনো ওষুধ গ্রহণ করতে অসম্মতি জানায়। পরদিন সকালে ওই ওষুধগুলোর কাছে তার চাচির ফার্মের কিছু মুরগি মৃত পাওয়া যায়। এর কারণ হিসাবে সে বলে যে মানুষের উপযোগী শক্তিশালী ওষুধ কিছু মুরগির পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। চাচিকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে এরপর সে তার বন্ধুদের দিকে মনোনিবেশ করে। এক ঘোড়দৌড় বাজিতে লিওনার্ড ব্ল্যাডেন (Leonard

Bladen) নামক এক ব্যক্তি তার কাছ থেকে ৮০০ পাউন্ড জিতে নেয়। সে ব্ল্যাডেনকে তার রুগেলির বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে কয়েকদিন থাকার জন্য। ব্ল্যাডেন যেদিন আসে সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। কিন্তু রাতে ঘুমাতে যায় পেটে ব্যথা নিয়ে। পরদিনই সে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পরে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। ব্ল্যাডেনের স্ত্রী তার অন্য বন্ধুর কাছে খবর পেয়ে রুগেলিতে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বামীর মৃতদেহ দেখার সুযোগ পায়নি। সে আরও বিমর্ষ হয়ে পড়ে যখন পালমার তাকে জানায় যে, তার স্বামীর কাছে মাত্র ১৫ পাউন্ড ছিল এবং তার আরও ৬০০ পাউন্ড প্রয়োজন দেনা মেটানোর জন্য। তার বন্ধুরা তাকে পুলিশের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিলেও সে পালমারের স্ত্রীর কথা ভেবে কোনো ঝামেলা করেনি। এর কিছুদিন পরই ব্লাই (Bly) নামের আরেকজন জুয়াড়ির প্রায় একইভাবে মৃত্যু হয়। পালমারের স্ত্রী তার বাড়িতে একের পর এক মৃত্যুতে মানসিকভাবে বেশ ভেঙে পরে এবং এব্যাপারে বলে, "গত বছর আমার মা এখানে মারা গিয়েছিল আর এখন এই মানুষগুলো। এই বাড়িতে এভাবে মানুষ মারা যেতে থাকলে লোকে কী বলবে?"

১৮৫৩ সালের শেষের দিকে পালমারের আর্থিক সঙ্কট ভয়াবহ বেড়ে যায়। ওকসে (Oaks) ঘোড়দৌড়ে দশ হাজার পাউন্ড জেতার জন্য সে নিজের ঘোড়া নেটলের (Nettle) উপর বাজি ধরে হেরে যায়। এদিকে প্র্যাট, প্যাডউইক ও রাইট তাকে ক্রমাগত দেনা শোধের জন্য চাপ দিচ্ছিল। যতই দেনা বেড়ে যাচ্ছিল, সে টাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছিল। এতোটাই মরিয়া হয়ে ওঠে যে, সে তার স্ত্রীকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি।

১৮৫৪ সালের জানুয়ারিতে যখন সে তার ৪র্থ সন্তানকে বিষপ্রয়োগ করে সে তার স্ত্রীর নামে ৩টি জীবনবীমার কাগজপত্র তৈরি করে যার মূল্য ছিল প্রায় ১৩ হাজার পাউন্ড। সে এ কাজগুলো প্র্যাট ও স্থানীয় এক আইনজীবী স্মিথের সাহায্যে করেছিল। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বেশ চড়া হারে অর্থ দিয়ে সে এইসব জীবনবীমা করে। কোনো প্রতিষ্ঠানই তার অর্থ উপার্জনের উৎস সম্পর্কে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি। এক্ষেত্রে প্র্যাট তাকে টাকা ধার দিয়েছিল। ৬০ বছর বয়সী স্মিথের সাথে তার মায়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল যা ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে সে এর পূর্বে তার মায়ের স্বাক্ষর জাল করে অনেক টাকা হাতিয়েছিল। বছরের শুরুতে বেশ ভালো থাকলেও সেপ্টেম্বরে আবারও আর্থিক সঙ্কটে পড়ে পালমার। তার স্ত্রী সন্তান হারিয়ে তখনো বিমর্ষ ছিল। তাই সে লিভারপুলে (Liverpool) এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। সে ফিরে আসার পরই পালমারের মাথায় এই জঘন্য বুদ্ধি আসে। ক্লান্ত অবস্থায় তার স্ত্রী যখন শুতে যায় সে তার সেবা করতে থাকে এবং ক্লান্তি দূর করার জন্য তাকে ওষুধ খেতে দেয়। তার স্ত্রী সরল বিশ্বাসে স্বামীর সেবা গ্রহণ করে যা খুব শীঘ্রই অ্যান্টিমনি

বিষক্রিয়ায় পরিণত হয়। এবার পালমার আরও সাবধানতা অবলম্বন করে। এবার সে শুধু ডাঃ বামফোর্ডকেই নয় আরও একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক এবং তার স্ত্রীর অভিভাবক ডাঃ নাইট (Dr. Knight) কে পরামর্শের জন্য ডাকে। তারা দুইজনই পালমারের চিকিৎসা সম্পর্কে আস্থাবান ছিল। তাই তার রোগনির্ণয়কে সন্দেহ করেনি। তারা তিনজন ডেথ সার্টিফিকেটে ইংলিশ কলেরাকে মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করে স্বাক্ষর করে। পালমার পুরো সময়টাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল যা দেখে মনে হচ্ছিল, সে এই মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত। কিন্তু সেদিনই সে তার বাড়ির পরিচারিকা এলিজা থার্মের (Eliza Tharm) সাথে রাত কাটায় এবং ঠিক নয় মাস পরই এলিজা একটি সন্তান জন্ম দেয়।

প্রথমে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান ২৭ বছর বয়সী একজন সুস্থ নারীর মৃত্যুতে সন্দেহ প্রকাশ করছিল। কিন্তু শহরের দুইজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের সাক্ষ্য থাকার কারণে তারা শেষ পর্যন্ত পালমারকে টাকা দিয়ে দেয়। টাকা পাওয়ার পর পরই সে ৮ হাজার পাউন্ড প্র্যাটকে এবং ৫হাজার পাউন্ড প্যাডউইককে দিয়ে দেয়। কিন্তু প্যাডউইক তার চাহিদা বাড়িয়ে দেয় এবং প্র্যাট বাকি পাওনা শোধ করতে পালমারকে চাপ দিতে থাকে। প্র্যাট তাকে আরও জীবনবীমা করে টাকা লাভ করার বুদ্ধি দেয় এবং প্র্যাটের সাহায্যেই সে তার পরবর্তি জাল ফেলে। এদিকে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের সন্দেহ এড়ানোর জন্য সে প্র্যাটের বুদ্ধি কাজে লাগায়। এবার সে তার ভাই ওয়াল্টারের জীবনবীমা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার ভাই ছিল একজন মদ্যপ ও দেউলিয়া। তার মদের খরচটাও তার স্ত্রী বহন করত। পালমার তার ভাইয়ের নামে মোট ৮২ হাজার পাউন্ড মূল্যের জীবনবীমা করার ব্যবস্থা করে ৬টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। পালমার তার ভাইকে বলেছিল যে যদি সে তার সাহায্য করে তাহলে সে তাকে প্রতি মাসে ৪০০ পাউন্ড করে দিবে যেন মদের জন্য তার স্ত্রীর উপর ভরসা না করতে হয়। ওয়াল্টার তাতেই খুশি হয়ে পালমারকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে যায়।

কিন্তু পালমারের সাথে আবারও জীবনবীমা নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান জড়াতে চাচ্ছিল না। প্রতিবারই যার জীবনবীমা করা হচ্ছিল সে অল্প সময়ে ভয়ংকর অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছিল। আবার সন্দেহ প্রকাশ করারও কোনো উপায় ছিল না। কেননা শহরের বড় বড় চিকিৎসকেরা পালমারের কথায় সায় দিচ্ছিল। ওয়াল্টারের চিকিৎসক ডাঃ ওয়াডেল (Dr. Waddell) জীবনবীমার আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করে আশ্বস্ত করেছিল যে, তার রোগী ওয়াল্টার শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ। তবে সে আরও একটি চিঠি যুক্ত করেছিল যেখানে লেখা ছিল, "অত্যন্ত গোপনীয় এর আবেদন দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে বাতিল করা হয়েছে। আমি খবর পেয়েছি যে, সে প্রচুর মদ্যপান করে। তার ভাই নিজের স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন আগেই কয়েক

হাজার টাকার জীবনবীমা করিয়েছিল। প্রথম কিস্তি পরিশোধের পরপরই সে মারা যায়। সাবধান থাকবেন।"

তবে প্র্যাট ও স্মিথের সহযোগিতায় এবং ডা. বামফোর্ড ও ডা. নাইটের সুপারিশে সে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন অংকের জীবনবীমা করাতে সক্ষম হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ৬৫,০০০ প্রাউন্ডের জীবনবীমা। এরপর সে ওয়াল্টারকে রুগেলিতে এসে থাকতে বলে। ওয়াল্টারকে সে প্রায় সারাদিনই জিনের নেশায় বুদ করে রাখত। ১৮৫৫ সালের জুলাইয়ে তার বাড়ি থেকে চলে আসার সময় ওয়াল্টারের দেহে প্রায় ১৯ গ্যালনের মতো মদ প্রবেশ করেছিল। আগস্টের ১৪ তারিখ পালমার ওয়াল্টারকে উলভার হ্যামটনের (Wolver Hampton) ঘোড়দৌড়ের মাঠে দেখা করতে বলে। সে আগে থেকে কিছু স্ট্রিকনিনও প্রুসিক এসিড (Prussic Acid) নিয়ে তৈরি ছিল। সেখানে সে ওয়াল্টারকে কয়েক বোতল জিন ধরিয়ে দেয়। এবারের মদগুলো ছিল বিষাক্ত। এর দুইদিন পরই নিজের বাড়িতে ওয়াল্টারের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ হিসেবে আবার ঘোষিত হয় ইংলিশ কলেরা। ওয়াল্টারের স্ত্রী তার সাথে থাকত না। সে দুঃসংবাদ পেয়ে ওয়াল্টারের বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই তাকে কফিনে ঢুকিয়ে ফেলা হয়।

ওয়াল্টারের মৃত্যুর পরপরই পালমার জীবনবীমার টাকার জন্য আবেদন করে। কিন্তু কোম্পানি ব্যাপারটি আরও খতিয়ে দেখতে চাইল। তারা তদন্ত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত টাকা দিতে না চাইলে পালমার ধৈর্য ধরাটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল। কিন্তু প্র্যাট টাকার জন্য অস্থির হয়ে যাচ্ছিল। তার তখনো পালমারের কাছে প্রায় ১১,৫০০ পাউন্ড পাওনা ছিল। সেপ্টেম্বরে সে পালমারের কাছ থেকে ৬,০০০ পাউন্ড দাবি করে বসলে পালমার টাকা পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। এবার সে তার বাগান বাড়ির পরিচারক জর্জকে (George) একজন ভদ্রলোক ও ধনী কৃষক হিসেবে বর্ণনা করে তার জীবনবীমা করানোর চেষ্টা করে। কিন্তু জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান এবার কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি। তারা সন্দিহান ছিল এবং তদন্ত করে দেখল যে, জর্জ এক কপর্দকহীন পরিচারক ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তারা পালমারের কথায় প্রায় ২৫ হাজার পাউন্ডের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছিল। তারা জর্জের জীবনবীমার ব্যাপারে পালমারকে সরাসরি না করে দেয়। তারা ওয়াল্টারের জীবনবীমার টাকা আটকে দেয় এবং বলে যে, এ টাকার আবেদন করলে তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা করা হবে। পালমার প্রচণ্ড বিপদে পড়ে যায়। এদিকে প্র্যাট টাকা না পেলে তাকে সর্বশান্ত করে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে। এমনকি তার মায়ের স্বাক্ষর জালিয়াতির জন্য তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দিলে পালমার বেশ ঘাবড়ে যায়। কেননা স্বাক্ষর জালিয়াতির পরিণাম সেও জানত। তার অবশ্য বিপদের শেষ ছিল না। কয়েক বছর আগে তার সাথে জেন বারগেস (Jane Burgess) নামের এক মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল এবং

মেয়েটি গর্ভবর্তী হয়ে পড়েছিল। সে স্ট্র্যাফোর্ডে তার গর্ভপাত করিয়েছিল। সে বোকার মতো মেয়েটিকে অনেকগুলো প্রেমপত্র দিয়েছিল। যদিও সে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিল। কিন্তু জেন এত বোকা ছিল না। সে তখন সেগুলোর মাধ্যমে পালমারকে হুমকি দিতে শুরু করে।

১৮৫৫ সালের ১৫ নভেম্বর পালমার তার এক বন্ধু জন পারসনস কুকের (John Parsons Cook) সাথে শ্রুসবারিতে (Shrewsburry) যায় ঘোড়দৌড়ের জন্য। ২৭ বছর বয়সী কুক তার বাবার উইল বলে প্রাপ্ত টাকা থেকে প্রায় ১২ হাজার পাউন্ড উড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। সে ৮০০ পাউন্ডের বাজি জেতার পর বোকামি করে পালমারকে ১২০০ পাউন্ড মূল্যের একটি বাজি জেতার কাগজ দেখায়। কুক তার জেতার খুশিতে সেখানকার র‍্যাভেন (Raven) হোটেলে একটি স্যাম্পেন পার্টি দেয়। কিন্তু পালমারের কাছ থেকে এক গ্লাস ব্র্যান্ডি খাওয়ার পর থেকেই সে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে যায়। সে তার সব টাকা তার এক বন্ধুর কাছে দিয়ে তাকে গোপনে বলে যে, "আমার বিশ্বাস ঐ শয়তান পালমার আমাকে কিছু খাইয়েছে।" তবে সে পালমারের উপদেশ অনুযায়ী পরদিন রুগেলিতে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে সে ট্যালবট আর্মস হোটেলে ওঠে, যার ঠিক বিপরীতেই ছিল পালমারের বাড়ি। মূলত পালমারকে চোখে চোখে রাখার জন্যই সে সেখানে এসেছিল। ১৬ নভেম্বর, শুক্রবার সে পালমার ও স্মিথের সাথে নৈশভোজ করে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়ে। পালমার তাকে নিয়মিত ওষুধ দিয়ে যাচ্ছিল। রবিবার সে কুকের জন্য স্যুপ পাঠায় হোটেলে যেন তা গরম করে কুককে দেওয়া হয়। সে পরিচারিকাটি সেই স্যুপ একটু চেখে দেখেছিল প্রায় পাঁচ ঘণ্টার জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কেউই স্যুপটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেনি। স্যুপটি কুকের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে কুকের অসুস্থতার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ডা. বামফোর্ডকে ডেকে আনা হয়েছিল। সোমবার কুক কিছুটা সুস্থ বোধ করা শুরু করে। এর কারণ হয়তো পালমার তখন শহরের বাইরে ছিল। সে কুকের ১,২০০ পাউন্ডের বাজির কাগজটি নিয়ে লন্ডনের টেটারসালসে (Tattersalls) গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে প্র্যাটকে ৫৫০ পাউন্ড দেয়। এরপর সে রুগেলিতে ফেরত এসে স্থানীয় ওষুধের ডিসপেনসারি থেকে তিন দানা স্ট্রিকনিন কিনে হোটেল ট্যালবট আর্মসের দিকে রওনা হয়।

সেদিন কুক প্রচণ্ড মনমরা ছিল। তার সাথে হোটেলের একজন পরিচারিকা এলিজাবেথ মিলস (Eligabeth Mills) সর্বক্ষণ ছিল এবং তার সেবা করেছিল। সে বলে, "তিনি সারাদিন বিছানায় আধশোয়া হয়ে বিছানার চাদর টানাটানি করেছেন। তার হাত পা মাঝে মাঝেই ঝাকুনি দিচ্ছিল, খিঁচুনি হচ্ছিল। মাঝে মাঝে প্রচণ্ডভাবে বিছানায় পড়ে গিয়ে আবারও উঠে চিৎকার দিয়ে উঠছিলেন "খুন, খুন।" প্রায় তিন চারবার এমনটি করেছেন।"

পরদিন সে পালমারের কাছ থেকে কোনো ওষুধ গ্রহণ করতে অসম্মতি জানায়। এদিকে পালমার ছিল অত্যন্ত ধূর্ত। সে লুটারওয়ার্থ (Lutter worth) থেকে কুকের নিজস্ব চিকিৎসক ডা. উইলিয়াম জোনসকে ডেকে আনিয়েছিল। সে ও ডা. বামফোর্ড মিলে তাকে বুঝিয়ে ওষুধ খেতে রাজি করায়। কুক ও তার চিকিৎসক দুজনেই ভেবেছিল যে, ওষুধগুলো ডা. বামফোর্ড তৈরি করেছে। তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল যে, ওষুধগুলো আসলে পালমার তৈরি করেছিল। এবারে সে আরও বেশি স্ট্রিকনিন মিশিয়েছিল প্রুসিক এসিডের সাথে। কুকের দীর্ঘদিনের এই কষ্ট প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। মঙ্গলবারের মধ্যরাতে কুকের বিছানার সাথে লাগানো ঘণ্টার অসংলগ্ন আওয়াজ শুনতে পেয়ে এলিজাবেথ ও তার সহকর্মী লাভিনা বার্নস (Lavina Barnes) ছুটে যায় কুকের ঘরে। কুকের অবস্থা তখন ছিল ভয়ংকর। প্রচণ্ড খিঁচুনীতে তার দেহ ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছিল। মানুষটি বিছানার সাথে শুধু তার মাথা ও গোড়ালির সংযোগ টিকে ছিল। ডা. জোনস ছুটে এসে তার ঘাড় মালিশ করতে লাগল। কুক শুধু পালমারের নাম নিয়ে চিৎকার করে যাচ্ছিল। এলিজাবেথ দৌড়ে গিয়ে পালমারকে ডাকতে গিয়ে তাকে সম্পূর্ণ সজ্জিত অবস্থায় পায়। পালমার তৎক্ষণাৎ এসে কুকের মুখে জোর করে আরও দুটি ওষুধ ঢুকিয়ে দেয়। অসহায় কুকের খিঁচুনী অত্যন্ত বেড়ে যায়। সে বিছানার উপর প্রায় লাফাতে থাকে। তার চোখ দুটি কোটর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, সে শ্বাস নিতে পারছে না। এরপর নিস্তব্ধ প্রাণহীন দেহটি বিছানায় পড়ে থাকে। সবাই অবাক হয়ে দেখল যে, পালমার কুকের পকেট হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। সেদিনই পালমার স্থানীয় পোস্টমাস্টারকে ঘুষ দিয়ে ৩৫০ পাউন্ডের একটি চেক জালিয়াতি করিয়েছিল, যাতে লেখা ছিল কুক পালমারকে ৩৫০ পাউন্ড দিচ্ছে। সে যখন আরও একটি জালিয়াতি দলিল বানাতে চায়, যেখানে লেখা থাকবে পালমার কুকের কাছে ৪ হাজার পাউন্ড পায়, তখন পোস্টমাস্টার স্যামুয়েল (Samuel) তাকে সাহায্য করতে অসম্মতি জানায়। বলে যে তাতে ঝুঁকি বেশি হয়ে যাবে।

পালমারের জন্য আরও বিপদ অপেক্ষা করছিল। ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার কুকের সৎবাবা উইলিয়াম স্টিভেনস (William Stevens) রুগেলিতে আসে। তার কাছে মৃতদেহের অবস্থা এবং তার পকেট হাতড়ানোর ব্যাপারটি অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লাগছিল। এছাড়া কুকের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার দাবি তার সন্দেহকে বাড়িয়ে দেয়। মৃত্যুর কারণ, অ্যাপোপ্লেক্সি (Apoplexy হঠাৎ মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিক মৃত্যু) তাকে সন্দিহান করে তোলায় সে একটি মামলা দায়ের করে মৃতদেহের ময়না তদন্ত দাবি করে। মৃতদেহ মর্গে রাখার ব্যবস্থা করে সে লন্ডনে আইনজীবীর সাথে আলোচনা করতে যায়।

কুকের পোস্টমর্টেম করে রুগেলির প্রসিদ্ধ সার্জন ডা. হার্ল্যান্ড (Horland)। সেখানে পালমার ও ডা. বামফোর্ডও উপস্থিত ছিল। এমনটি হয়তো কখনো ঘটেনি যে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে খুনি নিজে উপস্থিত থাকে। পালমার এই পোস্টমর্টেম বানচাল করার চেষ্টার ত্রুটি করেনি। সে সাহায্য করার ছলে কুকের পাকস্থলী ফুটা করে ফেলে। এরপর ব্রাস দিয়ে ভিতরের সব মিশিয়ে ফেলে যেন বিষের অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া যায়। ডা. হার্ল্যান্ড পালমারের কাজে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাকে কোনোরকম সাহায্য করা থেকে বিরত থাকতে বলে। সে সময় পালমার ডা. বামফোর্ডের কানে ফিসফিস করে বলছিল "তারা আমাদের এখনই ফাঁসি দিবে না।"

কুকের পাকস্থলি ও অন্ত্র আলাদা করে বোতলে রাখা হয়েছিল এবং সেগুলো রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই বোতল গুলি উধাও হয়ে যায়। ডা. হার্ল্যান্ড প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বোতল দুটি খুঁজলে পালমার তা বের করে দেয়। বোতলের বায়ু নিরোধক ঢাকনায় দুটি ফুটা করা ছিল। এরপরও সে হার মানেনি। সে পোস্ট অফিসের একটি ছেলেকে টাকা দিয়ে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে যেন সে স্টিভেনসের গাড়িকে আটকে দেয় যাতে বোতল নিয়ে যাওয়ার আগেই লন্ডনের ট্রেন ছুটে যায়। তবে ছেলেটি তাতে রাজি হয়নি। পালমার রিপোর্টের জন্য অস্থিরভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। রিপোর্টের ফলাফল কি হতে পারে সেটি তার চেয়ে ভালো কেউ জানত না। তার বন্ধু পোস্ট মাস্টার স্যামুয়েল তাকে যে কোনো চিঠি খুলে পড়তে দিত। তাই সে পোস্ট অফিসে পৌঁছার সাথে সাথেই রিপোর্টটি দেখে ফেলে। রিপোর্টে কোনো বিষ পাওয়া যায়নি, শুধুমাত্র অল্প পরিমানে অ্যান্টিমনি পাওয়ার কথা উল্লিখিত ছিল।

এবার পালমার শেষবারের মতো বাঁচার চেষ্টা করল। সে করোনারের কাছে চিঠি লিখল যে, সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে স্বাভাবিকভাবে কুকের মৃত্যু হয়েছে। চিঠির সাথে সে কিছু টাকা ও ঘোড়দৌড়ের টিকিট দিয়েছিল যার সবই করোনার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অতিরিক্ত ব্যাংক ঋণ ও জীবনবীমা কেলেংকারীর জন্য এমননিতেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। তাকে সাথে সাথে গ্রেপ্তার করে স্ট্রাফোর্ড কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার স্ত্রী অ্যান ও ভাই ওয়াল্টারের মৃতদেহ দ্রুত পোস্টমর্টেম করার ব্যবস্থা করা হয়। উভয়ের দেহেই বিষ পাওয়া গিয়েছিল। অ্যান্টিমনি ও প্রুসিক এসিডের সাথে স্ট্রিকনিনের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত বেশি। সারা লন্ডন রুগেলির পয়জনার (Rugeley Poisoner) সম্পর্কে কথা বলতে লাগল। মানুষ যা চিন্তাও করতে পারে না এমন কাজ সে অবলীলাক্রমে করে ফেলেছিল যা একই সাথে বিস্ময় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তার বিচারকার্য শুরু হয় লন্ডনের ওল্ড বেইলিতে (Old Bailey)। স্থানীয় বিচারকের মতে "পালমার এই এলাকায় জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিল এবং তার অনেক ব্যক্তিগত

যোগাযোগ ও বন্ধুবান্ধব আছে যে কারণে তার অপরাধের জন্য সাক্ষ্য পাওয়াটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।" ওল্ড বেইলিতে পালমারের বিচারকার্য শুরু হয় ১৮৫৬ সালের ১৪ মে। প্রতিদিনই কোর্ট প্রাঙ্গনে প্রচুর লোকের ভিড় হতো। এদের একটি বড় অংশ ছিল চিকিৎসক। সবার বিস্ময়ের বিষয় ছিল পালমারের পেশা। একজন চিকিৎসক কীভাবে এতটা ধূর্ত খুনি হতে পারে। এতটা ঠান্ডা মাথায় এমন পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের কথা তাদের চিন্তার বাইরে ছিল।

বিচারকার্যের প্রাধান ছিল অ্যাটর্নি জেনারেল স্যার অ্যালেকজান্ডার ককবার্ন (Attorney general Sir Alexander Cockburn)। বিচারকার্যে কুকের মৃত্যুর কারণ হিসেবে স্ট্রিকনিন প্রয়োগ বলা হলে পালমারকে হত্যাকারী প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও পালমারের স্ট্রিকনিন কেনার প্রমাণ ছিল। কিন্তু কুকের দেহে স্ট্রিকনিন পাওয়া যায়নি। এরপর একজন চিকিৎসক বলে যে, "কুকের পাকস্থলি যখন লন্ডন পৌছে সেটি খুব একটা ভালো অবস্থায় ছিল না। বায়ু নিরোধক ঢাকনায় ফুটো ছিল যার কারণে মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। যদি আগে থেকে ডা. হার্ল্যান্ড না বলতেন যে স্ট্রিকনিন আছে তাহলে কোনোভাবেই বের করা সম্ভব ছিল না।" ডা. হার্ল্যান্ডের কাছ থেকে আদালত জানতে পারে যে পাকস্থলীর বোতলটি পরে পালমারের কাছে পাওয়া গিয়েছিল।

তখনকার চিকিৎসাশাস্ত্র নতুন ধরনের বিষের ব্যাপারে খুব একটা উন্নত ওয়াকিবহাল ছিল না। অনেক বিশেষজ্ঞই এটি স্বীকার করেছে যে, পালমার বিষশাস্ত্রে তাদের ক্ষমতা ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং সে এটি নির্ণয় করার পদ্ধতি জানে। তবে পালমার এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি ছিল না। কুককে বিষ প্রয়োগের ব্যাপারে পালমারের বিরুদ্ধে বেশি জোরালো প্রমাণ ছিল না। অ্যাটর্নি জেনারেল এ ব্যাপারে মন্তব্য করে যে, পালমার অন্যান্য বিষের মাধ্যমে প্রথমে শিকারকে দুর্বল করে পরে অল্প পরিমাণে স্ট্রিকনিন দিয়ে হত্যা করত যেন স্ট্রিকনিনের খোঁজ না পাওয়া যায়। মে'র ২৭ তারিখ অ্যাটর্নি জেনারেল লর্ড চিফ জাস্টিস ক্যাম্পবেল (Lord chief Justic Campbell) সহ জুরি প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা করে পালমারকে খুনের দায়ে দোষী ঘোষণা করে। পালমার খুব স্বাভাবিকভাবে তার মৃত্যুদণ্ড মেনে নেয়। তাকে কড়া নিরাপত্তায় স্ট্র্যাফোর্ড কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারাগারে সে বার বার বলত যে, সে কুককে স্ট্রিকনিন দিয়ে হত্যা করেনি এবং সে নির্দোষ।

১৮৫৬ সালের ১৪ জুন স্ট্রাফোর্ড কারাগারের বাইরে প্রায় ৩০ হাজার লোকের ভিড় জমেছিল। আশপাশের সকল উঁচু স্থানেও লোকজন দাঁড়িয়ে ছিল এই ভয়ংকর বিষ প্রয়োগকারী পিশাচকে দেখার জন্য। মানুষের ভিড় সামলাতে পুলিশের বেশ কষ্ট হচ্ছিল যা দেখে পালমার বেশ আমোদিত হয়েছিল বলেই মনে

হচ্ছিল। তবে ফাঁসিরকাষ্টে তার মৃত্যুর ব্যাপারে তেমন চাঞ্চল্যকর কিছু ছিল না। তার বেশ কয়েকটি খুনের ব্যাপারে তখন পত্র পত্রিকায় বিস্তারিত লেখালেখি হয়। তার বিরুদ্ধে ১৬টি হত্যার অভিযোগ ছিল এবং একটির আলোকে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই ১৬টি হত্যাকাণ্ডের প্রত্যেকটির তথ্যপ্রমাণ নিবিড় তদন্তের মাধ্যমে সংগ্রহ করে আদালতে উপস্থাপন করা হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় বেশিরভাগ মৃতদেহ স্ট্রিকনিন ও অ্যান্টিমনির উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল। এর মধ্যে তার আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী, বৈধ ও অবৈধ সন্তান, ভাই এবং জুয়া খেলার সঙ্গিদের মৃতদেহও ছিল।

তবে এই ভয়ংকর কাহিনিতেও কিছু নির্মম পরিহাস রয়েছে। যে সব সুদ ব্যসসায়ীরা তার মৃত্যুর পর অনেক টাকা পেতে পারত তাদের কেউই কিছু পায়নি কেননা পালমারের মা জালিয়াতির শিকার হওয়ার কোনো সম্মানি নিতে অস্বীকার করে। এরপর যখন রুগেলিবাসী এই কুখ্যাত নরপশুর কর্মকাণ্ডে লজ্জিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে শহরের নাম বদলে দেওয়ার দাবি করে, তিনি বাধ্য হয়ে জবাব দেন যে, " By all means, provided you name your town after me" নির্মম পরিহাসটি হলো এই যে প্রধানমন্ত্রীর নাম ছিল লর্ড পালমারস্টন (Lord Palmerston)।

দ্য মার্ডারাস মিউজিশিয়ান

কোনো মানুষ কি শান্তভাবে কোর্টের পাবলিক গ্যালারিতে স্বস্তিতে বসে থাকতে পারে যখন তার করা হত্যাকাণ্ডের দায়ে অপর একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে সাজা শোনানো হয়? চার্লস পিস (Charles Peace) সেটি পেরেছিল। তবে দুই বছর পর যখন আরও একটি খুনের দায়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, সে তখন একজন যাজকের কাছে সবকিছু খুলে বলে দোষ স্বীকার করেছিল এবং সেই নির্দোষ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। এই পাষাণ-হৃদয় অপরাধী তার সারাটি জীবনই বিভিন্ন অপরাধ করে কাটিয়েছে। নিজের সম্পর্কে সে বলে, "যদি আমি কোনো কিছুর দিকে মনস্থির করি, আমি সেটা পেতে বাধ্য।" এটিই তার অপরাধ জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। প্রায় বিশ বছর ধরে সে মনস্থির করে রেখেছিল যে, সে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে ধূর্ত চোর ও জালিয়াত হবে এবং সে সফল হয়েছিল।

পিসের জন্ম ১৮৩২ সালের ১৪ মে শেফফিল্ডে (Sheffield)। তার পিতা জন পিস (John Peace) জাহাজে চাকরি করত। এরপর পশুপাখিকে পোষ মানাতে দক্ষ হওয়ায় ওম্বওয়েলস ওয়াইল্ড বিস্ট শো (Wombwell's wild beast show) তে যোগদান করে। বিয়ের পর শেফফিল্ডে এসে বসবাস করার কারণ ছিল সিংহের হাতে তার বড় পুত্রের মৃত্যু। পিস ছিল চারজনের পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। ১৮৪৬ সালে পিসের সাথে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। সে একটি রোলিং মিলে কাজ করত। একদিন অত্যন্ত গরম লোহার একটি শিক তার হাঁটুর ঠিক নিচে গেঁথে যায়। প্রায় ৮ মাস চিকিৎসার পরও সে সারাজীবনের জন্য খোঁড়া থেকে যায়। এই দুর্ঘটনায় সে তার হাতের দুটি আঙুলও হারিয়েছিল। এর মধ্যে তার পিতা মারা গেলে সংসারের দায়দায়িত্ব নিতে হয় তাকে। তার অপরাধ জীবনের সূচনা ১৮৫১ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে। শেফফিল্ডের এক স্থানীয় মহিলার বাড়িতে সে চুরি করে এবং ধরাও পড়ে। তাকে গ্রেপ্তার করে কিছুদিনের জন্য জেলে রাখা হয়। এরপর সে গান বাজনার মধ্যে ডুবে যায়। ছোটখাটো খোঁড়া মানুষটি দেখতে নমনীয় হলেও অসম্ভব রকমের শক্ত ছিল। হাতের আঙুলের স্থানে সে দুটি কৃত্রিম হুক ব্যবহার করত। ধীরে ধীরে সে ভায়োলিন বাদক হিসেবে সুনাম অর্জন করতে থাকে। স্থানীয় "দ্য মডার্ন পাগানিনি" (The Modern

Paganini) নামক অনুষ্ঠানে সে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে। তবে কেউ জানত না যে, এই শিল্পী গভীর রাতে ঘাগু চোরে পরিণত হয়। ১৯৫৪ সালে সে বেশ কয়েকটি বাড়িতে চুরি করে এবং দেরিতে হলেও ধরা পড়ে। সে ছাড়া পেয়ে আবারও ভায়োলিন বাদক হিসেবে কাজ শুরু করে, তবে সে চোরই থেকে যায়। সে ম্যানচেস্টার (Manchester) গিয়ে তার অপকর্মগুলো করতে থাকে। সেখানে ১৮৫৯ সালের ১১ আগস্ট আবারও একটি বনেদি বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। এবারে তাকে ছয় বছরের সাজা দেওয়া হয়। ১৮৬৪ সালে জেল থেকে মুক্ত হয়ে সে শেফফিল্ডে ফিরে যায়, তবে ব্যর্থ হয়ে আবার ম্যানচেস্টারে ফিরে আসে। ১৮৬৬ সালে তাকে আবারও ধরা হয়। কিন্তু দিন দিন তাকে ধরা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল। সে খোঁড়া হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত নমনীয় ও একই সাথে শক্তিশালী ছিল। বানরের মতো ঝুঁকে ঝুঁকে এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফ দিয়ে রাতের আঁধারে অদৃশ্য হয়ে যেত। তার চুরির যন্ত্রপাতিগুলো থাকত ভায়োলিনের বাক্সে। যার ফলে প্রথমত কেউ তাকে সন্দেহ করত না।

খুনি চার্লস পিস

১৮৫৯ সালে সে হান্নাহ ওয়ার্ড (Hannah Ward) নামক এক বিধবাকে বিয়ে করে। ১৮৬৬ তে যখন সে আবারও ধরা পড়ে তার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করার সময়। তবে তার অপরাধ জীবন সংসারজীবনকে হেয় প্রতিপন্ন করতে বাধ্য করত। সে বছর ডিসেম্বরের ৩ তারিখ সে ওয়েকফিল্ড (Wakefield) কারাগার থেকে পালানোর চেষ্টা করে। একটি টিনের যন্ত্রের মাধ্যমে সে তার প্রকোষ্ঠের ছাদে একটি ফুটা করে। কারাগারে তখন কিছু মেরামত কাজ চলছিল যেখান থেকে সে একটি দড়ির মই চুরি করতে সক্ষম হয়। মই বেয়ে সে যখন ছাদের ফুটো দিয়ে বের হতে যাচ্ছিল, তখনই একজন কারারক্ষী তাকে দেখে ফেলে। সে অমানুষিক শক্তি দিয়ে ঘুষি মেরে রক্ষীকে অজ্ঞান করে পালায়। সে দৌড়ে কারাগারের মেরামত কাজের কাছাকাছি চলে যায়। দেওয়ালের ইট খসে পড়ায় সেখানে কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল। সে অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে সেখান থেকে দেওয়াল টপকে পালায়। তার ওপাড়ে ছিল গভর্নরের বাসা। সেখানে গিয়ে সে কাপড় পাল্টায়। দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করে আরও একটি সুযোগের জন্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকে আবারও গ্রেপ্তার হতে হয়। এরপর সে ছাড়া পায় ১৮৭২ সালে। এরই মধ্যে তার মিলব্যাংক (Milbank), চ্যাথাম (Chatham) এবং জিব্রাল্টার (Gibraltar) প্রমুখ কারাগারে সাজা খাটা হয়ে গিয়েছিল।

১৮৭২ সালে সে স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে শেফফিল্ডে ফিরে আসে। তার ছেলে উইলি (Willie) কে সেখানকার সানডে স্কুলে (Sunday School) ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখানেও সে তার অপকর্ম ছাড়েনি। এতবার সাজা খেটেও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ১৮৭৫ সালে সে শেফফিল্ডের ডারনাল (Darnall) এলাকায় বসবাস করা শুরু করে। সেখানে সে আর্থার ডাইসন (Arthur Dyson) নামক এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কাজ শুরু করে। তার বাসায়ই ভাড়া থাকত এবং প্রতিদিন তার সাথেই কাজে যেত। পিসের বয়স তখন ছিল ৪০ এবং দেখতে যথেষ্ট কুৎসিত চেহারার হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে যেন সে নারীদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হতো।

সে তার বাড়িওয়ালার স্ত্রী মিসেস ক্যাথেরিন ডাইসনের (Mrs. Katherine Dyson) সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। পিসে তাকে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন পানশালায় নিয়ে যেত তার তীব্র মদ্যপানের পিপাসা মেটাতে। এরপর কাছাকাছি কোনো নির্জন বাড়িতে নিয়ে যেত তার নিজের যৌনক্ষুধা মেটাতে। খুব শীঘ্রই পিস এ ব্যাপারে অসাবধান হওয়া শুরু করল এবং যখনই মন চাইত সে ক্যাথেরিনকে ডেকে নিয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি আর্থার জানতে পারে। আর্থার ছিল প্রায় ৬ ফুট লম্বা বিশালদেহী পুরুষ। সে পিসকে মারধর করে তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

পিসের এই অপমান সহ্য হলো না। তার আরও ক্ষুধা বেড়ে গেল ক্যাথেরিনের চিঠি পেয়ে। সেখানে লেখা ছিল "সে আমাদের বিরক্ত করার জন্য যা করছে আমি বলে বোঝাতে পারব না। রাতে সে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরপর জানালার বাইরে দেখে যে কেউ আছে কি না। সে সর্বদাই হামাগুঁড়ি দিয়ে দেখে যে কোথাও তুমি লুকিয়ে আছ কিনা যেন সে তোমাকে হামলা করতে পারে।"

আর্থার পুলিশের কাছে পিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তাকে হুমকি দেওয়া হয় যেন এমনটি আর করার সাহস না পায়। তারপরও সে হার না মানলে ১৮৭৬ সালে তার নামে অ্যারেস্ট অব ওয়ারেন্ট জারি করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া থেকে বাঁচতে সে দ্রুত শহর ছেড়ে হালে (Hull) পালিয়ে যায়। পিস নিখোঁজ হওয়া সত্ত্বেও আর্থার বাড়ি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা একলেসাল রোডে অবস্থিত ব্যানার ক্রস টেরাসে (Banner Cross Terrace, Ecclesall Road) একটি বাসা কিনে। সে ভেবেছিল এখানে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারবে কিন্তু তা আর হলো না। যখন তারা সেখানে পৌঁছে পিস বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সহাস্যে বলে, "আমি এখানে তোমাদের বিরক্ত করতে এসেছি এবং যেখানেই যাও না কেন আমি তোমাদের বিরক্ত করতেই থাকব।"

২৯ নভেম্বরের সন্ধ্যায় ক্যাথেরিন বাসা থেকে বের হয় বাইরে হাঁটাহাঁটি করার উদ্দেশে। পিস ঝোপঝাড়ের মধ্যে সন্ধ্যার ছায়ায় ঘাঁপটি মেরে ছিল। তার হাতে একটি বন্দুক ছিল, উদ্দেশ্য ছিল ক্যাথেরিনকে হত্যা করা কেননা সে তার শারীরিক চাহিদা মেটানোর প্রস্তাব উপেক্ষা করেছিল। অস্ত্রহাতে পিসকে দেখে ক্যাথরিনের আর্তচিৎকার শুনে তার স্বামী দোকান থেকে দৌড়ে আসে এবং পিসকে তাড়া করে। দৌড়াতে দৌড়াতে সে রাস্তা ছেড়ে বাড়ি ঘরের পেছন দিকে চলে যায় ও দুইবার গুলির আওয়াজ শোনা যায়। পিস পালাতে সক্ষম হয়, সে আর্থারকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে পালিয়ে যায়। এসময় তার পকেট থেকে ক্যাথেরিনের লেখা চিঠির বান্ডিল পড়ে যায় আর্থারের মৃতদেহের পাশে। পুলিশ পিসের উপর ১০০ পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করে। এরপরও সে পালাতে সক্ষম হয়। এক শহর থেকে আরেক শহরে চুরি করতে করতে শেষপর্যন্ত সে পেকহ্যামের এভলিনা রোডে (Evelina Road, Peckham) একটি বাড়িতে স্থিতু হয়। এখানে সে ছদ্মনামে বসবাস করতে থাকে। এখানে জীবন ছিল অত্যন্ত অস্বাভাবিক, তার স্ত্রী ও ছেলে থাকত ভূগর্ভস্থ স্টোররুমে। ওপরতলার ঘরে সে অন্য একজন নারীকে নিয়ে থমসন দম্পতি (Mr. and Mrs Thompson) হিসেবে বাস করতে থাকে। মিসেস থমসন যাকে সবাই তার স্ত্রী হিসেবে জানত আসলে সে ছিল তার উপপত্নী এবং অপকর্মের সঙ্গী। তাদের কাজ ছিল কিছুদিন পর পর গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ও নতুন নতুন বন্ধু জোটানো। তারা

প্রত্যেক রবিবার গির্জায় যেত এবং প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখত। কিছু দিনের মধ্যে তারা সবার প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। এর মধ্যে তাদের একটি ছোট্ট ছেলে হয়।

পিস খুব শীঘ্রই ঐ এলাকায় একটি সম্মানিত অবস্থানে পৌঁছে গেল। সে সব সময় বলত, "যারা ভালো পোশাক পরে, পুলিশ তাদের কখনো সন্দেহ করে না।" পেকহ্যামে আসার পরপরই সে তার ধূসর চুল কালো রং করে ফেলল, দাড়ি গোঁফ সব কামিয়ে চেহারার ভোল পাল্টে ফেলল। আগের কুশ্রী পিস এখন ফিটফাট ভদ্রলোক। তবে তার স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হলো না। দিনের বেলা সে লন্ডনের বিভিন্ন রাস্তায় গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াত এবং মানুষের ফেলে দেওয়া জিনিস সংগ্রহ করত। কিন্তু রাতের বেলা সে একই রাস্তা দিয়ে ঘুরে সেসব মানুষেরই বাড়ির ভেতর ঢুকে তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করত। পত্রপত্রিকায় প্রতিদিনই তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ ছাপা হতে থাকল। শহরবাসীর প্রশ্ন এবং আতঙ্ক বেড়েই চলছিল। কিন্তু পুলিশ তখনো খুঁজে বের করতে পারছিল না যে কে হতে পারে এই দুঃসাহসী চোর। পিসের ত্রাস সন্দেহের তালিকায় একদমই ছিল না। পিস সব সময়ই বাস, ট্রেন এবং চলাফেরার পথে দেখা হওয়া পুলিশ অফিসারদের সাথে বেশ খোশগল্প করত। এমনকি ব্রিস্টলে থাকা অবস্থায় সে একজন পুলিশ অফিসারের সাথে একই বাড়িতে থাকত।

কিন্তু ১৮৭৮ সালের ১০ অক্টোবর তার সৌভাগ্য তার সঙ্গ ছেড়ে দিল। সে রাতে ব্ল্যাকহিথ (Blackheath) এ অবস্থিত একটি বনেদি বাড়ির চারপাশে পুলিশ পাহারা বসিয়েছিল। রাত দুইটার দিকে পিস হাতে একটি বড় রুপার ফুলদানি, একটি রুপার চিঠির বাক্স এবং কয়েকটি চেকবুক হাতে নিয়ে সে বাড়ি থেকে বের হলো। সাথে ছিল তার সেই ভায়োলিনের বাক্স। পুলিশ যখন তাকে হাতে নাতে ধরে, চকিতের মধ্যে সে বন্দুক বের করে অফিসারদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করল। তারপরও অফিসাররা তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে সে পরপর চারটি গুলি ছুড়ে, কিন্তু প্রত্যেকটি লক্ষ্যচ্যুত হয়। পঞ্চম গুলিটি গিয়ে লাগে পিসি এডওয়ার্ড রবিনসনের (PC Edward Robinson) হাতে, কিন্তু সেটাকে উপেক্ষা করে সে তার সহকর্মীদের সাথে পিসকে ধরতে সফল হয়। পিসকে গ্রেপ্তার করার পরে সে তার নাম বলে জন ওয়ার্ড (John Ward)। ব্ল্যাকহিথের পুলিশরা তাকে আগে থেকে না চেনায় তার ভুল নামেই চুরি এবং খুনের প্রচেষ্টার মামলা দায়ের করে। ওল্ড বেইলী জুরি (Old Bailey Jury) তাকে অপরাধী ঘোষণা করে সাজা শোনাতে চার মিনিটের বেশি সময় নেয়নি। সে কাঁদোকাঁদোভাবে হাজার বার তার দুর্দশাগ্রস্ততার কথা বলার পরও বিচারকগণ তাকে ক্ষমা করেনি। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এদিকে পিসের নামে শেফফিল্ডে যে একশো পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, তা লাভ করার জন্য

তার উপপত্নী পুলিশের কাছে তার আসল পরিচয় ফাঁস করে দেয়। পুলিশ ক্যাথরিনকে আমেরিকায় তার গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে আসে। তার স্বামীর মৃত্যুর পর সে সেখানেই ছিল। সে আসার পরে পিসের উপর একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।

১৮৭৯ সালের ২২ জানুয়ারি তাকে দুইজন পুলিশের পাহারায় হাতকড়া পরিয়ে ভোর পাঁচটার ট্রেনে লন্ডন থেকে শেফফিল্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সম্পূর্ণ যাত্রাপথে সে বিভিন্নভাবে পালানোর চেষ্টা করে গেছে। ট্রেনটি যখন ইয়র্কশায়ারে পৌঁছে সে আচমকা জানালা দিয়ে বাইরে লাফ দেয়। পুলিশ সাথে সাথে ট্রেনটি থামিয়ে তার পলায়ন পথের দিকে দৌড়ে যায়। প্রায় ১ মাইল যাওয়ার পরে পুলিশ তাকে বরফের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখে। সে তখন অচেতন অবস্থায় ছিল। এরপর তাকে শেফফিল্ডে নিয়ে নির্জন কারাগারে রাখা হয়। তার কারা প্রকোষ্ঠ সার্বক্ষণিক পাহারায় ছিল, যেন সে কোনোভাবেই পালাতে না পারে। এরপর তাকে বিচারকাজের জন্য লিডসে (Leeds) পাঠানো হয়। তার মামলা শুনানির সময়কাল খুব বেশি হলে বারো থেকে পনেরো মিনিট লেগেছিল। সকল অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হওয়ায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যুর আগপর্যন্ত কারাগারে তার দিনগুলো কাটে বিভিন্ন মানুষের কাছে নৈতিকতা বিষয়ক চিঠি লিখে এবং প্রার্থনা করে। সে কারাগারের যাজক রেভ জেএইচ লিটলউড (Rev J.H.Littlewood)-এর কাছে স্বীকার করেছিল যে আর্থারকে হত্যার চার মাস আগে সে আরও একটি খুন করেছিল। ম্যানচেস্টারের হোয়েলি রেঞ্জে (Whalley Range, Manchester) ডাকাতি করার সময় যে পুলিশ অফিসার তাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল তাকে সে গুলি করে হত্যা করে। এ ছাড়া সে আরও একটি ঘটনার আলোকপাত করেছিল। সে বলছিল যে ম্যানচেস্টার অ্যাসাইজেস (Manchester Assizes)-এর গ্যালারিতে সে সেইদিন বসা ছিল যখন দুইজন আইরিশ ভাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছিল। সেটি ছিল ২৮ নভেম্বর, আর্থারের মৃত্যুর একদিন আগে। ১৮ বছর বয়সী উইলিয়াম হ্যাব্রন (William Habron) কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছিল এবং সে চুপচাপ বসে তা দেখছিল। সে জানত যে ছেলেটি নির্দোষ। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে সে কেন চুপ ছিল, সে বলে, "আমার স্থানে থাকলে মানুষ আর কী করত?" ১৮৭৯ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮ টায় ৪৬ বছর বয়স্ক হ্যাব্রনকে ৮০০ পাউন্ড জরিমানা করে মুক্তি দেওয়া হয়। কেননা পিস হ্যাব্রনের দায় স্বীকার করে তার স্থানে সাজা কাঁটতে রাজি হয়েছিল। এ ব্যাপারে সে যাজকের কাছে নাটকীয়ভাবে তার স্বীকারোক্তি দেয়।

যেদিন তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা, সকালে নাস্তার পর অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলে যে তাকে কাঁচা মাংস দেওয়া হয়েছে। এরপর যাজকের সাথে দেখা করতে চায়। যাজক আসলে হ্যাব্রনের দায় স্বীকার করার পর সে বলে,

"স্যার, আমার সবচেয়ে বড় ভুল কী জানেন? সেটি হলো আমার সমস্ত কর্মজীবন কাটিয়েছি গোল কার্তুজ ব্যবহার করে। যেখানে আমাকে খালি বন্দুক রাখা উচিত ছিল।" এরপর সর্বশেষ বক্তৃতা হিসেবে সে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস এবং ধর্ম সম্পর্কে সকলকে উপদেশ দেয়। তাকে যখন লিডসের আর্মলে কারাগারের (Armley Jail, Leeds) ফাঁসির মঞ্চে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল কোনো কৌতুক হচ্ছিল তার সাথে। ফাঁসির আগমুহূর্তে যখন তার মুখ কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছিল সে জল্লাদকে বলে, "আমি এখন একটু পান করতে পছন্দ করব। আপনার কাছে কি কোনো পানীয় আছে?" কোনো কথা না বলে তার মুখ ঢেকে দেওয়া হয়। অতঃপর তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তার কারা প্রকোষ্ঠে সে নিজের সমাধি তৈরি করে রেখে গিয়েছিল, লেখা ছিল "For what I done, but never intended."

দ্য ট্রায়াঙ্গুলার চেম্বার অফ ডেথ

খুব কম মানুষের পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহাপ্রলয়ের মাঝে বিস্তর টাকা পয়সা উপার্জন করা সম্ভব হয়েছিল। ব্যাপারটি ছিল দুঃসাধ্য আর খুনিদের জন্যে তো তা ছিল একেবারেই অসাধ্য। এরকম যুদ্ধবিগ্রহের তান্ডবেই অসাধ্যকে জঘন্যভাবে সাধ্য করতে সক্ষম হয়েছিল ডাঃ মার্সেল পেটিয়ট (Dr. Marcel Petiot)। তার মত খুব কম অপরাধীই সে সময় হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে এতটা ধনশালী হতে পেরেছিল। ১৯৪৬ সালের ২৬মে'র সকালে গিলোটিনে তার শিরচ্ছেদ করাকালে সে প্রায় দশ লাখ পাউন্ডেরও বেশি অর্থের মালিক ছিল। তার পাপের সে কালিমাখা এই অর্থ ব্যয় করার জন্য বেশ কয়েকবার জেল ভেঙে পালানোর চেষ্টাও করেছিল ৪৯ বছর বয়সী এই চিকিৎসক।

চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নটা ছিল তার ছোটবেলা থেকেই। তবে তার উদ্দেশ্যটা আসলে সেবা মূলক ছিল না। ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে ধর্ষকামী ও নিষ্ঠুর আচরণের আভাস পাওয়া যায়। তার জন্ম ও বসবাস ছিল অক্সেরিতে (Auxerre)। ছোটবেলায় তাকে প্রায়ই দেখা যেত গবাদিপশুদের নির্মমভাবে অত্যাচার করতে। এমনকি তার প্রতিবেশী ছোট ছোট বাচ্চাদেরও সে ছাড়ত না। তাদের প্রতি তার আচরণ ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময়টা তার কাটে ডিজনের (Dijon) এক দূর্ঘটনাপ্রবণ স্টেশনে। তার কাজ ছিল মরফিয়ার (morphia, মাদকদ্রব্য) চোরাচালান করা এবং স্থানীয় মাদকাসক্তদের কাছে তা বিক্রি করা। সেখানেই সে চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সাথে পরিচিত হয় এবং চিকিৎসক হবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯২১ সালে সে ডাক্তার হিসেবে পড়াশোনা শেষ করে এবং ভিলেনিয়াভ সার-ইয়োনেতে (Villeneuve Sur-Yonne) হাতযশ করা শুরু করে দেয়।

চিকিৎসকদের জীবনের মূলনীতি/লক্ষ্য থাকে মানুষের সেবা করা। এই শপথকে জলাঞ্জলি দিয়েই মার্সেল তার জীবনকে বিলাসবহুল করার প্রয়াস চালাতে থাকে। একদিকে সে ধনী রোগীদের কাছ থেকে তিনগুণ চারগুণ বেশি অর্থ আদায় করত। অপরদিকে অত্যন্ত গরিব রোগীদের চিকিৎসা করত বিনামূল্যে। খুবই

শীঘ্রই গ্রামবাসী বুঝে গেল যে, মাদকের নেশায় উন্মাদনা থেকে রক্ষা ও অবৈধ গর্ভপাতে সহায়তা করতে মার্সেলই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তার কাছে মাদকের কোনো অভাব ছিল না। তার চরিত্রে কোনো নীতির লেশমাত্র ছিল না বিধায় তাই অবৈধ ও অসামাজিক কার্যকলাপ তার কাছে কিছুই মনে হতো না। তারপরও তার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। তার সুন্দরী পরিচারিকার হঠাৎই গর্ভবতী হওয়ার পর উধাও হয়ে যাওয়া এবং রাত-বিরেতে এই 'ভালোমানুষ' ডাক্তারের বাড়ি থেকে যন্ত্রণাকাতর আওয়াজ শুধু মাত্র অলস গুজবই ছড়াল। তার জনপ্রিয়তার ভাঁটা পড়ার মতো গুজব সৃষ্টি না হয়ে বরং তার সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় হলো। দরিদ্র ও মাদকাসক্তরা ডাক্তারকে ঈশ্বরতুল্য মনে করত। শীঘ্রই তাকে এলাকার মেয়র পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য মনোনীত করা হলো।

কিন্তু ১৯৩০ সালে ভিলেনিয়াভের জীবন কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ল। তার এক রোগী হঠাৎ করে মারা গেলে সন্দেহ পড়ে মার্সেলের উপর। সেই রোগী ছিল স্থানীয় ব্যবসায়ী। প্রথমে তার দোকানে ডাকাতি হয় এবং এরপর তাকে রাস্তায় ছিনতাই করে হত্যা করা হয়। মার্সেলকে সন্দেহ করা হলেও তার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। এর কিছুদিন পর আরও একটি খুন হয়। এবারের শিকার ছিল মার্সেলের আর একজন রোগী যে কিনা মার্সেলের উপর দোষারোপ করেছিল। সে তার রিউমেটিসমের চিকিৎসা করাতে নিয়মিত মার্সেলের কাছে আসত। তার হঠাৎ মৃত্যুর পর মার্সেল ডেথ সার্টিফিকেটে 'স্বাভাবিক মৃত্যু' লিখে দেয়। তার উপর আবারও সন্দেহের উদ্রক হওয়ার আগেই সে প্যারিসের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

প্যারিসেও একইভাবে তার জীবন চলতে থাকে। মাদকাসক্তদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মাদক সরবরাহ এবং গর্ভপাত করা তাকে আবারও বেশ জনপ্রিয়তা এনে দেয়। বেশ কিছু অনুগত শাগরেদ ও নিয়মিত রোগী জুটে যায় তার। ৬০ নং রিউ কমারটিনে (60 Rue Caumartin) তার ব্যবসা বেশ জমে উঠছিল। ধীরে ধীরে তার ব্যবসা শহরের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসার একটিতে পরিণত হয়। সেও একজন যোগ্য নাগরিকের ভাবমূর্তি ধরে রেখেছিল। সবার কাছে সে ছিল একজন আদর্শ স্বামী ও পিতা। প্রতি রবিবারেই সে চার্চে যেত। তার এরকম আদর্শ ভদ্রলোকের মুখোশই তাকে প্রত্যেকবার বাঁচিয়ে দিত। এই মুখোশের আড়ালেই সে অবাধে চালিয়ে যেত তার মাদকদ্রব্যের ব্যবসা। তার বাইরের রূপ ও সামাজিক অবস্থানই তাকে মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত অপরাধে বিভিন্নভাবে সাজার হাত থেকে রক্ষা করেছে। একবার এক মহিলা যে কিনা দাবি করছিল যে, মার্সেল তার মেয়েকে মাদকাসক্ত করেছে। কিছুদিন পর হঠাৎই সে নিখোঁজ হয়ে যায়। সন্দেহ মার্সেলের উপর পড়লেও এবারেও সে বেঁচে যায়।

খুনি ডাঃ মারসেল পেটিওট

১৯৪০ সালে নাৎসি সেনারা প্যারিসে ঢুকে পড়ে। এ সুযোগটি মার্সেল অত্যন্ত ভালোভাবে কাজে লাগায়। তার এই অশুভ পদক্ষেপ তার অর্থের প্রতি আসক্তি এবং তার ধর্ষকামী কামবিকৃতিকে আরও প্রকট করে তোলে। এদিকে দেশের অবস্থা ভালো ছিল না। জার্মান গুপ্ত পুলিশের তৎপরতায় প্যারিস পরিণত হয়েছিল আতঙ্কের শহরে। দলে দলে ইহুদিরা হারিয়ে যেতে লাগল কনসানট্রেশন ক্যাম্পের গ্যাস চেম্বারে (Concentration Camp's Gas Chamber, এভাবে বহু ইহুদিদের হত্যা করা হয়েছিল)। সুস্থ ও নীরোগ ফ্রেঞ্চ পুরুষদের বাধ্যতামূলকভাবে যেতে হচ্ছিল লেবার ক্যাম্পগুলোতে (Labour Camp)। বাকি যারা রয়ে গিয়েছিল তারা দ্রুতই শিখে গেল যে তাদের নিখোঁজ বন্ধুদের সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করে লাভ নেই বরং তার মূল্য দিতে হতে পারে। এই দুরবস্থাটিই মার্সেলের জন্য ছিল সৌভাগ্যের প্রসূতি ঠিক যেমনটি সে চেয়েছিল। সে ২১, রিউ লিসুইয়ারে (21, Rue Lesueur) জলের দামে একটি বিশাল বাড়ি কিনে ফেলে। এরপর সে তার মন মতো করে তার অশুভ উদ্দেশ্যের

উপযোগী করে বাড়িটিকে সাজাতে শুরু করে। সাজানো বলাটা হয়তো অনুচিত কেননা এর মধ্যে ছিল না কোনো সৌন্দর্য্য। নিষ্ঠুরতা ও কলুষতা ছাড়া এতে আর কিছুই ছিল না। সে বাড়িটিতে একটি ত্রিকোণ ঘর তৈরি করে যেখানে কোনো জানালা ছিল না এবং ঘরটি ছিল সম্পূর্ণরূপে শব্দনিরোধক। পুরো ঘরটিতে ছিল একটি মাত্র দরজা। ঘরটির দরজায় ছিল কয়েকটি ছোট ছোট ফুটো। সে মিস্ত্রিদের বলেছিল যে ঘরটি তার মানসিক রোগীদের জন্য তাই এসব ফুটো প্রয়োজন। এভাবে চিকিৎসার কথা বলে সে গ্যারজে একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড ও হাপর লাগানোর ব্যবস্থা করে। সময়টি ছিল ১৯৪১। বড়দিনের আগেই তার বাড়িটি তার মতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।। এরপর শুরু হলো তার আসল খেলা। সে শহরে গুজব ছড়াল যে, সে ফ্রেঞ্চ রেজিসটেন্সের (French Resistance) সদস্য এবং সে জার্মান পুলিশের সন্দেহভাজনদের নিরাপদে স্পেন ও কিউবাতে পাচার করতে পারবে। প্রচণ্ড হতাশ ও মরিয়া রিফুজিরা হন্যে হয়ে যখন তার সাথে যোগাযোগ করতে লাগল সে তাদের বলল যে, তাদের নিরাপদে অন্য দেশে পাঠানোটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে। ঐরকম আতঙ্কগ্রস্ত মুহূর্তে তারা যেকোনো অংকের অর্থ দিতেই রাজি ছিল। এরপর সে তাদের বলে যে নতুন দেশে পাঠানোর আগে তাদের বিশেষ টীকা নিতে হবে, নাহলে সে দেশের সরকার তাদের গ্রহণ করবে না। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষগুলো সকল শর্তে রাজি হয়ে তাদের সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে মার্সেলকে অর্থ দিতে থাকে। এদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ছিল এক পোলিশ বংশোদ্ভূত টেইলার যে মার্সেলকে বিশ লাখ ফ্রাঁসে (ফ্রান্স এর মুদ্রা) দিয়েছিল তাকে ও তার পরিবারকে পার করে দেওয়ার জন্য। মার্সেল তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রথমে তাদেরকে তার নতুন বাড়ির ভেতরে বসায় টীকা দেবার জন্য। একে একে তাদের প্রত্যেককে গুপ্তভাবে টীকা দিয়ে সেই ত্রিকোণ ঘরটিতে নিয়ে যাওয়া হলো। তাদের কেউই আর সে ঘর থেকে জীবিত বের হয়নি।

মার্সেল লোকগুলোকে টীকা দিয়ে ত্রিকোণ ঘরটিতে ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য দরজার ফুটো দিয়ে ভেতরে দেখত। তার মারাত্মক প্রাণঘাতী টীকা লোকগুলোকে কী করছে তা দেখে সে বেশ মজা পেত। ভয়ংকর সেই টীকা কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কাজ শেষ করলে সে মৃতদেহগুলো টেনে গ্যারেজের নিচের ভূগর্ভস্থ সেলারে নিয়ে যেত এবং কুইকলাইমে (Quicklime, অত্যন্ত শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ যা চামড়া পুড়ে ফেলে) ডুবিয়ে রাখত। মার্সেল প্রচুর পরিমাণে কুইকলাইম কিনে আনত অস্ত্রিয়ারে বসবাসকারী তার ভাই মরিসের (Maurice) কাছ থেকে। এরপর সে মৃতদেহগুলোকে তার গ্যারেজের বিশাল অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিত। যতক্ষণ ধরে দেহগুলো পুড়তে থাকত সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করত কার কাছ থেকে সে কী পরিমাণ অর্থ, সোনা-রুপা এবং অলঙ্কার পেয়েছে।

দিন দিন তার লোক পাচারের গুজব যত ছড়াচ্ছিল ততই ক্রেতা বা শিকার বাড়ছিল তার। গেস্তাপোর (Gestapo, জার্মান গুপ্ত পুলিশ) রোষানল আক্রান্ত ইহুদি, ধনী ফ্রেঞ্চ পরিবার যারা ফ্রান্সের স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আতঙ্কে অপেক্ষা করতে রাজি নয় এমন লোকের লম্বা সারি দেখা যেতে থাকল প্রায় প্রতিদিনই। এমনকি সে নিজের বন্ধু ডাঃ পল ব্রাউমবারগারকেও (Dr. Paul Braumberger) একই ভাবে হত্যা করে। এভাবেই চলতে থাকল প্রায় ১৮ মাস। এরপর মার্সেল রিউ কমারটিনে চিকিৎসাধীন রোগীদেরও রিউ লিসুইয়ারে আনতে সক্ষম হয়। সে আরও বেশি হত্যা করতে শুরু করে। তার স্ত্রী লক্ষ্য করেছিল যে মার্সেল প্রতিদিনই অত্যন্ত ক্লান্ত থাকে এবং তার স্বাস্থ্যও বেশ ভেঙে পড়ছিল। সে কখনো চিন্তাও করতে পারেনি যে তার স্বামীর অতিরিক্ত কাজ এতটা জঘন্য ও ভয়ংকর হতে পারে। তবে ১৯৪৩ সালের বসন্তের শেষদিকে মার্সেল একটি ধাক্কা খেল। গেস্তাপো বহুদিন ধরে খোঁজাখুজি করেও যেসব ইহুদি লোকদের কোনো হদিস না পেয়ে ধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে যায়। তাদের তদন্তে বেরিয়ে আসে যে এসব ইহুদিরা প্রত্যেকেই মার্সেলের সাথে সম্পর্কিত। তারাও ধরে নিল যে, মার্সেল সত্যিই ফ্রেঞ্চ রেজিসট্যান্সের গুপ্তচর এবং তার কাছে তারা ছদ্মবেশে একজন পুলিশকে পাঠাল। মার্সেল চিন্তাও করতে পারেনি যে তার শিকার একজন গেস্তাপো সদস্য এবং অন্যদের মতোই সে তাকেও হত্যা করে। এরপর নাৎসি বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে। বেশ কয়েকমাস তাকে আটকে রেখে ১৯৪৪ সালের প্রথমদিকে তাকে ছেড়ে দেয়। তাকে ছেড়ে দেওয়ার কারণটিও রহস্যময়। মার্সেল যা বলেছিল তা হয়তো আত্মরক্ষার্থে সবচেয়ে সাংঘাতিক বক্তব্য যা সত্যিই কাজ করেছিল। সে বলেছিল যে, নাৎসিরা যা করছে সেও তাই করেছে। সে জঘন্য ইহুদিদের ও নাৎসি বাহিনীর বিপক্ষে যারা তাদের হত্যা করেছে। যেভাবেই হোক সে মুক্তি লাভ করেছিল। সে আবারও তার হত্যার কারখানায় ফিরে আসে এবং শীঘ্রই মৃতদেহ পোড়ানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

তবে এবারে যে ঝামেলাটি হয় তা হলো কুইকলাইমের অভাব। আগুনে দেওয়ার আগে মৃতদেহগুলোকে রাসায়নিকভাবে কিছুটা পুড়ে ফেলত যার ফলে আগুনে পুড়তে সময় কম লাগত। এবার সে জেল থেকে বেরিয়ে কোনো কুইকলাইমের ব্যবস্থা করতে পারেনি। যদিও জার্মানরা তাদের প্রতি মার্সেলের আনুগত্য দেখে তার সকল তথ্য গোপন রেখেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা গোপন থাকল না। পরিবারের সদস্যরা তার গোপন তথ্য ও আসল রূপ জেনে যায়। তার ভাই এতগুলো মানুষ খুনের সঙ্গী হতে অস্বীকার করে এবং কুইকলাইমের সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। অগত্যা মার্সেল রাসায়নিক বিক্রিয়া না করিয়েই মৃতদেহগুলো টুকরো টুকরো করে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেয়। কাঁচা মরদেহের মাংস আগুনে পুড়ে স্বাভাবিকের চেয়ে অত্যন্ত বেশি ঘন কালো ও দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া তৈরি করতে শুরু

করে। প্রতিবেশীরা কখনো মার্সেলের বাড়ির এমন ধোঁয়া পছন্দ করেনি, এবার তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ১৯৪৪ সালের ১১ মার্চ মার্সেলের ঐ বাড়িটির পাশের বাড়ির মালিক পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেয়। সে ভেবেছিল যে বাড়িতে আগুন ধরেছে। সেদিন মার্সেল সেখানে ছিল না। সে ছিল রিউ কমারটিনে চিকিৎসারত। ফায়ার ব্রিগেডের সদস্যরা দরজা ভেঙে গ্যারেজে গিয়ে এক ভয়ংকর পৈশাচিক দৃশ্যের সম্মুখীন হয়। সারাঘরের মেঝেতে বেশ কয়েকটি মৃতদেহ পড়ে আছে। মেঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের হাত-পা, মাথা, ফুসফুস, কোনটা আবার হাত-পা হীন ধড়। ভয়ংকর বিশৃঙ্খলায় জঘন্যভাবে সেসব পড়ে ছিল এবং তার কিছু আবার অগ্নিকুণ্ডে পুড়েছিল। এটিই ছিল অসহনীয় দুর্গন্ধযুক্ত কালো ধোঁয়ার রহস্য। পুলিশ আসার আগ পর্যন্ত ফায়ার বিগ্রেডের লোকজন কিছুই করবে না বলে দিল।

যথাসময়ে পুলিশ এল, সাথে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। ঘরটি ভালোমত দেখে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা হাড়গোড় ও অন্যান্য অংশ মিলিয়ে ২৭টি মৃতদেহ আবিষ্কার করল। মার্সেলকে খবর দিয়ে আনা হলে সে এবারও মিথ্যার আশ্রয় নেয়। সে বলে যে এরা সবাই দেশদ্রোহী এবং নাৎসি তাই সে দেশের জন্য তাদের নিশ্চিহ্ন করছে। আশ্চর্যজনকভাবে পুলিশ তাকে একবার সুযোগ দিল। যদিও তারা জার্মানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল কিন্তু অন্তরে সবাই ছিল ফ্রেঞ্চ, যাদের মনে আশা ছিল যে শীঘ্রই ফ্রান্স নাৎসিদের কবল থেকে মুক্তি পাবে। তারা মার্সেলকে গ্রেফতার না করে শুধু সাবধান করে দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যায়। মার্সেল এবার বুঝতে পারে যে তার খেলা শেষ। তার কথা যাচাই করা মাত্রই সে ধরা পড়ে যাবে যে সে মিথ্যা বলেছে এবং তখন তার বাঁচার উপায় থাকবে না। সে প্যারিসে চলে গেল। সেখানে বেশ কয়েকমাস গ্রামাঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে থাকল। এদিকে পুলিশ মার্সেলের অর্থ ও অন্যান্য সম্পত্তির খবর নিয়ে সকল তথ্য আবিষ্কার করে দেখে যে খুনের সংখ্যা কমপক্ষে ৬৩টি। একে একে সকল তথ্য বের হয়ে আসে। এটিও প্রমাণ হয় যে, মৃতদের কেউই দেশদ্রোহী বা নাৎসি নয়। এবারে ফ্রেঞ্চ পুলিশ তাকে জার্মান গুপ্তচর ভাবতে লাগল। তাকে খুঁজে বের করে নজরবন্দি রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো। সকল খবরের কাগজে মার্সেলের কীর্তিকলাপ ছাপানো হলো। খবরের কাগজে ছাপা ঘটনায় সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। এমনও মানুষ হতে পারে তা বিশ্বাস করতে ফ্রান্সবাসীর কষ্ট হচ্ছিল। এরপরও এই পিশাচ জার্মান রিট্রিট ও ফ্রান্সের জয়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল যাতে করে সে আবারও খুন করতে পারে। সে নিজের হয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখাও পাঠিয়েছে এই বলে সে নাৎসিরা তার ঘরে যত্রতত্র মৃতদেহ ফেলে তাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। তবে কোনো অজুহাতেই কাজ হয়নি। ফ্রান্সের মুক্তির পর পর ফ্রেঞ্চ পুলিশ আইন-কানুনের ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া হতে

শুরু করে। আর মার্সেলের কেস ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাই স্বাধীনতার পর পরই আবারও তদন্ত শুরু করা হয়। গোয়েন্দারা বলে যে তারা এখন মার্সেলকে পুরোপুরি চিনে উঠতে পারেনি মানুষটি যে কতটা জঘন্য তা বোঝা মুশকিল। তাদের ধারণাই ঠিক ছিল। জেনারেল ডি গাওলে যখন চ্যাম্প এলিসিসে প্যারেডে নেমেছিলেন সেখানে হঠাৎ দেখলেন মার্সেল নকল মেডেল পড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার মুখ ভর্তি দাড়ি-গোফ তাকে আড়াল করতে পারেনি। পুলিশের চতুর চোখ তাকে খুঁজে বের করে এবং গ্রেফতার করে।

মার্সেল বেশ জোর দিয়ে বারবার বলে যাচ্ছিল যে সে শুধু জার্মান ও দেশদ্রোহীদের হত্যা করেছে। সে নিজেকে দেশপ্রেমিক বলে দাবি করছিল তবে বিচারকেরা মোটেও নমনীয় হননি। তাদের সামনে ৪৭টি গোছানো স্যুটকেস দেখানো হয়, যাতে পরিপাটি করে সাজানো ছিল কাপড় চোপড় ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র।

সুটকেসগুলোর একটিতেও কোনো পরিচয় লেখা ছিল না। পুলিশ মার্সেলের ত্রিকোণ ঘর, ডেথ সেলার ও অগ্নিকুণ্ড দেখে বর্ণনা পেশ করে এবং জানায় যে সে প্রায় এক মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ লাভ করেছে এসব হত্যা করে। এসকল প্রমাণের আলোকে বিচারকেরা তাদের রায় দিয়ে দেয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। রায় দেওয়ার সময় মার্সেল আদালতের সকলকে ও আশপাশের পুলিশদের বার বার জিজ্ঞেস করছিল যে, সে দোষী কিনা। তার মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে সে চিৎকার করে বলতে থাকে যে, কেউ একজন এসে তার হয়ে প্রতিশোধ নিয়ে যাবে। তাকে গিলোটিনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে শুনে সে এও প্রশ্ন করেছিল যে কোনোভাবে তার মুক্তি পাওয়া সম্ভব কিনা। উত্তরে না শুনে সে একা একা কারাগারে হাঁটার অনুমতি চাইলে সে প্রস্তাবও প্রত্যাখান হয়। শেষে সে হেসে বলেছিল যে, "মানুষ যখন ভ্রমণে বের হয় তখন তার সকল বোঝা তার নিজেরই নিতে হয়। আমি শুধু সেই লোকদের বোঝা হালকা করতে চেয়েছিলাম। সেটা কেউ বুঝল না।"

মার্সেলের একথাটি হয়তো উন্মাদের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও সে নিজেকে দেশপ্রেমিক প্রমাণ করে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। তার ইচ্ছা ছিল তার উপার্জিত অর্থগুলো ব্যয় করা। তাই সে ছাড়া পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে এবং এক পর্যায়ে তার এই ইচ্ছাও প্রকাশ করে। মুক্তির সকল আশা ব্যর্থ হলে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। সাংবাদিক বা পুলিশ তাকে প্রশ্ন করেও নতুন কোনো তথ্য আর বের করতে পারেনি। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে গিলোটিনে এই জঘন্য পিশাচের প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়।

দ্য টিনএজ মনস্টার

১৮৭৪ সাল। এপ্রিলের এক অনিন্দ্যসুন্দর বিকালে বোস্টনের কাছে অবস্থিত সমুদ্র সৈকত ডরচেস্টার বে তে (Dorchester Bay) সবাই মনের আনন্দে বেড়াতে এসেছিল। তবে হাস্যোজ্জ্বল চেহারার বদলে পর্যটকদের মুখে দেখা গেল আতঙ্কের ছাপ। বিশাল সমুদ্র সৈকতের একটি স্থানে সকলেই ভিড় জমিয়ে ফেলল। হতভম্ব ও আতঙ্কিত লোকগুলো স্তব্ধ হয়ে চার বছরের ফুটফুটে শিশু হোরেস মিলেন (Horace Millen) কে ঘিরে রেখেছিল। আতঙ্কের কারণ ছিল ছোট্ট ছেলেটির রক্তাক্ত অর্ধনগ্ন মৃতদেহ। কোনো পিশাচ যেন তার গলা কেটে ফেলেছে এবং ছোট্ট দেহটিতে ১৫ টিরও বেশি ছুরির নির্মম আঘাতের চিহ্ন দৃশ্যমান ছিল। সারা গায়ে ভয়াবহ কালশিটে দেখে বোঝা যাচ্ছিল হত্যা করার আগে তাকে নিষ্ঠুরভাবে পেটানো হয়েছে। শুধু তাই নয় ছোট্ট ছেলেটির যৌনাঙ্গ প্রায় সম্পূর্ণই কেটে ফেলা হয়েছিল। মায়াবী নিষ্পাপ চোখ দুটোতে ছিল আতঙ্ক ও যন্ত্রণার ছাপ। এমনটি করা কোনো পিশাচ ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। পুলিশ তৎক্ষণাৎ নিষ্ঠুর অমানুষটির খোঁজে লেগে গেল। সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুনির তালাশ করা শুরু হলো।

পুলিশ একজন প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল কিন্তু অফিসের কাগজপত্র ও চলমান তদন্তের আলোকে খুনি সন্দেহে যার নাম উপস্থাপন করা হলো তা অফিসারদের হতবাক করে দেয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি হলো ১৪ বছর বয়সী কিশোর জেসি হার্ডিং পোমেরয় (Jesse Harding Pomeroy)। এই ছেলেটিকে দু'বছর আগেও রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল এবং সাজা হিসেবে বেশ কিছুদিন কিশোর সংশোধনাগারে রাখা হয়েছিল। সে সময় তার উপর ছোট বাচ্চাদের নির্মমভাবে পেটানোর অভিযোগ ছিল। ছোট বাচ্চাদের মধ্যে ছোটখাটো ঝগড়া থেকে মারামারি খুবই স্বাভাবিক বিষয়। স্কুলে এসব ঘটনা নিয়ে ছোটখাটো বিচার সালিশ সব সময় লেগেই থাকে। তবে শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের কাছে জেসির নামটি ভোলার মতো ছিল না। সদ্য প্রাইমারি স্কুল পাস করা এই ছেলেটির অত্যাচারের নিষ্ঠুরতার ধরনই এই ছেলেটিকে মনে রাখার একমাত্র কারণ।

জেসির জন্ম ১৮৫৯ সালে। তার শৈশব আর দশজন শিশুর মতো সহজ ও স্বপ্নময় ছিল না। খুব ছোট বেলায় অসুস্থতার কারণে তার ডান চোখে একটি পাতলা সাদা পর্দার সৃষ্টি হয় যা তার দৃষ্টি ও বাহ্যিক সৌন্দর্যকে কিছুটা ব্যাহত করে। গুটি বসন্তের ভয়ংকর ইনফেকশনের ফলে তার চোখে এই ত্রুটির সৃষ্টি হয় এবং অনেকেই তাকে অপ্রীতিদর্শন বলে দূরে দূরে থাকত। সমবয়সীরাও এ নিয়ে হাসি তামাশা করত যা তাকে দিনে দিনে আরও ক্রোধান্বিত করে তোলে। এমনকি তার নিজের বাবা থমাস পোমেরয়ও (Thomas Pomeroy) তাকে একদমই সহ্য করতে পারত না। সে পারতপক্ষে জেসির দিকে তাকাতই না এবং কথায় কথায় তাকে মারধর করত। জেসির বাবা-মায়ের সম্পর্ক তেমন ভালো ছিল না। প্রতিদিন ঝগড়া-বিবাদ, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারধর লেগেই থাকত। একদিন জেসির বাবা খুব তুচ্ছ কারণে রেগে গিয়ে জেসিকে মারতে শুরু করে। একপর্যায়ে সে জেসির শার্ট খুলে নিয়ে তার খালি পিঠে নির্মমভাবে বেল্ট দিয়ে পেটাতে থাকে। জেসির মা রুথ অ্যান পোমেরয় (Ruth Ann Pomeroy) শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরের বড় ছুরি দিয়ে স্বামীকে তাড়া করতে বাধ্য হয়। ফলে জেসির বাবা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় এবং আর কোনোদিন ফিরে আসেনি।

জেসি বেশ চালাক-চতুর ও মেধাবী ছিল। কিন্তু তার মন ছিল সম্পূর্ণই অসামাজিকতায় কলুষিত। সে খেলাধুলায় বেশ ভালো ছিল এবং বাস্কেটবলসহ অন্যান্য স্কাউট ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করত। তবে তার প্রিয় খেলা ছিল "স্কাউট ও ইন্ডিয়ানস।" এ খেলায় সে নিজে একজন রেড ইন্ডিয়ান আদিবাসীর ভূমিকা পালন করত এবং নতুন স্কাউটদের বর্বর শাস্তি দিত। সে সবসময়ই তার মায়ের জন্য যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করত। তার মা জানত যে সে প্রায়ই টাকা চুরি করে এবং স্কুলে অবাধ্য আচরণ করে থাকে। তবে সেজন্যে তার কিছুই করার ছিল না। ছেলের নিষ্ঠুরতার পরিচয় সে অনেক আগেই জানতে পেরেছিল। যেদিন কাজ শেষে বাড়ি ফিরে তার পোষা ক্যানারি পাখিগুলোর মাথা দুমড়ানো মোচড়ানো অবস্থায় পেয়েছিল সেদিনই তার ছেলের বর্বরতার পরিচয় সে পেয়েছিল।

তারা যখন বোস্টনের (Boston) একটি শহরতলী চেলসিতে (Chelsea) থাকত তখন জেসির নিষ্ঠুর আচরণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৮৭১ সালের ডিসেম্বরের ২২ তারিখ ছোট্ট বিল পেইনেকে (Bill Paine) পাওয়া যায় পাউডার হর্ন হিলের আউট হাউসে (Powder Horn Hill Out House)। বোঝাই যাচ্ছিল যে তাকে নির্মমভাবে পেটানো হয়েছে। ছোট্ট বিল ছিল অচেতন। তার হাত দুটো বেঁধে ছাদের কড়িকাঠের সাথে বাঁধা ছিল। জ্ঞান ফেরার পর জিজ্ঞাসা করে অত্যাচারীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেননা সে তার চেহারাই দেখার সুযোগ পায়নি। পরের মাসের ২১ তারিখ ৭ বছর বয়সী বালক ট্রেসি হেডেনকে (Tracy Hayden) পাওয়া যায় একটি পরিত্যাক্ত বাড়িতে। তাকে কোনো খয়েরী চুলের

ছেলে পেটাতে পেটাতে এখানে নিয়ে এসেছে বলে জানা যায়। তাকে নগ্ন অবস্থায় বেঁধে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে চাবুক পেটা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, একটি বোর্ড দিয়ে মুখে আঘাত করা হয়েছিল যার ফলে তার নাক ও সামনের দুটি দাঁত ভেঙে যায়। ট্রেসি কাঁদতে থাকলে সে তার যৌনাঙ্গ কেটে ফেলতে উদ্ধত হয়। তবে শেষ পর্যন্ত পা ধরে কেঁদে তাকে থামাতে সক্ষম হয় ট্রেসি।

পরবর্তী ৯ মাসে সে আটজন ছেলেকে এভাবে হামলা করে এবং প্রত্যেকের অবস্থাই শোচনীয় করে ফেলে। তার বর্বরতার শিকার ছেলেগুলির প্রত্যেকেরই বয়স ৭ থেকে ৮ বছরের মধ্যে ছিল। মে মাসের ২০ তারিখ ৮ বছরের রবার্ট মেয়ারকে (Robert Maier) ঠিক একই স্থানে পাওয়া যায় একইভাবে অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে পুলিশ অন্তত শ'খানেক ছেলেকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। তাদের কাছে আততায়ীর বর্ণনা হিসেবে ছিল উজ্জ্বল লাল চুলের ও বিবর্ণ পাণ্ডুরবর্ণের যুবক, যার থুতনি বেশ চোখা ও ভ্রু ধনুকের মতো বাঁকানো। এত তদন্ত ও তল্লাশির মধ্যেও ২২ জুলাই আবারও জেসি হামলা করে ৭ বছর বয়সী জনি বালখকে (Johnny Balch)। শেষ পর্যন্ত আততায়ীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ৫০০ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। চেলসিতে বসবাসরত অভিভাবকেরা যার যার সন্তান নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। তবে জেসির মায়ের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল ভিন্ন। তার সন্দেহ ও ভয় ছিল যে হয়তো তার ছেলেই এই ভয়ংকর অত্যাচারী। সে চেলসি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং অচিরেই দক্ষিণ বোস্টনে এসে বসবাস শুরু করল। সে একটি কাপড়ের দোকান দেয় এবং জেসিকেও ব্যবসায় মনোযোগী করার চেষ্টা করে। কিন্তু এখানেও জেসির পৈশাচিক বর্বরতা চলতে থাকে এবং তা আরও নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর হতে থাকে। আগস্টের ১৭ তারিখ তার শিকার হয় ৭ বছর বয়সী জর্জ প্যাট (George Patt)। তাকে পূর্বের নিয়মে অত্যাচার করেই ছেড়ে দেয়নি জেসি। এবার সে তার শিকারের হাতে, তলপেটে সূঁচ বিঁধিয়ে দিয়ে গাল ও নিতম্ব থেকে ছোট টুকরা পরিমাণ মাংস কেটে নিয়েছিল। এরপর ৫ সেপ্টেম্বর সে ছুরি দিয়ে ৬ বছর বয়সী হ্যারি অস্টিনকে (Harry Austin) হামলা করে। সে তার হাতের নিচে ও কাঁধে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। শুধু তাই নয় এবার সে সত্যি সত্যিই যৌনাঙ্গ কেটে ফেলার চেষ্টা করে। এর দুদিন পরই ৬ বছর বয়সী জোসেফ কেনেডিকে (Joseph Kennedy) একই ভাবে ছুরিকাঘাত করে এবং তার ক্ষতবিক্ষত দেহে লবণ পানি ঢেলে দেয়। এর ছয়দিন পর সে দু'টি ছুরি দিয়ে একসাথে কাজ করা শুরু করে। এবারে তার শিকার ছিল পাঁচ বছর বয়সী রবার্ট গুল্ড (Robert Gould)। সে রবার্টের সারা দেহের চামড়া চিড়ে ফেলে এবং তাকে হত্যা করার হুমকি দেয়। তবে সে সময় রেল লাইনের শ্রমিকরা কাছাকাছি চলে আসাতে এ

যাত্রা সে বেঁচে যায় এবং জেসি পালিয়ে যায়। জেসির ৮ম শিকার রবার্টই একমাত্র শিকার যে কিনা অত্যাচারী সম্পর্কে কার্যকর বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়। সে বলে, "খারাপ একটি বড় ছেলে ছিল সেখানে, ওর চোখগুলো ছিল আজব।"

পুলিশ আততায়ীর চোখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, "ঘোলা, মেঘাচ্ছন্ন, দুধের মতো ঘোলা চোখ।" পুলিশ হন্যে হয়ে আততায়ীকে খুঁজতে শুরু করে এবং স্থানীয় স্কুলগুলোতেও অভিযান চালায়। তারা রবার্টকে সাথে নিতে চেয়েছিল কিন্তু রবার্টের সারা দেহের ক্ষতে বেশ কয়েকটি করে সেলাই পড়েছিল এবং সে কোনোভাবেই ঘর থেকে বের হওয়ার উপযোগী ছিল না। উপায় না দেখে পুলিশ জোসেফকে সাথে নিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জেসিকে সামনে পেয়েও সে তাকে সনাক্ত করতে পারেনি। সেদিন জেসি স্কুল ছুটির পর পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিল। তার যাবার কারণটি সে নিজেও কোনোদিন ব্যাখ্যা করতে পারেনি। সেখানে জোসেফকে দেখেই সে উল্টা ঘুরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। ব্যাপারটা একজন পুলিশের চোখে পড়লে সে সাথে সাথে গিয়ে জেসিকে ধরে আনে। সেখানে জোসেফ তাকে কাছে থেকে দেখে তার চোখটি চিনতে পারে এবং তাকে অত্যাচারী হিসেবে সনাক্ত করে। জেসিকে সারারাত জেলে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে শেষ পর্যন্ত সে তার অপরাধ স্বীকার করে। তার বয়স তখন ছিল মাত্র ১২ বছর। তার বয়সকে বিবেচনা করে তাকে ছয় বছরের জন্য সংশোধনাগারে থাকার সাজা দেওয়া হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, সে বেশ চালাক চতুর ছিল। সে ভালো করেই বুঝতে পেরেছিল যে, এখানে ভালো হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সে পড়াশোনায় মনোযোগী হয় এবং কারো সাথে কোনো রকম ঝগড়া মারামারিতে লিপ্ত হয়নি। বড় ছেলেদের থেকে সে দূরে থাকত এবং ছোট ছেলেগুলো নিজের দায়িত্বে তার থেকে দূরে থাকত। ভিতরে জেসির উন্নতি ও বাইরে থেকে তার মায়ের তাকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে জেসি এখন সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গিয়েছে। তাকে ১৮৭৪ সালের ২৪ জানুয়ারি গ্রেফতারের ১৮ মাসের মাথায় পরীক্ষামূলক মুক্তি দেওয়া হয়।

তার পরবর্তী হামলা শুরু হয় মার্চ থেকে। ১৮ মার্চ সকালে ১০ বছর বয়সী কেটি কুরান তার বাসা থেকে খাতা কেনার জন্য বেরিয়েছিল এবং সে আর বাড়িতে ফিরে যায়নি। তাকে শেষ বারের মতো মিসেস পোমেরয়ের দোকানে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল। প্রতিবেশীদের সবাই জেসির স্বভাব সম্পর্কে অত্যন্ত ভালোভাবে অবগত ছিল এবং কুরান পরিবারের দুশ্চিন্তা ছিল সর্বোচ্চ পরিমাণে। পুলিশ স্টেশনে ক্যাপ্টেন ডাইয়ার (Captain Dyer) কেটির মাকে আশ্বস্ত করছিলেন এই বলে যে, জেসি এখন সংশোধিত হয়ে গেছে এবং সে সাধারণত ছোট ছেলেদের হামলা করে, মেয়েদের নয়। অপরদিকে প্রতিবেশীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠে যে কেটির ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক পিতা তার স্ত্রীর অগোচরে কেটিকে

ধর্মাচারী কোনো কনভেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে কেটিকে কনভেন্টে পাঠানো নিয়ে তাদের মধ্যে বিদ্যমান তর্কবিতর্ক ও মনোমালিন্য প্রতিবেশীদের অগোচরে ছিল না। পুলিশ অপহরণকারীদের প্রতি মনোনিবেশ করলে জেসি আপাতত ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় এবং ব্যাপারটির তীব্রতা কমে যেতে থাকে। এতে করে জেসির আত্মবিশ্বাস এত বেড়ে যায় যে সে আরও একটি খুন করতে সফল হয়। এপ্রিলের ২২ তারিখ বেশ কয়েকটি স্থানে ৪ বছর বয়সী হোরেসের সাথে জেসিকে দেখা গিয়েছিল। সমুদ্র সৈকতে বহুলোক দুপুরের দিকে একটি ছোট ছেলে ও একটি লাল চুলের কিশোরকে ম্যাক কেইস ওয়ার্কের (Mc Cay's Wharf) দিকে হেঁটে যেতে দেখেছে। সেদিন বিকালেই স্যাভিন হিল বিচের (Savin Hill beach) নির্জন এলাকায় একটি নিভে যাওয়া অগ্নিকুণ্ডের কাছে পাওয়া যায় হোরেসের মৃতদেহ।

বোস্টনের পুলিশ প্রধান যখন হোরেসের হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পারে, তার মাথায় সবার আগে জেসির নাম এসেছিল। সে ভেবেছিল জেসি এখনও সংশোধনাগারে আছে। যখন পুলিশ সদস্যেরা খবর দিল যে জেসি পরীক্ষামূলক মুক্তি লাভ করেছে সে সাথে সাথে জেসিকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়। জেসিকে খুঁজে বের করে হোরেসের মৃতদেহের পাশে পাওয়া পদচিহ্নের সাথে তার জুতার ছাপ মিলিয়ে দেখা হলো। পুলিশের প্লাস্টার কাস্টের জুতার ছাপের সাথে জেসির জুতা পুরোপুরি মিলে যায় এবং তাকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেওয়া হয়।

হোরেস হত্যার ক্ষেত্রে পুলিশ যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তার উত্তরগুলো ছিল যথেষ্ট অসংলগ্ন। তাতে পুলিশের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। প্রমাণাদি সহ জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে অস্বীকার করে। ততক্ষণে তার চেহারায় আতঙ্কের ছাপ পড়ে গিয়েছিল যা পুলিশকে আততায়ী সম্পর্কে নিশ্চিত হতে আরও সাহায্য করে। এরপর তাকে হোরেসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় হোরেসের মৃতদেহ দেখানোর জন্য। তখন সে অত্যন্ত ভেঙে পড়ে এবং স্বীকার করে যে সেই হোরেসকে হত্যা করেছে। সে বলতে থাকে যে তার যেন কি হয়ে যায় এবং কিছু একটা তাকে দিয়ে এসব করায়। এরপর সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে কাঁদতে শুরু করে এবং সেখান থেকে চলে যেতে চায়। পুলিশ যখন তাকে সেখান থেকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে তাদের বলেছিল, "দয়া করে আমাকে এমন কোনো জায়গায় নিয়ে রাখবেন যেখানে আমি এধরনের কিছু করতে না পারি ।" ("Please put me somewhere, so I can't do such things.") এটি ছিল অদ্ভুত খুনের মামলার মধ্যে অন্যতম একটি। শেষ পর্যন্ত মামলার শুনানিতে তাকে সাজা শোনানো হয়। তখন তার বয়স ছিল ১৫ বছর। বহু তর্ক বিতর্কের পর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও সে আরও ৫৮ বছর বেঁচে থাকার সুযোগ পায়।

এর প্রথম ৪০ বছর তাকে কাটাতে হয় নির্জন কারাবাসে, তার বয়স ৫৫ বছর হওয়া পর্যন্ত।

তাকে যখন গ্রেফতার করা হয় তার ঠিক দুই মাস আগেই সে ওয়েস্টবরো রিফরমেটরি (Westboro Reformatory) থেকে ১৮ মাসের সাজা খেটে ছাড়া পেয়েছিল। তখন অভিযোগ ছিল শুধু ছোট বাচ্চাদের নিষ্ঠুরভাবে পেটানোর আর যে মানুষটি এতদিনে বেশ কয়েকবার চরম পৈশাচিকতার প্রমাণ সৃষ্টি করেছে তাকে আমেরিকার নাগরিকেরা কোনোভাবেই কোনো প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিল না। জেসির বিচার ও তার সাজার পক্ষে বেশ জোরালো আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এদিকে শিশু হোরেস হত্যা মামলার জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্ত চলাকালীন সময়েই পুলিশ তার আরও একটি জঘন্য অপরাধের কথা জানতে পারে। হোরেসের হত্যার পাঁচ সপ্তাহ আগেই সে আরও একটি খুন করেছে। তার শিকার ১০ বছর বয়সী বালিকা কেটি কুরান (Katie Curran)। মেয়েটিকে হত্যা করে সে তার মৃতদেহটিকে তার মায়ের দোকানের ভূগর্ভস্থ ঘরে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছিল। সেখানে কেটির মৃতদেহ উদ্ধার করে জেসির উপর আরও একটি খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়। জেসির এসব কর্মকাণ্ড তার মা মিসেস পোমেরয়ের কাপড়ের ব্যবসার অত্যন্ত ক্ষতি করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সে কাপড়ের দোকান বন্ধ করে বাইরে কাজ করা শুরু করে। তার দোকানটি ন্যাশ'স গ্রোসারি স্টোর (Nash's Grocery store) নামে একটি প্রতিষ্ঠান কিনে নেয় এবং ব্যবসা শুরু করার জন্য সেখানে কাজ শুরু করায়। যখন তাদের রাজমিস্ত্রিরা ভূগর্ভস্থ ঘরের ভেতরে দেওয়াল ও মেঝে ভেঙে মেরামত করছিল তারা হঠাৎ অত্যন্ত তীব্র পূত গন্ধ পায়। ক্রমে গন্ধটি বেড়ে গেলে তাদের সেখানে টেকা দায় হয়ে যায়। ইঁদুর মরা গন্ধ মনে করে তার ভূগর্ভস্থ ঘরে তা পরিষ্কার করতে যায়। সেখানে তারা ভাঙা ইট-কাঠ ও ছাইয়ের স্তূপটিকে সনাক্ত করে দুর্গন্ধের উৎস হিসেবে। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় কেটি কুরানের পচে যাওয়া মৃতদেহ। কেটির জামা দেখে তাকে সনাক্ত করা হয়। দেহটি পঁচে যাওয়া সত্ত্বেও নিষ্ঠুর ছুরির আঘাতগুলো বোঝা যাচ্ছিল। এই খুনের দায়ে প্রথমে মিসেস পোমেরয় ও তার বড় ছেলে চার্লস (Charles) কে গ্রেফতার করা হয়। জেসিকে ব্যাপারটি জানানো হয় এবং বেশ কঠোরভাবে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। শেষ পর্যন্ত সে খুনের দায় স্বীকার করে।

মামলার শুনানির সময় জেসি এক দুইবার পাগলামি করে নিজেকে মানসিকভাবে অসুস্থ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। সে এক পর্যায়ে এও বলে ওঠে যে হত্যার দায় থেকে তার মাকে বাঁচানোর জন্য সে দোষ স্বীকার করেছে এবং দাবি করে যে সে প্রকৃত খুনি নয়। তবে এটি তার কোনো সাহায্যে আসেনি। বরং তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা শোনানো হয়। তাকে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড

দেওয়া হয়। কিশোর জেসির মামলার রায় নিয়ে বেশ জোরালো বিতর্কের সৃষ্টি হয়। একদল লোক এর পক্ষপাতি ছিল এবং অপর পক্ষে কিছু লোক চাচ্ছিল নাবালক অপরাধী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হোক। হোরেস হত্যা মামলার শুনানি হয়েছিল চার দিনে। এর মধ্যে অনেকেই তাকে সনাক্ত করেছিল আবার অনেকে বলছিল যে আরও বেশি বয়সী ছেলে ছিল সেখানে। একদল বাক বিতণ্ডাকারী দাবি করছিল যে জেসি মানসিকভাবে অসুস্থ, বরং উন্মাদ। তারা বিভিন্ন চিকিৎসকের মতামতও আদালতে পেশ করে বলছিল যে জেসি উন্মাদ। জেসির শিকারদের মধ্যে জীবিত যারা তাদের অনেকেই পুরোপুরি ঠিক হয়নি এবং তাদের অভিভাবকদের দাবি ছিল উপযুক্ত সাজা মৃত্যুদণ্ড। আদালতের নিজস্ব বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছিল যে জেসি মোটেও উন্মাদ নয় এবং সে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বোঝে এবং তার প্রতিটি কাজই স্বেচ্ছায় করা হয়েছিল। এরপরও যারা মানবাধিকার ও নাবালকত্বের বিবেচনার কথা বলছিল তাদেরকে চাপের মুখে থামিয়ে দিয়েছিল সাধারণ জনগণ, যাদের দাবি ছিল দ্রুত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার। শেষ পর্যন্ত মামলার রায় পরিবর্তন হয়েছিল তবে তা শুধু আন্দোলনের জন্য নয়, ম্যাসাচুসেটসের (Massachusetts) আইনানুযায়ী ফার্স্ট ডিগ্রির এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করাতে গিয়ে সৃষ্ট কিছু আইনি জটিলতার কারণে। বিচারকগণ জেসিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিল কিন্তু আইনানুযায়ী ম্যাসাচুসেটসের গভর্নরকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের তারিখ নির্ধারণ করে মৃত্যুদণ্ডপত্রে স্বাক্ষর দিতে হবে। গভর্নর গ্যাস্টন (Governor Gaston) তৎকালীন সৃষ্ট রাজনৈতিক বাক বিতণ্ডার কারণে এক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নিতে রাজি হচ্ছিলেন না। কিশোর অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া নিয়ে বিভিন্ন তর্কবিতর্ক শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক রূপ ধারণ করায় তিনি মৃত্যুদণ্ড পত্রে স্বাক্ষরও করলেন না আবার জেসির সাজাও পরিবর্তন বা লঘু করলেন না। তিনি ১৮৭৬ সালের আগস্টে দুটি পরিস্থিতির মাঝামাঝি একটি নির্দেশনা জারি করেন যে, জেসিকে বাকি জীবন নির্জন কারাবাসে কাটাতে হবে এবং তিনি উক্ত নির্দেশনামায় সিলযুক্ত স্বাক্ষর দেন। গভর্নর গ্যাস্টনের মৃত্যুর বহুদিন পর পর্যন্ত এ নির্দেশনা বহাল ছিল এবং জেসিকে নির্জন কারাবাসেই রাখা হয়েছিল।

১৯১৬ সালে জেসির বয়স যখন ৫৪, তখন তার নির্জন কারাবাস থেকে মুক্তি কার্যকর করা হয়। কিছুদিন পর, তার বয়স যখন ৫৫, তাকে চার্লসটান কারাগারের (Charles Town Prison) অন্যান্য অপরাধীদের সাথে একত্রে রাখা হয়। প্রায় ৪০টি বছর নির্জন কারাগারে থেকেও সে যথেষ্ট স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে ছিল যা অতিমানবিক ভাগ্য পরীক্ষাই বলা যায়। হয়তো তার এমন স্বাভাবিকতার কারণ ছিল, সে এতগুলো বছর নিজেকে অসংখ্য বইয়ে ডুবিয়ে রেখেছিল। পুরো ৪০ বছরই সে শুধু বই পড়েছে এবং নিজে লিখেছেও প্রচুর।

নির্জন কারাগারে কাটানো সময়ে এবং তার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের সময় মারধর ও অত্যাচারে যদি সে পাগল হতো তবে এত বই লেখা তার পক্ষে কোনো দিনই সম্ভব হতো না। তার বইগুলোর কোনো একটিতেও কোনো প্রকার পাগলামি বা অর্থহীন প্রলাপ নেই বরং সুস্থতারই ছাপ ছিল। তার লেখা বইগুলোর একটি ছিল তার আত্মজীবনী। সেখানে তার প্রথম জীবনের বিভিন্ন অপরাধের কথা বিস্তারিত লেখা আছে। এমনকি সে কতবার কত পদ্ধতিতে কারাগার থেকে পালানোর চেষ্টা করেছে তাও নিখুঁতভাবে লেখা ছিল।

জেসির সম্পূর্ণ জীবন এভাবেই কেটে যায়। তার মৃত্যু হয় ১৯৩২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। যে কারাগারে তার সমস্ত জীবন কেটেছে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় জেসির বয়স ছিল ৭৩ বছর, যার মধ্যে প্রায় ৬০ বছরই তার কেটেছে কারাগারে।

দ্য সুইসাইড মার্ডারস

ইতিহাসে বছরের পর বছর মানুষকে তাদের সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং দায়িত্ব নেওয়ার ভয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে দেখা গেছে। তবে তিনজন ইয়োরোপিয়ান অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সবচেয়ে জঘন্য দানবতুল্য পরিকল্পনা করে। তারা কেউ কাউকে দেখেনি কোনোদিন। কিন্তু মাত্র ১২ মাসের মধ্যে তিনজন তিন এলাকায় একই ধরনের পথ অবলম্বন করে তাদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার দায় থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেছে।

অ্যালফ্রেড আর্থার রাউস (Alfred Arthur Rowse) তার প্রতিবেশীদের কাছে প্রাণবন্ত ও মিশুক হিসেবে জনপ্রিয় ছিল। বেশ নজর কাড়ার মতো সুদর্শন হওয়ায় খুব সহজেই সবার মন জয় করে নিত। সে তার স্ত্রী লিলি মে'কে নিয়ে (Lily May) লন্ডনের ফিঞ্চলের বাক্সটেড রোডে (Buxted Road, Finchley, London) বসবাস করত। লিসেস্টার কোম্পানিতে (Leicester Company) কমার্শিয়াল ট্রাভেলারের চাকরি করে বেশ সচ্ছলভাবেই চলছিল তাদের ছোট্ট সংসার। রাউস তার কাজটি অত্যন্ত পছন্দ করত এবং তার মনোযোগই দিন দিন তাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছিল। কাজের বাইরে তার একমাত্র নেশা ছিল গাড়ি। গাড়ির যেমন শখ ছিল তেমনি বিক্রয়ে দক্ষতাও ছিল। সহজাত গুণেই সে অত্যন্ত ভালোদামে তার গাড়ি বিক্রি করত, কিছুদিন পর নতুন একটি কিনে সেটিও বিক্রি করে বেশ লাভবান হতো। সব মিলিয়ে তাদের জীবন ছিল নিখুঁত। কিন্তু তা বেশি দিনের জন্য নয়। ১৯৩০ সালের ৬ নভেম্বর সাদা পোশাকের দু'জন পুলিশ সদস্য মিসেস রাউসকে ফোন করে জানাল, তার স্বামীর মরিস মাইনর (Morris Minor) গাড়িটি, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর এম ইউ ১৪৬৮ (M U 1468) অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে নর্থামটনের কাছে (Northampton) লন্ডন রোডের বাইরে হার্ডিংস্টোন লেনে (Hardingstone Lane, off London Road)। শুধু তাই নয়, ভেতরে একটি দগ্ধ মৃতদেহও পাওয়া গিয়েছে। তারা তাকে নর্থামটনে গিয়ে মৃতদেহটি ও কিছু অক্ষুণ্ন ব্যক্তিগত সম্পত্তি শনাক্ত করার অনুরোধ করল।

মিসেস রাউস উন্মাদপ্রায় অবস্থায় পুলিশের সাথে নর্থামটনে ছুটে যায়। বিধ্বস্ত গাড়িটি থেকে পাওয়া কোমরবন্ধনীর বগলস্ ও কয়েক টুকরা কাপড় তার স্বামীর বলে শনাক্ত করে সে। তাকে মৃতদেহটি দেখতে দেওয়া হয়নি, যদিও সেটি শনাক্তকরণের কোনো উপায়ই ছিল না। চেহারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যা থেকে মৃতের চেহারা ধারণা করা ছিল অসম্ভব। মিসেস রাউস বাড়িতে ফিরে জানতে পারে তার স্বামী কিছুদিন আগেই একটি জীবনবীমা করিয়েছিল। সেখান থেকে সে একহাজার পাউন্ড লাভ করে।

খুনি অ্যালফ্রেড আর্থার রাউস

পুলিশ যদিও মৃতদেহটি রাউসের বলেই সব আনুষ্ঠানিকতা পালন করছিল কিন্তু তারা নিজেরাও এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না। ব্যাপারটি দুর্ঘটনা নাকি কোনো সাজানো নাটক এ সন্দেহের উদ্রেক হয় একটি অদ্ভুত ঘটনার অবতারণায়। হার্ডিংস্টোনেরই এক পুলিশ কর্মকর্তার ছেলে জানায় যে, সে তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে ৫ নভেম্বর নর্থামটনের বোনফায়ার নাইট পার্টি (Bonfire Night Party) থেকে ফিরছিল। রাত তখন প্রায় দু'টা, হঠাৎই তাদের চোখে পড়ে একটি গাড়িতে আগুন জ্বলছে লন্ডনমুখী দিকে। যখন গাড়িটি রাস্তার বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল, তখনই রাস্তার ঢাল থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে আসে ও গড়িয়ে

গড়িয়ে রাস্তার দিকে এগুতে থাকে। তার গায়ের কাপড়ের এখানে সেখানে আগুন ধরেছিল। তার পরনে ছিল লম্বা রেইনকোট ও হাতে একটি অ্যাটাচি কেস, তার মাথায় কোনো টুপি ছিল না। তারা অবাক হয়ে লোকটি কী করছে তা দেখতে দেখতেই তাদের নজর অন্যদিকে ঘুরে যেতে বাধ্য হয়। রাস্তা থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে হার্ডিংস্টোন লেনে তারা বিস্ফোরণের শব্দ পেয়ে তাকিয়ে প্রকাণ্ড আগুনের গোলা দেখতে পায়। এমন সময় সেই আজব লোকটি বলে উঠে, "মনে হচ্ছে কেউ বেশ বড় বোনফায়ার করছে।" এরপর সে বিপরীত দিকে হাঁটা দেয় ও ছেলে দু'টি জ্বলন্ত গাড়িটির দিকে ছুটে যায়। পুলিশের সন্দেহ হওয়ার জন্য এতটুকুই ছিল যথেষ্ট। রাত ২টার সময় একজন সম্ভ্রান্ত পোশাক পরিহিত ব্যক্তি এই নির্জন এলাকার রাস্তায় কী করছিল তারা ভেবেই পাচ্ছিল না। সে কেনই বা দুর্ঘটনাটি সম্পর্কে পুলিশকে খবর দিল না? কেনইবা দু'জন বালককে এভাবে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে ছুটে যেতে দিয়ে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল? কোনোরকম সাহায্য সন্ধানে কেন সে তৎপর হয়নি? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পুলিশ তৎপর হয়ে উঠে। ছেলে দু'টির বর্ণনানুযায়ী তারা ৩০ থেকে ৩৫ বছর বয়সী, ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি থেকে ৬ ফুট উচ্চতার সুদর্শন ফর্সা ও কালো কোঁকড়ানো চুলের ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার দেশব্যাপী আদেশ জারি করল। তাদের তৎপরতা শেষ হয় ৭ নভেম্বরে রাত ৯টা ২০ মিনিটে। অপরাধী লন্ডন কোচে করে কারডিফ (Cardiff) পৌঁছা মাত্রই তার দেখা হয় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের সাথে। এরপর তারা ধীরে ধীরে একটি অত্যন্ত হিংস্র ও হৃদয়হীন ভাবে পরিকল্পিত জঘন্য এক রহস্যের পর্দা উন্মোচন করে।

লিলির সাথে সুখে শান্তিতে সংসার করা রাউস ছিল আসলে দ্বিবিবাহকারী। সে নিজেও জানত সে অত্যন্ত সুদর্শন এবং সেটি কাজে লাগিয়েই মেয়েদের মুগ্ধ করা শুরু করে। সে যেখানেই যেত সেখানেই ওয়েট্রেস, দোকানি সুন্দরী মেয়েদের প্রেমের জালে ফাঁসাত। ১৯২০ সালে সে এডিনবার্গের (Edinburgh) একটি ১৪ বছর বয়সী মেয়েকে গর্ভবতী করে ফেলে। মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই সন্তানটি মারা যায়, কিন্তু রাউস সম্পর্কটি স্থায়ী করে। মেয়েটি ও তার পরিবার তাকে অবিবাহিত হিসেবেই জানত। ১৯২৪ সালে উত্তর লন্ডনের আইলিংটনের সেন্টম্যারি'স চার্চে (St Mary's Church, Islington, North London) রাউস মেয়েটিকে বিয়ে করে। কিছুদিন পর তার একটি পুত্র সন্তান হয়। রাউস কীভাবে যেন তার প্রথম স্ত্রীকে প্ররোচিত করে ছেলেটির দেখাশোনা করার জন্য রাজি করায়। সে প্রায়ই ছেলেটিকে বাক্সটেড রোডে তার দায়িত্বে রেখে যেত। ১৯২৫ সালে রাউস যখন হেন্ডনে (Hendon) যায় চাকরির সুবাদে, তার পরিচয় হয় ১৭ বছর বয়সী এক গৃহকর্মীর সাথে। সে প্রায়ই মেয়েটিকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যেত এবং তাকে আশ্বস্ত করেছিল যে, ব্যবসায় উন্নতি হলেই তারা বিয়ে

করবে। ১৯২৮ সালে তার একটি কন্যা সন্তান হয়। এরপর ১৯৩০ সালের অক্টোবরে, তার গাড়ি পোড়ানোর একসপ্তাহ আগে তাদের আরও একটি কন্যা সন্ত ান হয়। সে সময় আরও একটি মেয়ে গেলাগায়েরের মনমাউথশায়ার (Monmouthshire, Gellagaer) নামক গ্রামে তার মা বাবার বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সেও রাউসের দ্বারা গর্ভবতী ছিল এবং তাদের বিয়ে হয়েছিল বলে জানা যায়। রাউস মেয়েটির মা-বাবাকে বলেছিল যে, একটি আসবাবপত্রসহ বাড়ি দেখেছে সে কিংস্টোনে (Kingston)। সেটি কেনার পরই তাকে নিয়ে যাবে সেখান থেকে। সন্তান জন্মের আগ পর্যন্ত মায়ের বাড়িতেই থাকার কথা ছিল মেয়েটির।

তখন রাউসের আয় ছিল সপ্তাহে দশ পাউন্ড। নতুন আরও একটি সন্তান ও তার মা তার জন্য উটকো ঝামেলা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এরই সাথে প্যারিস ও ইংলান্ডে আরও দু'জন অবৈধ সন্তানের বোঝা যুক্ত হলো। এতদিক সামলে উঠতে তার হিমশিম খেতে হচ্ছিল। এখন তার একটিই উপায় ছিল, তা হলো এখান থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে অন্যত্র গিয়ে নতুন জীবন শুরু করা। দুর্ভাগ্যের সেই ৫ নভেম্বরের কয়েকদিন আগে তার সাথে এক চাকরি সন্ধানী লোকের পরিচয় হয় লন্ডনের হোয়েটস্টোনের (Whetstone) একটি রেস্তোরাঁয়। সে লোকটি তাকে বলে যে, একটি চাকরির জন্য সে সারাদেশ হন্যে হয়ে চষে বেড়াচ্ছে কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। সে এও বলে যে, তার তিন কূলে কেউ নেই। রাউসের মাথায় এক জঘন্য বুদ্ধি আসে। যখন সে খেয়াল করে দেখে যে, লোকটি প্রায় তার সমানই লম্বা এবং দৈহিক গঠনেও বেশ মিল আছে। সে তাকে একটি চাকরি দেবার আশা দেয়। ৫ নভেম্বর সেই মেয়েটির সাথে দেখা করে মাত্র সাতদিন আগে যে তার কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। তাকে সেদিন খুব ব্যস্তভাবে বার বার ঘড়ি দেখতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিল পরিশোধ করার কথা বলে হন্তদন্ত করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। রাত ৮টার পর সে হোয়েটস্টোনের হাই রোডে সেই বেকার লোকটির সাথে দেখা করে। সে তাকে লিসেস্টারে নিয়ে একটি চাকরি দেওয়ার কথা দিয়েছিল।

রাউস একদমই মদ্যপান করত না, কিন্তু সে সাথে করে এক বোতল হুইস্কি নেয় তার নতুন বন্ধুর জন্য। লোকটি অনবরত পান করেই যাচ্ছিল। সেন্ট অ্যালবানসের কাছাকাছি আসার পর সে ভুলে গাড়ির লাইট বন্ধ করে ফেলায় তাদেরকে পুলিশ থামিয়েছিল। রাউসকে স্বাভাবিক দেখে তারা শুধু সাবধান করে তাদের ছেড়ে দেয়। এরপর কী হয়েছিল তা জানা যায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগের দিন রাউসের লেখা একটি নোট থেকে। সেখানে তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ও ঘটনার বিস্তারিত পাওয়া যায়। সেটি ছিল এ রকম, 'সে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যার কোনো পিছুটান নেই এবং তার জন্য ছুটে আসার মতো কেউ নেই। আমার

পরিকল্পনার জন্য সেই ছিল উপযুক্ত। গাড়িতে বসার পর থেকেই সে অনবরত হুইস্কি পান করে যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে সে পুরো বোতল খালি করে ফেলে এবং বলা বাহুল্য সে সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে যায়। আমরা অনেক কথা বলছিলাম, কিন্তু সে নিজের সম্পর্কে কিছুই বলেনি, অবশ্য আমি সেটার পরোয়াও করিনি।

আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম। কিছুদূর এসে আমি হার্ডিংস্টোন লেনের দিকে চলে এলাম, কেননা এটি অত্যন্ত নির্জন এলাকা। শুধু তাই নয়, এটি মেইন রোডের বেশ কাছে, আমি কাজ শেষ করে কোনো লরিতে করে কোথাও চলে যেতে পারব। হুইস্কির প্রভাবে লোকটি তখন ঝিমাচ্ছিল। আমি ডান হাত দিয়ে শক্ত করে তার গলা টিপে ধরলাম এবং মাথাটি সিটে ঠেকিয়ে আরও জোরে চেপে ধরলাম। কোনো রকম বাঁধা না দিয়েই ধীরে ধীরে তার মাথাটি ডানদিকে হেলে পড়ল। তখন খেয়াল করলাম যে, তার মাথার পেছন দিকে একটু টাক পড়া আছে যা আমার সাথে সম্পূর্ণ মিলে না। ভেবেছিলাম কাজ শেষ, কিন্তু আবার সে কেঁপে উঠল। গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ হতে লাগল। আবারও মাথাটি সিটে চেপে সর্বশক্তি দিয়ে গলা টিপে ধরলাম। লোকটি বুঝতেও পারেনি কী ঘটছে। আমি তার মুখটি অন্য দিকে সরিয়ে দিলাম। অদ্ভুত আওয়াজ করে সে নিশ্চুপ হয়ে গেল। এরপর আমি গাড়ি থেকে বের হলাম আমার অ্যাটাচি কেস পেট্রোলের ক্যান ও ম্যাচ নিয়ে। সারা গাড়িতে পেট্রোল ছিটানোর সময় লোকটির গায়েও বেশি করে পেট্রোল ছিটিয়ে দিলাম। গাড়ি থেকে বেশ দূর পর্যন্ত একটি পেট্রোলের সূত্র তৈরি করে একটি মশাল জ্বালালাম। প্রায় ১০ গজ দূরে এসে মশালটি ছুড়ে দিলাম। এরপর দৌড়ে গিয়ে আরও একটি ম্যাচ ছুড়লাম কার্বুরেটরে, যেখানে অনেকখানি পেট্রোল ঢেলেছিলাম। খুব তাড়াতাড়িই আগুন ধরে গেল। আমি পেট্রোলের ক্যানটিও গাড়ির ভেতরে ছুড়ে দিয়েছিলাম, যেন কোনো চিহ্ন বাইরে না থাকে। লোকটিকে আগেই আমার জায়গায় বসিয়ে রেখেছিলামও সে সামনের দিকে ঝুঁকে ছিল। গাাড়ির নিচ দিয়েও পেট্রোল পড়ছিল যা বেশ কাজে দেয়। আগুন বেশ দ্রুত ছড়িয়ে গেল এবং পুরো ব্যাপারটি এক বিশাল বিশৃঙ্খলাময় আগুনের সৃষ্টি করল মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম।'

রাউস অত্যন্ত ঠান্ডামাথায় হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছিল। লোকটির বাম পা গাড়ির ফুটো হওয়া ইউনিয়ন জয়েন্টের উপর ছিল, যেখান থেকে পেট্রোল পড়ছিল। তার মুখও সেদিকেই ঝোঁকানো ছিল, যেন অনবরত আগুন মুখে লাগতে থাকে এবং চেহারা চেনার কোনো উপায় না থাকে। লোকটির ডান হাতটি পিছনের সিটের দিকে বাঁকানো ছিল যেন আগুন সরাসরি পেট্রোল ক্যান থেকে হাতে লাগে। এটি ঘাড় ও মাথার পেছনের দিকের জন্য উপযুক্ত আগুনের উৎস ছিল, যা মাথার পেছনের টাক একদম নিশ্চিহ্ন করে দেয়। গাড়ির ইঞ্জিনটি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যা আকস্মিক বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই হিসাবি খুনি ফেরার

পথে দু'জন পথিকের দেখা পাবার কথা চিন্তা করেনি যারা তাকে পালাতে দেখে। আর এই ঘটনাই তার অশুভ কাজটি প্রমাণ করে। যখন সে দেখল যে, তাকে দু'জন দেখে ফেলেছে সে বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং নতুন জায়গায় নতুন জীবন শুরু করার বদলে সে লরিতে করে ফিঞ্চলিতে একটি লিফট হোমে আশ্রয় নেয়। সেখানে পৌঁছে সে ভোর ৬টা ২০ মিনিটে। সেখানে শুধু কাপড় বদলেই সে বেরিয়ে যায় এবং কারডিফ ও গেলিগায়েরের উদ্দেশে টিকিট কাটে। পথিমধ্যে সে অনেককেই বলে যে, তার গাড়ি চুরি হয়েছে এবং একেক বার একেক রকম কাহিনি বলতে থাকে। পরদিনই খবরের কাগজের প্রথম পাতায় তার গাড়িটির ধ্বংসাবশেষের ছবিসহ দুর্ঘটনার বিস্তারিত ছাপানো হয়। গেলিগায়েরে যারা তাকে চিনত তারা জিজ্ঞেস করে যে এটি তারই গাড়ি কিনা। সে উত্তরে না বলে এবং লন্ডন ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কারডিফে যাওয়ার পথেও সে সবাইকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনায় তার গাড়ি চুরির কথা বলতে থাকে। হ্যামারস্মিথে (Hammersmith) পুলিশের সাথে দেখা হওয়ার পর যেন সে স্বস্তি পেয়েছিল।

তবে তার ভয়ংকর স্বীকারোক্তির ঘটনা ঘটে আরও কয়েক মাস পর। সে প্রথমে দাবি করেছিল যে, সে সেন্ট অ্যালবানসে একজন পর্যটককে তার গাড়িতে উঠিয়েছিল। এরপর হুইস্কির প্রভাবে রাস্তা হারিয়ে ফেলে অন্যদিকে চলে যায়। সেখানেই তার গাড়ির ইঞ্জিনে গোলমাল দেখা গেলে সে গাড়িটি একপাশে নিয়ে পরীক্ষা করতে নামে। সেই লোকটিকে ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে সে ইঞ্জিনটি দেখতে নামে। এরপর প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে যাওয়ার আগে লোকটিকে পেট্রোলের ক্যান থেকে ট্যাংকটি ভরার অনুরোধ করে। লোকটি একটি সিগারেট চেয়েছিল তার কাছে। সিগারেট দিয়ে সে একটু দূরে যায়। পর মুহূর্তেই সে বিস্ফোরণের আওয়াজ পায় এবং ঘুরে অগ্নিকাণ্ড দেখতে পায়। সে দৌড়ে গাড়ির কাছে যেতে চাইলেও প্রচণ্ড তাপে কাছে ভিড়তে পারেনি। এরপর সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে যায় এবং এমন পরিস্থিতিতে কী করবে তা বুঝতে না পেরে পালিয়ে যায়। এটি একটি বিশ্বাসযোগ্য গল্প ছিল, কিন্তু বার বার তার বর্ণনা বদলে যাওয়াতে সে শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে যায়। নর্থামটনের কারাগারে পৌঁছতে পৌঁছতেও সে বেশ কয়েকবার কাহিনি বদলে ফেলেছিল। তার মামলার শুনানি শুরু হয় ১৯৩১ সালের ২৬ জানুয়ারি। প্রসিকিউশনের দায়িত্বে ছিল নরম্যান বির্কেট (Norman Birkett)। তার হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করা বেশ কষ্টসাধ্য হচ্ছিল এবং রাউস তা বুঝে যায়। সে আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত বিফল হয়। রাউসকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাদল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তার মস্তিস্কে আঘাতের কারণে। তার খুব কাছে একটি বিস্ফোরণ ঘটে, যখন সে উত্তর ফ্রান্সের গিভিঞ্চিতে (Givenchy, Northern France) ছিল। ১৯১৮ সালে তার মেডিকেল রিপোর্টে বলা হয়, 'এই ব্যক্তি অতি সহজেই উত্তেজিত হয়ে যায় এবং অত্যন্ত

বাচাল।' তার মানসিক ভারসাম্যহীনতার অজুহাত এই সুপরিকল্পিত হত্যার দায় থেকে তাকে মুক্ত করতে পারেনি। যখন বির্কেট তাকে বলে যে, সে উদাসীনভাবে লোকটিকে আগুনে ছুড়ে ফেলেছে সে মাথা নিচু করে বলে যে, সে এতটা বোকা নয় এবং তর্ক করতে থাকে। এটি তার বোকামি ছিল। যখন বিচারকেরা আলাপ করছিল যে, কার্বুরেটরের ঢাকনাটি পড়ে গিয়েছিল নাকি গলে গিয়েছিল তখন একজন আইনজীবী রাউসকে মুখ টিপে হাসতে লক্ষ্য করে। সে গাড়ির ইঞ্জিনের ত্রুটি পরীক্ষা করে দেখারও অনুরোধ করে এবং বলে ইঞ্জিনের ক্ষতিতেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তার এসব আচরণ তার অপরাধকে বরং প্রমাণিত করছিল। তবে এই মামলার সবচেয়ে সাংঘাতিক তথ্য প্রমাণ দেয় প্যাথলজিস্টেরা। স্যার বার্নার্ড স্পিলসবারি (Sir Bernard Spilsbury) এবং ডা. এরিক শ (Dr. Eric Shaw) প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তিটি তখনো জীবিত ছিল এবং অজ্ঞান ছিল যখন সে পুড়ছিল এবং তার কাপড়ের একটি ছোট্ট আবিষ্কৃত টুকরা পেট্রোলে ভেজা পাওয়া যায়। তারা ধারণা করল যে, মৃতের উপরে আগে থেকেই পেট্রোল ছিটানো ছিল। ১৯৩১ সালের ৩১ জানুয়ারি মি. জাস্টিস ট্যালবট (Mr. Justice Talbot) রাউসকে সবচেয়ে জঘন্য ও সুপরিকল্পিত হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়। তার মামলার শুনানি শেষ হতে প্রায় ২৩ দিন সময় লেগেছিল এবং তাকে বেডফোর্ডে (Bedford) ফাঁসি দেওয়া হয়।

পরবর্তী হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা হলো টেজনার (Tetzner)। তাকে ১৪ মাস কাস্টডিতে রাখা হয়েছিল। সেও রাউসের মতোই গাড়ি পুড়িয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার দশ দিনের মধ্যেই তাকে গ্রেফতার করা হয় বেভারিয়ার এটারহসেন (Etterhausen, Bavaria) থেকে। সময়টি ছিল ১৯২৯ সালের ২৫ নভেম্বর। গাড়ির অগ্নিদগ্ধ দেহটি উদ্ধারের পর তা তার স্ত্রী ফ্রাও টেজনার (Frau Tetzner) নিজের স্বামী হিসেবে শনাক্ত করেছিল। পরে তা কবরস্থ করা হয়। কিন্তু পুলিশের সন্দেহ হয় যখন মৃত্যুর পর পরই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে সে প্রায় ৭৫০০ পাউন্ড পায়। জীবনবীমাটি খুব বেশিদিন হয়নি বলে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে পুলিশকে জানায়। পুলিশ ফ্রাওকে নজরে রাখতে শুরু করে। তারা খুঁজে বের করে যে প্রতিবেশীর বাড়িতে ফ্রাওয়ের কাছে দুটি ফোন এসেছিল। হার স্ট্র্যানেলি (Herr Stranelli) নামের এক ব্যক্তি অ্যালসেসের স্ট্র্যাসবোর্গ (Strasbourg, Alsace) থেকে ফোন করেছিল। স্ট্র্যানেলি ও টেজনার যে একই ব্যক্তি তা আবিষ্কার করতে বেশিদিন লাগেনি। স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে টেজনার রাউসের চেয়েও বেশি ধাঁ ধাঁ করছিল। সে জীবন বীমা জালিয়াত করার কথা প্রথমেই স্বীকার করে। এরপর সে বলে যে, সে তার গাড়িতে ওঠা পথিককে হত্যা করেছে। তবে গ্রেফতারের পাঁচ মাস পরই সে কাহিনি বদলে ফেলে। সে তখন বলে যে, তার গাড়িতে যাত্রীটি একজন আহত পথিক ছিল, যার

উপর দিয়ে তার গাড়িটি চলে গিয়েছিল। সে বলে যে, লোকটিকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য সে তার গাড়িতে উঠিয়ে নিয়েছিল। তবে কোনো মানুষকে গাড়ি চাপা দেওয়ার কাহিনি ঢাকতে খুনের ঘটনা সাজানোর ব্যাপারটি কোর্ট কোনোভাবেই গ্রহণ করেনি। এরপর টেজনার নতুন কাহিনি বলা শুরু করে। সে বলে যে, তার গাড়ির প্রথম যাত্রী কিছুক্ষণ পরই গাড়ি থেকে নেমে যায়। এরপর সে দ্বিতীয় যাত্রী অ্যালিওস অর্টনারকে (Alios Ortner) গাড়িতে নেয়। এরপর সে একটি ইথারে ভেজা রুমাল ও একটি হাতুড়ি নিয়ে অর্টনারকে হামলা করে। সে অর্টনারকে সম্ভ্রান্ত দেখানোর জন্য তার একটি শার্ট পরিয়ে তার দাড়ি কামিয়ে দেয়। অর্টনার বেশ শক্তিশালী হওয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পায় এবং সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হয়। অর্টনারকে এই মামলায় প্রসিকিউশন উইটনেস হিসেবে রাখা হয়। পরে জানা যায়, পালানোর পর অর্টনার পুলিশের কাছে গেলেও তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি এবং মাতাল ভেবে তাড়িয়ে দিয়েছে।

টেজনারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং তা কার্যকর করা হয় ১৯৩১ সালের ২ মে। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে সে শেষপর্যন্ত তার অপরাধ স্বীকার করে। সে বলে যে, সে একজন অপরিচিত যুবককে গাড়িতে উঠিয়েছিল পথিমধ্যে নামিয়ে দেওয়ার কথা বলে। লোকটি বলছিল যে তার কাছে গরম কাপড় নেই এবং শীতের রাতে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। টেজনার তাকে একটি কম্বল দিয়ে প্যাঁচিয়ে তার হাত আটকে ফেলে। তৎক্ষণাৎ তার গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তাকে হত্যা করে। এরপর গাড়িটি ইচ্ছা করে একটি বড় গাছের সাথে ধাক্কা লাগিয়ে গাড়ি থেকে পেট্রোল বের করে ফেলে। এরপর সে গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

পরবর্তী হত্যাকারী সম্পর্কে বলা হয় যে, সে রাউসের গুরুও হতে পারত। রাউস এই জার্মান খুনির পরিকল্পনার কথা জানত কিনা তা জানা যায়নি কিন্তু তা অসম্ভব কিছু নয়। তার পরিকল্পনাটিও এমনই ছিল। সেও অন্য ব্যক্তির দেহ ব্যবহার করে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চেয়েছিল তবে কিছুটা ভিন্ন উপায়ে।

ফ্রিটজ স্যাফ্রান (Fritz Saffran) একজন সুদর্শন ও সম্ভাবনাময় যুবক ছিল। সে পূর্ব প্রুসিয়ার রাস্টেনবার্গে (Rastenburg, Eastern Prussia) প্লাট্জ ফার্নিচার স্টোরে (Platz Furniture Store) ম্যানেজার হিসেবে চাকরিরত ছিল। দোকানটির মালিকের মেয়ের সাথে কিছুদিন পর তার বিয়ে হয়। তার শ্বশুর কয়েক মাস পর তার ব্যবসার সকল দায়িত্ব ৩০ বছর বয়সী স্যাফ্রানকে দিয়ে দেয়। এরপর ১৯৩০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তার দোকানে ভয়ংকর বিস্ফোরণ হয় এবং আগুনের লেলিহান শিখায় নিমেষে দোকানটি ধ্বংস হয়ে যায়। ত্রিশজন কর্মী পালাতে পেরেছিল কিন্তু একজন পারেনি। দোকানের প্রধান কেরানি এরিখ কিপনিক (Erich Kipnik) বলে যে, সে স্যাফ্রানকে জ্বলন্ত দোকানে ছুটে যেতে দেখেছে কর্মচারীদের সাহায্য করার জন্য। দোকানের অগ্নিদগ্ধ স্তূপ থেকে একটি

পোড়া মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার গায়ে স্যাফ্রানের স্যুটের অংশবিশেষ, তার দু'টি আংটি ও পকেটে তার কারুকার্যময় ঘড়িটি পাওয়া যায়। কোনো সন্দেহ থাকে না যে, এটি তারই মৃতদেহ। সে তার কর্মচারী ও ক্রেতাদের বেশ প্রিয় ছিল, সবাই তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে। তবে একজন কর্মচারী শোক সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ছিল না। সে হলো এলা অগাস্টিন (Ella Augustin)। যে বহু বছর ধরেই তাকে ভালোবাসত। স্যাফ্রান সরাসরি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। সে তার সংসারজীবনে বেশ সুখী ছিল।

অগ্নিকাণ্ডের দুইদিন পর এলা এলাকার বেশ কয়েকটি গ্যারেজে ফোন করে তার অসুস্থ মাকে কোনিগসবার্গ (Konigsbarg) থেকে আনার জন্য একটি গাড়ি ঠিক করার জন্য। কিন্তু চালক অত্যন্ত অবাক হয় যখন তাকে রাত ৩টায় সময় আসতে বলা হয়। সে আরও হতবাক হলো যখন দেখল এলার অসুস্থ মা আসলে স্যাফ্রান। সে তাকে নিয়ে জারডাওয়েন (Gerdauen) পর্যন্ত গিয়ে আরও অগ্রসর হতে রাজি হয়নি। সে এর আগে প্লাটজে কাজ করত ও স্যাফ্রানের অনেক অবদান ছিল তার প্রতি। সে পুলিশে অভিযোগ করেনি কিন্তু তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে এ ব্যাপারে জানায়। পরে তাকে গ্রেফতার করা হয় স্যাফ্রনকে পালাতে সাহায্য করার দায়ে, যদিও শেষপর্যন্ত তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। সে বন্ধুটি কাহিনি শুনে বুঝতে পারে যে, প্লাটজ স্টোরে আপাত দৃষ্টিতে যা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে তা সত্য নয়। স্যাফ্রান নিজেই সবকিছু পুড়িয়ে দিয়েছে। সে সাথে সাথে পুলিশকে জানায়।

স্যাফ্রান প্লাটজের দায়িত্বে আসার পর থেকেই দোকানে ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল। সে প্রায়ই পাওনা হিসাব জালিয়াতি করে টাকা চুরি করত। এ কাজে সাহায্য করত তার গুপ্ত প্রেমিকা এলা। এলাকেও গ্রেফতার করা হয় স্যাফ্রানকে সাহায্য করার জন্য। সে এরই মধ্যে স্যাফ্রানের কাছে চিঠি পাঠানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তাকে কড়াভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে বলে যে, স্যাফ্রান বার্লিনে (Berlin) তার এক আত্মীয়ের সাথে আছে। স্যাফ্রান কোনোভাবে খবর পেয়ে গিয়েছিল যে, পুলিশ তার পিছ লেগেছে। তার পালানোর সাত সপ্তাহের মধ্যেই সে তার আত্মীয়ের পরিচয়পত্র চুরি করে স্প্যানডাও (Spandau) শহরতলীর একটি ট্রেনে উঠে। এরপর ১টায় হ্যামবার্গে (Hamburg) পৌঁছে সে ব্রাজিলে যাওয়ার জন্য জাহাজের টিকেট কাটে। তবে এখানে তার পরিকল্পনা কাজে আসেনি। স্প্যানজাও রেলস্টেশনের রেল অফিসার কয়েক বছর আগে র‍্যাস্টেনবার্গে থাকত। সে দেখামাত্রই অপরাধীকে চিনে ফেলল। তার পরবর্তী গন্তব্যস্থল উইটেনবার্গে পৌঁছানোর আগেই পুলিশ সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

প্লাটজ স্টোরের মৃতদেহটির ডেন্টাল রিপোর্ট প্রমাণ করে যে, দেহটি ফ্রেডরিখ ডাল (Fredrich Dahl) নামের ২৫ বছর বয়সী এক ডেইরীম্যানের। তার বাড়ি

ছিল কোনিগসবার্গের ওয়েমসড়র্ফে (Wermsdorf)। ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ স্যাফ্রান ও কিপনিক উভয়কেই গ্রেফতার করা হয়। কিপনিককে হত্যায় সাহায্য করার ও জালিয়াতির দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। স্যাফ্রানের ওপর হত্যা ছাড়াও ৩০ জন কর্মচারীকে হত্যার প্রচেষ্টা, জালিয়াতি, চুরি, জীবনবীমার জালিয়াতির দায় ছিল এবং এলাকে হত্যা, পালানো ও জালিয়াতিতে সাহায্য করার দায়ে গ্রেফতার করা হয়। মামলার শুনানি শুরু হলে তারা তিনজনই একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগে। এথেকেই ঠান্ডা মাথায় সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের রূপ প্রকাশ পায়। এলা বলে যে, স্যাফ্রানই এটি শুরু করেছে। সে নাকি খবরের কাগজ দেখিয়ে বলেছিল, ' তোমরা কি খবরের কাগজ পড়েছ? দেখেছ এই টেজনার নামের লোকটি কি করেছে। আমাদের কাজও এভাবেই হবে।'

স্যাফ্রান বলে যে, সে ৭০০০ পাউন্ড মূল্যে ইন্স্যুরেন্স করিয়েছিল যেন তার স্ত্রী ভালোভাবে চলতে পারে। সে দেনায় ভারগ্রস্ত হয়ে হতাশ হয়ে পড়ছিল ও আত্মাহূতি দিতে চাইছিল। এলা তাকে কিপনিক একটি দেহ পোড়ানোর বুদ্ধি দেয়। তারা প্রথমে কবর খুঁড়ে একটি মৃতদেহ বের করার চিন্তা করে কিন্তু পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত বদলায়। কেননা তাতে ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তারা শহরের বাইরে বিভিন্ন গ্রামে তিনজন আলাদা গাড়িতে শিকার খুঁজে বেড়াত। তাদের মার্ডার ক্যাম্প ছিল নিকোলাই ফরেস্টের (Nikolai Forest) কাছাকাছি গ্রামগুলোতে। অনেকেই পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। একদিন একজন তার গাড়িতে উঠতে রাজি হয়। কিপনিক তার সাথেই ছিল। স্যাফ্রান গাড়ি অত্যন্ত জোরে চালিয়ে হঠাৎ ব্রেক কষে এবং ঝাঁকি লাগার সাথে সাথেই কিপনিক লোকটির মাথায় আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করার চেষ্টা করে। কিন্তু এলা ভয় পেয়ে হঠাৎ কিপনিকের হাত ধরে ফেলাতে লোকটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর তারা একজনকে হত্যা করতে গিয়ে করেনি। কেননা সে বলেছিল যে, তার ছয়টি ছোট ছোট সন্তান আছে। শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত শিকার পায় তারা ১৯৩০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। সে ব্যক্তিটি ছিল ফ্রেডরিখ ডাল। তার সাথে স্যাফ্রান ও কিপনিকের দেখা হয় লুইসেনহফে (Luisenhof), তখন প্রায় মধ্যরাত। তারা পর পর তিনটি গুলি করে। তারা একে অপরকে গুলির জন্য দায়ী করা শুরু করে। কোর্ট তাদের থামার আদেশ দিলেও তাদের তর্কাতর্কি চলতেই থাকে। স্যাফ্রান বলে, 'আমি দুই রকম জীবনযাপন করছিলাম। বাড়িতে আমাকে সর্বদা প্রাণোচ্ছল থাকতে হতো যেখানে আমার অন্তর ভেঙে পড়ছিল। আমাকে জোর করে এ পথে আনা হয়েছে।' কিপনিক বলে, 'আমার জীবন নষ্ট করেছে স্যাফ্রান, আমি আমার ভাগ্য কোর্টের হাতের কাছে সমর্পণ করলাম। আমি যদি প্রমাণ করতে পারতাম যে আমি একজন ভদ্র মানুষ।

জুরি শেষপর্যন্ত স্যাফ্রান ও কিপনিককে মৃত্যুদণ্ড দেয়। এলাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে স্যাফ্রান ও কিপনিক রাউসার ও টেজনারের তুলনায় সৌভাগ্যবান ছিল বলতে হবে। প্রুসিয়ান সরকার তাদের মৃত্যুদণ্ডের সাজাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে লঘু করে দেয়। অনেক জার্মান জনগণ এটা ভেবেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল যে, কীভাবে এতটা ঠান্ডা মাথায় অচেনা মানুষকে অবলীলায় হত্যা করে গিয়েছে নির্দোষ পথিকদের।

দ্য র‍্যাট পয়সনার

লিডিয়া শেরম্যান (Lydia Sherman) যেখানেই যেত সে শুধু ইঁদুরে ভরা বাড়ি খুঁজে পেত। সত্য মিথ্যা যা-ই হোক– এ কথাটিই সে বিষ কেনার সময় বিক্রেতাদের বলত। তার কেনা আর্সেনিক বাড়ির সব ইঁদুর মেরে ফেলত এবং পরে দেখা যায় ইঁদুরের সাথে সাথে কিছু মানুষকেও মেরে ফেলেছিল, যারা তার পথের কাঁটা ছিল। লিডিয়ার হাতে প্রায় ৪২ জন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে বলে জানা যায়।

লিডিয়ার জন্ম হয় ১৮২৪ সালে নিউ জার্সির বার্লিংটনে (Burlington, New Jersey)। তার নাম রাখা হয় লিডিয়া ড্যানবারি (Lydia Danbury)। নয় বছর বয়সে সে তার পিতা-মাতাকে হারায় এবং শৈশব কাটে তার চাচার কাছে। তার শৈশবের মিষ্টি আচরণ থেকে তার খুনি চরিত্রের আঁচ করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ১৬ বছর বয়সে সে নিউ ব্রুনসউইকে (New Brunswick) দর্জির কাজ নেয় এবং সেখানকার মিথোডিস্ট চার্চে (Methodist church) যোগদান করে। এখানেই তার প্রথম স্বামী এডওয়ার্ড স্ট্রকের (Edward Struck) সাথে পরিচয় হয়। এডওয়ার্ড ছিল বিপত্নীক, তার চারটি সন্তান ছিল। লিডিয়ার সৌন্দর্য ও নম্র স্বভাব তাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে। কিছুদিন পর সে লিডিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে লিডিয়া তাতে সম্মতি দেয়। তাদের বিয়ের সময় লিডিয়ার বয়স ছিল বিশের কাছাকাছি।

এডওয়ার্ড বিয়ের পর সপরিবারে ম্যানহাটানে (Manhattan) বসবাস শুরু করে। সেখানে সে নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটন পুলিশ ফোর্সে (New York Metropolitan Police Force) চাকরি নেয়। আঠারো বছর সচ্ছল হাসিখুশি জীবনযাপন করার পর ১৮৬৪ সালে সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যায়। এডওয়ার্ডের প্রথম স্ত্রীর চার সন্তান ছাড়া তার ও লিডিয়ার নিজেদের আরও সাতটি সন্তান ছিল। এতবড় সংসার চালাতে এডওয়ার্ডের বেশ হিমশিম খেতে হতো কিন্তু তখনো তারা সুখী ছিল। ১৮৬৪ সালের শীতের মাঝামাঝি দিকে এডওয়ার্ডের জরুরি ভিত্তিতে ডাক পড়ে নিউইয়র্ক হোটেলের কাছে একটি খুন প্রতিরোধ করার জন্য। তার

সাথে ছিল আরও একজন অফিসার। কিন্তু হত্যা প্রতিহত করতে না পারায় তাকে সাজা দেওয়া হয়। পরে তার সাথের অফিসার সাক্ষী দেয় যে, এডওয়ার্ড চাইলেই অপরাধটি ঠেকাতে পারত কিন্তু সে স্বার্থপরের মতো পিছিয়ে গিয়েছে। এ ঘটনায় এডওয়ার্ডকে চাকরিচ্যুত করা হয়। চাকরি হারিয়ে এডওয়ার্ড অকূল পাথারে পড়ে যায় এবং দিনরাত মদ্যপান করা শুরু করে। এডওয়ার্ডের কোনো আয় না থাকায় সংসার প্রায় অচল হয়ে যাচ্ছিল। লিডিয়া এডওয়ার্ডের প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের খাবারে আর্সেনিক মিশিয়ে একে একে তাদের হত্যা করে। পর পর চারজন মানুষের মৃত্যুও কোনো সন্দেহের উদ্রেক করেনি। তারা প্রত্যেকেই তখন জ্বরে আক্রান্ত ছিল যখন তাদের বিষপ্রয়োগ করা হয়। আর লিডিয়া প্রতিবারই কোনো চিকিৎসক ডাকতে ভুল করেনি। সন্তানহারা হয়ে এডওয়ার্ড নিজেকে মদে আরও ডুবিয়ে দেয়। পুলিশের চিফ লিডিয়ার সাথে দেখা করে এডওয়ার্ডকে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয় এবং তার মাতলামি ও পাগলামি আওতার বাইরে যাবার আগেই তার কোনো ব্যবস্থা করতে বলে। চিফের কথাগুলো লিডিয়া শুনেছিল ঠিকই, তবে যথার্থ অর্থে নয়। একদিন মাতাল অবস্থায় এডওয়ার্ড বাড়ি ফিরে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে লিডিয়া চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়। চিকিৎসক মন্তব্য করে যে, তার যকৃত ও মস্তিষ্কের অবস্থা বেশি ভালো নয় এবং মদ্যপান থেকে বিরত রাখার পরামর্শ দেয়। সে বলে, মদ্যপান করতে থাকলে অচিরেই এডওয়ার্ডের মৃত্যু হবে। একদিন মাতাল এডওয়ার্ড ঘরে ফেরার পর লিডিয়া তাকে একবাটি ওটমিল (Oatmeal, যবের তৈরি তরল থকথকে সুজির ন্যায় খাদ্য) খেতে দেয়। তাতে মেশানো ছিল কিছুদিন আগে কেনা আর্সেনিক ও ইঁদুর মারার বিষ। সে রাতে এডওয়ার্ড আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরদিন আবারও চিকিৎসক আসে তাকে দেখতে কিন্তু তার অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। এডওয়ার্ড তার পরদিন সকাল ৮টায় মারা যায়। তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে অতিমাত্রায় মদ্যপানকে দায়ী করা হয়। একই বাড়িতে এতজনের মৃত্যুর পর এবারও কোনো সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। এর কারণ একেক জনের ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ দেখা গিয়েছিল। এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর লিডিয়া বেশ কিছু টাকা ও একটি বাড়ি পায়। কিন্তু খুব শীঘ্রই আবারও আর্থিক সঙ্কট দেখা দিল। এবার সে তার নিজের সন্তানদের একে একে হত্যা করতে থাকে। দুই বছরের মধ্যে সে তার ছয়টি সন্তানকে হত্যা করে। তার বড় মেয়ের নামও ছিল লিডিয়া, সে চাকরি করত ও অন্যত্র বাস করত। লিডিয়া প্রথমে তার সর্বকনিষ্ঠ তিন সন্তানকে বিষপ্রয়োগ করে। ছোট্ট উইলিয়াম (William) সেদিনই মারা যায়। চার বছর বয়সী এডওয়ার্ড (Edward) ও ছয় বছর বয়সী ম্যারি অ্যান (Mary Ann) প্রথমে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদেরকে দেখতে আসা চিকিৎসক বমির পরিমাণ দেখে আঁচ করে তাদের গ্যাস্ট্রিক ফিভার হয়েছে। কিছুদিন পরই ভয়ংকরভাবে বমি

করতে করতে তারা দু'জনেই মারা যায়। এর কিছুদিন পর ১৪ বছর বয়সী জর্জ (George) জ্বরে আক্রান্ত হয়। জর্জ পেইন্টারের কাজ করত এবং সপ্তাহে আড়াই ডলার আয় করত। চিকিৎসক এসে পরীক্ষা করে বলল যে, তার 'পেইন্টার'স কোলিক' (Painter's colic, শূলবেদনা) হয়েছে এবং সে আর এই কাজ করতে পারবে না। লিডিয়া তার অসুস্থ ও কাজ করতে অপারগ ছেলেকে বোঝা ভাবল। সে তার চায়ের সাথে আর্সেনিক মিশিয়ে দিলে জর্জ আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর সেও মারা যায় এবং মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হয় পেইন্টার'স কোলিক। এরপর বেঁচে রইল শুধু এলিজা (Eliza) ও বড় মেয়ে লিডিয়া। লিডিয়া বেশ ভালো বেতনের চাকরি করত। এলিজার জ্বর হওয়ার পর সে ভাবল এলিজাকে মেরে ফেললে তার আর কোনো বোঝা থাকবে না এবং সে বড় মেয়ের সাথে বসবাস করতে পারবে। সে এলিজার ওষুধের সাথে একটু একটু করে আর্সেনিক মিশিয়ে দিতে থাকল। চারদিনের মধ্যেই এলিজা মারা যায়। কিন্তু সবকিছু তার ইচ্ছামতো হয়নি। এর কিছুদিন পরই সে তার বড় মেয়ের মৃত্যুসংবাদ পায়। তার মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে অসুস্থ হয়ে ঘটেছিল। লিডিয়া তখন সম্পূর্ণ একা। খুব শীঘ্রই তার সমস্ত টাকা শেষ হয়ে গেল। সে বেশ কিছুদিন চেষ্টা করে বাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে কানেকটিকাটের স্ট্র্যাটফোর্ডে (Stratford, Connecticut) এক বৃদ্ধার দেখাশোনার চাকরি নেয় এবং সেখানেই থাকা শুরু করে। তখন লিডিয়ার বয়স ৪০ বছর। বয়সের ছাপ তাকে একদমই ছোঁয়নি। তার সুসজ্জিত পোশাক ও নম্র ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হতো। নতুন এলাকার প্রত্যেকেই তাকে পছন্দ করত এবং তার পারিবারিক দুর্যোগের কথা জেনে তার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল। তার নিষ্পাপ চেহারার ফাঁদে পড়ে ডেনিস হার্লবার্ট (Dennis Hurlburt) যার সাথে সেই বৃদ্ধার অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক ছিল। সে ছিল অত্যন্ত ধনী এবং বিপত্নীক। সে প্রথমে লিডিয়াকে বেশি বেতনে চাকরি দেয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ১৮৬৮ সালের ২২ নভেম্বর তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই সে ডেনিসকে একটু একটু করে বিষপ্রয়োগ করতে থাকে। প্রায় ১৪ মাস পর ডেনিস অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই সে মারা যায়। এবারও লিডিয়া চিকিৎসক ডেকেছিল এবং তার কাছ থেকে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়েছিল। প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেই সে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে বেশ সচেতন থাকত এবং কৌশলে নিজেকে সুরক্ষিত রাখত। তার প্রথম স্বামীর ভাই এ কারণেই সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও তাকে কিছুই করতে পারেনি। ডেনিসের কোনো সন্তান ছিল না, সে উইল করে সকল সম্পত্তি লিডিয়াকে দিয়ে যায়। তার ক্ষেত-খামারসহ একটি বাড়ি, নগদ দশ হাজার ডলার ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিক হয় লিডিয়া। কিছুদিন পর সে সবই বিক্রি করা শুরু করে। ডেনিসের মৃত্যুর অনেক পরে প্রমাণিত

হয়েছিল যে, ডেনিসের মৃত্যুর কারণ আর্সেনিকের বিষক্রিয়া। লিডিয়া তা অস্বীকার করে বলে, 'আমি এটিই বলতে চাই যে আমার জানামতে আমি মি. হার্লবার্টকে এমন কিছু কখনোই দেইনি, যা তার অসুস্থতার কারণ হতে পারে। তার ব্যবহার্য কাগজপত্রগুলো আমি একসাথে গুছিয়ে রাখতাম, সেখানে ইঁদুরের বিষ লেগে থাকতে পারে যা থেকে বিষক্রিয়া হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে আমি তা জানতাম না।'

ডেনিসের মৃত্যু তাকে আবারও বিয়ে করার জন্য মুক্ত করে দেয়। সে কানেকটিকাটের ডারবিতে (Derby) চলে যায়। সেখানে গিয়ে সে ডেনিসের মতো কোনো শিকার খুঁজতে থাকে। অর্থের নেশার চেয়ে হত্যা স্পৃহা তার মধ্যে ছিল বেশি। ১৮৭০ সালের এপ্রিলের মধ্যেই তার খোঁজ শেষ হয়। সে ধনী ব্যবসায়ী হোরাশিও নেলসন শেরম্যনের (Horatio Nelson Sherman) বাড়িতে তার শিশু সন্তানের দেখাশোনার কাজ নেয়। শীঘ্রই সে শেরম্যানকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে সফল হয়। শেরম্যান ছিল বিপত্নীক, তার চারটি সন্তান ছিল। এখানে লিডিয়ার কাজ বেশি সহজ ছিল না। চারজন সন্তান ছাড়াও ছিল শেরম্যানের সন্দেহবাগীশ শাশুড়ি, যে তাকে সবসময় চোখে চোখে রাখত। লিডিয়া প্রথমে শেরম্যানের দুই সন্তানকে একসাথে বিষপ্রয়োগ করে। ১৪ বছর বয়সী মেয়ে অ্যাডি (Addie) প্রথমে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার কিছুদিন পর তার ছোট ভাইও অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হলে তারা রোগের কারণ কিছুতেই ধরতে পারেনি। জ্বর, অসহ্য পেট ব্যথা ও বমি করতে করতে অ্যাডি মারা যায়। এর কিছুদিন পর তার ছোট ভাইও মারা যায়। চিকিৎসকেরা গ্যাস্ট্রিক ফিভারকে মৃত্যুর কারণ বলে ডেথ সার্টিফিকেট দেয়। শেরম্যানের দু'টি সন্তান তখনো বেঁচে ছিল। সর্বকনিষ্ঠ ছেলে ফ্রাঙ্কির (Frankie) বয়স ছিল কয়েক মাস। শেরম্যানকে খুশি রাখার জন্য লিডিয়া সবসময় ফ্রাঙ্কিকে অত্যন্ত যত্নে রাখত এবং মায়ের মতো তার লালন-পালন করত। শেরম্যানের শাশুড়ি লিডিয়াকে একেবারেই সহ্য করতে পারত না। তার মতে, সে থাকতে ফ্রাঙ্কিকে দেখার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করাটা শেরম্যানের উচিত হয়নি। শেরম্যান নিজেও বৃদ্ধাকে পছন্দ করত না। প্রতিদিনের অশান্তি ও সন্তানের মৃত্যুর শোকে সে নিজেকে মদ্যপানে ব্যস্ত রাখা শুরু করল। এটি লিডিয়ার জন্য তাকে হত্যার সহজ উপায় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু সবকিছু তার পরিকল্পনামতো হচ্ছিল না। শেরম্যান দিন দিন উন্মাদ মাতাল হয়ে যাচ্ছিল এবং সব টাকা উড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। একদিন তার শাশুড়ি আবারও লিডিয়ার সাথে ঝগড়া শুরু করলে সে মদ খেতে খেতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মাতাল অবস্থায় ফিরে আসার পর লিডিয়া তাকে বিছানায় শোয়াতে গেলে সে জড়ানো কণ্ঠে বলে 'ফ্র্যাঙ্কি মারা গেলেই ভালো হবে, তাহলে ওই বুড়িটা এখানে থাকার কোনো কারণ পাবে না।' এ কথাটি লিডিয়ার মনে ধরে,

সে পরদিনই ফ্র্যাঙ্কির দুধের বোতলে আর্সেনিক মিশিয়ে দেয়। শেরম্যানের আরেকজন মেয়ে অ্যাডার (Ada) খাবারেও বিষ মিশিয়ে দেয়। খুব শীঘ্রই তারা অসুস্থ হয়ে মারা যায়। আবারও চিকিৎসকেরা গ্যাস্ট্রিক ফিভারকেই কারণ বলে। লিডিয়া ভেবেছিল সবার অনুপস্থিতিতে শেরম্যানের পরিবর্তন হবে এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে সম্পত্তি লিখে দিবে। কিন্তু শেরম্যানের অবস্থা আরও খারাপ হলো। সে সর্বক্ষণ মাতাল থাকত ও লিডিয়াকে বেশ মারধর করত। লিডিয়া তখন সন্তান সম্ভবা ছিল। চিকিৎসকদের মতে বেশি বয়সে গর্ভবতী হওয়ার দরুন তার সন্তানের শারীরিক অবস্থা বেশি ভালো ছিল না। একদিন লিডিয়াকে প্রহার করার ফলে তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। লিডিয়া শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাকে মদ্যপান বর্জনকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যায়। শেরম্যান কয়েক সপ্তাহ সেখানে থাকার পর মদ বর্জন করার অঙ্গীকারও করে, কিন্তু তা বেশিদিনের জন্য নয়। কিছুদিন পরই সে তার পিয়ানো বিক্রি করে ৩০০ ডলারে এবং একটি পানোৎসবে যায়। এক সপ্তাহ পর সে বাসায় ফিরে আসে বেশ অসুস্থ হয়ে। লিডিয়া তার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তার ব্র্যান্ডির বোতলে বিষ মেশায়। মদ্যপ শেরম্যান মদের নেশায় ও অসুস্থতায় তার নিজের ডেথ ওয়ারেন্টে স্বাক্ষর দিয়ে দেয়। পরদিন সে তার পারিবারিক চিকিৎসকের কাছে যায় এবং বলে, 'আমারই কোনো ওষুধ হয়তো মদের কারণে বিপরীত প্রভাব ফেলছে আমার উপর'। ডা. বেয়ার্ডস্লে (Dr. Beardsley) তার কথায় পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেনি। ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সাথে শেরম্যানের উপসর্গগুলো ঠিক মিলছিল না, আবার মদ্যপানজনিত উপসর্গের সাথেও মিলেনি। তার বেশ সন্দেহ হলো এবং সে শেরম্যানকে পরদিন হাসপাতালে গিয়ে কিছু পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেয়। পরদিনই, ১৮৭১ সালের ১২ মে শেরম্যান মারা যায়। তবে এবার ডা. বেয়ার্ডস্লে নিশ্চিত থাকতে পারল না। সে অন্যদের মতো কোনোমতে চাক্ষুষ পরীক্ষা না করে পোস্টমর্টেমের আবেদন করল। লিডিয়া বুঝতে পারছিল যে, সে ধরা পড়ে গেছে যদিও ডা. বেয়ার্ডস্লে তার সন্দেহের কথা তাকে বুঝতে দেয়নি। সে দ্রুত যতখানি সম্ভব নগদ টাকা নিয়ে শেরম্যানের পোস্টমর্টেমের দিন নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওনা হয়। ডা. বেয়ার্ডস্লের অনুরোধে পুলিশ ও গোয়েন্দারা তাকে চোখে চোখে রাখছিল। পোস্টমর্টেম করে শেরম্যানের পাকস্থলিতে যে পরিমাণ আর্সেনিক পাওয়া গেছে তা একটি আস্ত সেনাদলকে হত্যার জন্য যথেষ্ট ছিল। ডা. বেয়ার্ডস্লে সাথে সাথে পুরো শেরম্যান পরিবারের সবার মৃতদেহ অটোপসি করার আবেদন করে। ছোট্ট ফ্রাঙ্কি থেকে শুরু করে সবার দেহেই প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছিল। এরপর পুলিশ লিডিয়ার পূর্ব ইতিহাস ঘেঁটে দেখে এবং ডেনিসের মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করে। এখানেও একই ফলাফল পাওয়া যায়। লিডিয়ার ওপর আরও একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।

লিডিয়াকে পলাতক অবস্থায় খুঁজে গ্রেপ্তার করা হয় ও কানেকটিকাটে এনে কারাগারে রাখা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে এগারোটি খুনের দায় স্বীকার করলেও বাকিগুলো স্বীকার করেনি। পুলিশ তার ১৭টি হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ পেয়েছিল। লিডিয়া এর আগে যেখানে ছিল, সে এলাকায় থাকাকালীন সময়ে প্রতিবেশীদের অনেকেরই একই ধরনের উপসর্গ দেখা গিয়েছিল মৃত্যুর আগে। ধারণা করা হয়, তাদেরকেও সে-ই বিষপ্রয়োগ করেছে। তা হলে তার হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২, যা আঁতকে ওঠার মতোই। লিডিয়া শেরম্যানের স্বাক্ষর করা ডেথ ওয়ারেন্ট দেখিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাচ্ছিল। বলছিল, 'আমি তো শুধু তাকে মদ্যপান করা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম।' পত্র-পত্রিকার সব স্থানে লিডিয়াকে আমেরিকা'স কুইন পয়সনার, পয়সন ফিন্ড (Poison Fiend) ইত্যাদি খেতাব দিয়ে তার পৈশাচিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হয়। নিজের ছয় ছয়টি সন্তানকে এভাবে বিষ দিয়ে হত্যা করার ঘটনা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। একজন মায়ের পক্ষে কীভাবে তা সম্ভব? তার ভাষ্যমতে প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ড সে ঘটিয়েছে মানবিক সমবেদনার কারণে। সে বলে, 'তাদের প্রত্যেকেই তো এমনিতেই অসুস্থ ছিল। তখন মারা না গেলে আরও বেশিদিন কষ্ট হতো।'

লিডিয়ার বিচারকার্য সংঘটিত হয় কানেকটিকাটের নিউ হাভেনে (New Haven) এবং আট দিন ধরে তার মামলার শুনানি চলে। তার বয়স ছিল তখন ৪৮ বছর। মামলার শুনানির প্রথম দিন থেকেই সে অত্যন্ত ছিমছামভাবে সুসজ্জিত পোশাক পরে এসেছিল। প্রথমদিন তার পরনে ছিল একটি কালো আলপাকা ড্রেস (Alpaca dress), সাদাকালো শাল, কালো দস্তানা, কালো লেসের পর্দাওয়ালা হ্যাট। তার সম্ভ্রম আবির্ভাব তার সাজা লঘু করতে সফল হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। প্রতিদিনই পরিপাটি হয়ে আসত এবং প্রতিটি প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত শান্তভাবে দিত সে। শেষপর্যন্ত তাকে শুধুমাত্র সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। তাকে যখন ওয়েদারসফিল্ড প্রিসনে (Weathersfield) নিয়ে যাওয়া হয়, সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে কোনোদিন কারাগারে মৃত্যুবরণ করবে না। তবে ভাগ্য তার সঙ্গ দেয়নি। ১৮৭৮ সালের ১৬ মে যখন তার মৃত্যু হয়, তখন সে কারাগারে বন্দিই ছিল।

দ্য ইয়র্কশায়ার রিপার

১৯৭৫ সাল, ৩০ অক্টোবর, গভীর রাতে যখন ভয়ংকর ও সাংঘাতিক বিকৃতভাবে ২৮ বছর বয়সী যৌনকর্মী উইলমা ম্যাককানের (Wilma McCann) মৃতদেহ লিডসের (Leeds) একটি খেলার মাঠে পড়ে ছিল, সেটি টহল পুলিশ ছাড়া অন্য কারো নজরে পড়েনি। খবরের কাগজগুলোতে দুই-একদিন সামান্য লেখালেখি হয়ে চাপা পড়ে যায় এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড। প্রতিবেশীরা বলতে লাগল যে, তার উগ্র পোশাক-আশাকই তার কপালে এই দুর্গতি বয়ে এনেছে। শুধু উইলমার চার সন্তান ও হাতেগোনা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তার হতভাগ্য মৃত্যুর শোক পালন করেছে। খুব শীঘ্রই উইলমার শহর চাপেলটাউন (Chapeltown) ও লিডসের লোকেরা তার ভয়ংকর পরিণতির কথা ভুলে গেল। তবে লিডসের সিআইডি প্রধান, ৪৮ বছর বয়সী ডেনিস হবান (Dennis Hoban) দুর্ভাগা মেয়েটির ক্ষতবিক্ষত শরীরটির ক্ষতি ও অত্যাচার ভুলতে পারল না। তার মাথার খুলিটি কোনো ভারী ভোঁতা বস্তু দিয়ে প্রচণ্ড আঘাতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার পেটে ১৫ বার ছুরির আঘাত করা হয়েছিল এবং পেটটি ফুটো ফুটো হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি আঘাতই ছিল অত্যন্ত বর্বর ও প্রমত্ত। চিফ সুপারিনটেনডেন্ট হবান একটি প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করল। সে বলল, 'এ কাজ নিশ্চয়ই কোনো উন্মাদ পিশাচের। এ ধরনের মানুষের ক্ষেত্রে সবসময়ই পুনরায় হামলা করার প্রবৃত্তি দেখা যায়।' তার কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল।

পরবর্তী পাঁচ বছরে এই হামলাকারী যাকে ইয়র্কশায়ার রিপার (Yorkshire Ripper) বলা হতো আরও ১২টি হত্যাকাণ্ড ঘটায়। সেই সাথে আরও সাতজনের অঙ্গচ্ছেদ করেছিল। সে ছিল এক ভয়ংকর রহস্যময় হিংস্র দানব যে ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের (West Yorkshire) প্রতিটি কোনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। শতাব্দীর সবচেয়ে বড় পুলিশী তৎপরতা সংঘটিত হয়েছিল তাকে খুঁজে বের করতে।

তার এই ভয়ানক ডাকনাম ১৮৮৮ সালের লন্ডনের ত্রাস 'জ্যাক দ্য রিপারের' (Jack The Ripper) স্মারক ছিল। তবে সে তার দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের আগে

খবরের কাগজের শিরোনামে আসেনি। ৪২ বছর বয়সী যৌনকর্মী মিসেস এমিলি জ্যাকসনের (Mrs. Emily Jackson) মৃতদেহ পাওয়া যায় চ্যাপেল টাউনের একটি রাস্তায়। উইলমা ম্যাককানের হত্যার তিন মাসের মধ্যে ১৯৭৬ সালের ২০ জানুয়ারি এ হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। এমিলির দেহও অত্যন্ত ভয়ংকরভাবে বিকৃত করা হয়েছিল। ভোতা অস্ত্র দিয়ে বার বার আঘাতে তার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ। সূক্ষ্ম ধারালো কিছু দিয়ে তার পেটে প্রায় ৫০টি ফুটা করা হয়েছিল। ধারণা করা হয়, অস্ত্রটি ছিল স্ক্রু ড্রাইভার। চিফ ইন্সপেক্টর হবান এই জঘন্য খুনিকে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। তিনি জনগণের কাছে অনুরোধ করেন যেন তারা পুলিশকে সর্বাত্মক সাহায্য করে। তিনি বলেন, 'আরও একটি পরিবারে শোকের ছায়া পড়ার আগে আমাদের এই খুনিকে ধরা অত্যন্ত জরুরি, আমি আপনাদের সাহায্য কামনা করছি।'

প্রথম হত্যাকাণ্ড পত্রপত্রিকাতে উপেক্ষিত হলেও দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা ফলাও করে পত্রিকায় ছাপানো হয়। ডেইলি এক্সপ্রেস (Daily Express) পত্রিকার জর্জ হিল (George Hill) তার প্রতিবেদনে এই জঘন্য হত্যাকারীকে ইয়র্কশায়ার রিপার ডাকনাম দেয়। পরবর্তী হত্যার ক্ষেত্রে খুনি বেশ সময় নিয়েছিল। ১৯৭৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সে আবারও হত্যা করে। এবারের শিকারও একজন যৌনকর্মী ছিল। ২৮ বছর বয়সী আইরিন রিচার্ডসনকে (Irene Richardson) অসংখ্য ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছিল সে। তার মৃতদেহটি পাওয়া যায় লিডসের রাউন্ডহে পার্কে (Roundhay Park, Leeds)। চ্যাপেলটাউন থেকে মাত্র এক-দেড় মাইলের দূরত্বে অবস্থিত রাউন্ডহে ছিল বেশ সম্ভ্রান্ত একটি এলাকা। এর তিন মাসের মধ্যেই রিপার তার ৪র্থ হামলা চালায় এবং এবারও শিকার ছিল একজন যৌনকর্মী। ৩২ বছর বয়সী টিনা এটকিনসনের (Tina Atkinson) লাশ পাওয়া যায় ২৪ এপ্রিল। তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। তার রক্তাক্ত দেহ পাওয়া যায় চ্যাপেলটাউনের রেড-লাইট এরিয়ায় অবস্থিত ব্রাডফোর্ডের লাম্বলেনের (Lumb Lane, Bradford) একটি ফ্ল্যাটবাড়িতে। তার দেহেরও একই অবস্থা ছিল যা পূর্ববর্তী শিকারদের ছিল।

প্রথম তিনটি হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারী তার কিছু চিহ্ন রেখে গিয়েছিল, যা পুলিশের তদন্তে বেশ কাজে লাগে। একই ধরনের হাতুড়ির আঘাত ছাড়াও সে আরও অনেক সূত্র ফেলে যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল একটি রক্তমাখা জুতার ছাপ যা এমিলির হত্যাকাণ্ডের স্থানে পাওয়া জুতার ছাপের সাথে হুবহু মিলে যায়। এসব সূত্র পাওয়ার পরও সিআইডি'র গোয়েন্দারা সফল হতে পারছিল না কেননা জনগণ তেমনভাবে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসছিল না। হয়তো তারা ভয় পাচ্ছিল যে, রিপার হয়তো তাদের হামলা করবে। দুই বছর পর আবারও দুটি হত্যাকাণ্ড ঘটে। জেইন ম্যাকডোনাল্ডের (Jayne MacDonald) হত্যাও

একইভাবে করা হয়। পরবর্তীতে খুনি নিজেই এই হত্যাকাণ্ড দুটির বর্ণনা দেয় পুলিশের কাছে। 'তার সোনালি চুলগুলো ছিল অনেক উজ্জ্বল ও পরিষ্কার। সে রাতে সেই চুলগুলো ছিল রক্তে ভেজা ও আরও চকচকে, এই দৃশ্যটি বেশ কষ্টকর ছিল। পরবর্তী রাতগুলোতে দৃশ্যটি আমাকে অনেক ভয় দেখিয়েছে।' সেই মুহূর্ত থেকে তার বাবা নিজের মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিল। ১৯৭৯ সালের ১১ অক্টোবর মেয়ের মৃত্যুর কিছুদিন পর উইলফ ম্যাকডোনাল্ড (Wilf MacDonald) মারা যায়।

ততদিনে তার খুনের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়ে। ২১ বছর বয়সী জিন জর্ডান (Jean Jordan) কে হত্যা করে অত্যন্ত বর্বরভাবে তার অঙ্গচ্ছেদ করা হয়। ১৯৭৭ সালে ১ অক্টোবর তার লাশটি গভীর রাতে ম্যানচেস্টারের রাস্তায় পাওয়া যায়। ১৯৭৮ সালের ২১ জানুয়ারি ব্র্যাডফোর্ডে ২২ বছর বয়সী যৌনকর্মী ইভোনে পিয়ারসনকে (Yvone Pearson) হত্যা করে একইভাবে। তার গলিত-পচিত দেহটি ২৬ মার্চের আগে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর ৩১ জানুয়ারি ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের হাডার্সফিল্ড (Huddersfield) রেললাইনের পাশে আরও একটি লাশ পাওয়া যায়। মৃতদেহটি ছিল ১৮ বছর বয়সী হেলেন রিটকার (Helen Rytka)। ১৭ মে ম্যানচেস্টারের রয়েল ইনফার্মারির (Manchester Royal Infirmary) মাঠে ৪১ বছর বয়সী ভিরা মিলওয়ার্ড (Vera Millward) নামের এক যৌনকর্মীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল হ্যালিফ্যাক্সের সেভিল পার্কে (Savile Park, Halifax) ১৯ বছর বয়সী জোসেফাইন হুইট্যাকারকে (Josephine Whitaker) মৃত পাওয়া যায়। সে একজন সম্মানিত স্থপতি সমিতির কর্মচারী ছিল। এরপর সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ বারবারা লিচ (Barbara Leach) নামের ২০ বছর বয়সী ব্র্যাডফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক ছাত্রীকে হত্যা করে ইয়র্কশায়ার রিপার। প্রত্যেকের মাথা আঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের পেটে ছিল ছুরির আঘাত। ছুরি দিয়ে তাদের যৌনাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত করে ফেলা হয়েছিল। জঘন্যতার শেষ সীমাও এই জঘন্য খুনি অতিক্রম করে ফেলেছিল।

এরই মধ্যে একদিন এই তদন্ত একটি চমকপ্রদ ঘটনার মাধ্যমে অন্যদিকে মোড় নেয়। একটি ক্যাসেটের মাধ্যমে খুনি তার কিছু কথাবার্তা রেকর্ড করে পুলিশের কাছে পাঠায়। ২৬ জুন এসিস্ট্যান্ট চিফ কনস্টেবল জর্জ ওল্ডফিল্ড (Assistant Chief Constable George Oldfield) সেটি প্রেস কনফারেন্সে চালিয়ে সবাইকে শোনায়। রেকর্ড করা কথাগুলো ছিল এ রকম, 'আমি জ্যাক। দেখছি যে আমাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে ভাগ্য তোমাদের কোনো সাহায্য করছে না। আমার সর্বোচ্চ সম্মান জর্জ তোমার প্রতি কিন্তু তুমি তো আমাকে ধরার ধারে কাছেও নও। এখনও সেখানেই আছ, যেখানে ছিলে চার

বছর আগে, যখন আমি এসব শুরু করি। তুমি হয়তো তোমার ছেলেদের আশাভঙ্গ করছ জর্জ। তুমি এর চেয়ে বেশি ভালো হতে পার না তাই না? তোমরা একবারই আমার খুব কাছে এসে পড়েছিলে। কয়েক মাস আগে চ্যাপেলটাউনে। আমি খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম। তাও সেটি তোমাদের গোয়েন্দা ছিল না, ইউনিফর্মওয়ালা পুলিশ ছিল।

তোমাকে মার্চেই বলেছিলাম যে, আবারও হামলা করব। দুঃখিত যে, আমার কথা মতো ব্র্যাডফোর্ডে পৌঁছতে পারিনি। আমি এখনও ঠিক করিনি যে, আবার কবে হামলা করব। তবে তা অবশ্যই এ বছরেই হবে, হয়তো সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে। যদি সুযোগ পাই আরও আগেও হতে পারে। তবে নিশ্চিত না যে, কোথায়। ম্যানচেস্টার হতে পারে। জায়গাটি ভালোই লাগে আমার। আর এখানে অনেক শিকারও আছে। এদের কখনোই শিক্ষা হয় না। আমি জানি, তুমি ওদের সাবধান করেছ কিন্তু ওরা তো শুনবে না তোমার কথা।

তোমার সাথে কথাবার্তা বলে বেশ ভালোই লাগল জর্জ। তোমার অনুগত, জ্যাক দ্য রিপার।'

এরপর থেকেই সবকিছু বদলে গেল। এই ক্যাসেটটি ব্যবহার করে গোয়েন্দারা তদন্ত শুরু করল। তারা খুনির গলার আওয়াজ ও উচ্চারণের রহস্যভেদে ডায়ালেক্ট বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগিয়ে দেয়। তারা বের করে যে এই কণ্ঠের মালিক সানডারল্যান্ডের ক্যাসেলটাউন (Castletown, Sunderland) জেলার কোনো ব্যক্তি। পুলিশ এবার রিপার হিসেবে 'জর্ডি' (Geordie) উচ্চারণের লোক খুঁজতে শুরু করল।

পিটার উইলিয়াম সাটক্লিফের (Peter William Sutcliffe) উচ্চারণ জর্ডি ছিল না। তার কণ্ঠ কিছুটা উচ্চ মাত্রার ছিল এবং স্পষ্টভাবে ভাওয়েলগুলোর উচ্চারণ করত তার আঞ্চলিক টানে, বিংগলির (Bingley) উচ্চারণে। জায়গাটি ব্র্যাডফোর্ড থেকে মাত্র কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। তার জন্ম ১৯৪৬ সালের ২ জুন। সে জন ও ক্যাথলিন সাটক্লিফের (John & Kathleen Sutcliffe) প্রথম সন্তান ছিল। তারা বিংগলিতেই সীমান্ত অঞ্চলে বন্য পতিত জমির কাছে একটি বাড়িতে থাকত। পিটার বেশ লাজুক ধরনের ছেলে ছিল। মেয়েদের সাথে কথা বলতে গেলে যেন লজ্জায় লাল হয়ে যেত। তার নম্র আচরণে তার মা-বাবা ও প্রতিবেশীরা প্রশংসামুখর থাকত। সে ১৫ বছর বয়সে কোটিংলি ম্যানর স্কুল (Cottingley Manor School) থেকে পাস করে ১৯৬১ সালের বসন্তে। এরপর তিন বছর বিভিন্ন স্থানে চাকরির সন্ধান করতে থাকে। বেশ কয়েকটি চাকরি বদলাবার পর ১৯৬৪ সালে সে বিংগলি সিমেট্রিতে (Bingley Cemetry) কবর খোঁড়ার চাকরি পায়। ১৯৬৫ সালে একটি ছোট বিরতির পর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সে এই কাজেই বহাল ছিল এবং এটি তার অত্যন্ত প্রিয় কাজ

ছিল। তাকে ১৯৬৭ সালে সময় মেনে না চলার কারণে চাকরিচ্যুত করা হয়। তার এই সময়টি জঘন্য ও অস্বাভাবিক পৈশাচিকতা পূর্ণ ছিল। সে মৃতের দেহ থেকে মূল্যবান আংটি, সোনার দাঁত চুরি করা ছাড়াও সেগুলো দিয়ে তার সহকর্মীদের ভয় দেখিয়ে বেড়াত। এছাড়া এমনিতেও তার মৃতদেহ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালো লাগত। এরপর সে অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে একটি মরর্চুয়ারিতে (Mortuary) চাকরি নেয়। সে তার বন্ধুদের কাছে গল্প করত কীভাবে পোস্টমর্টেমের সময় মৃতদেহ কেটে ফেলা হয়।

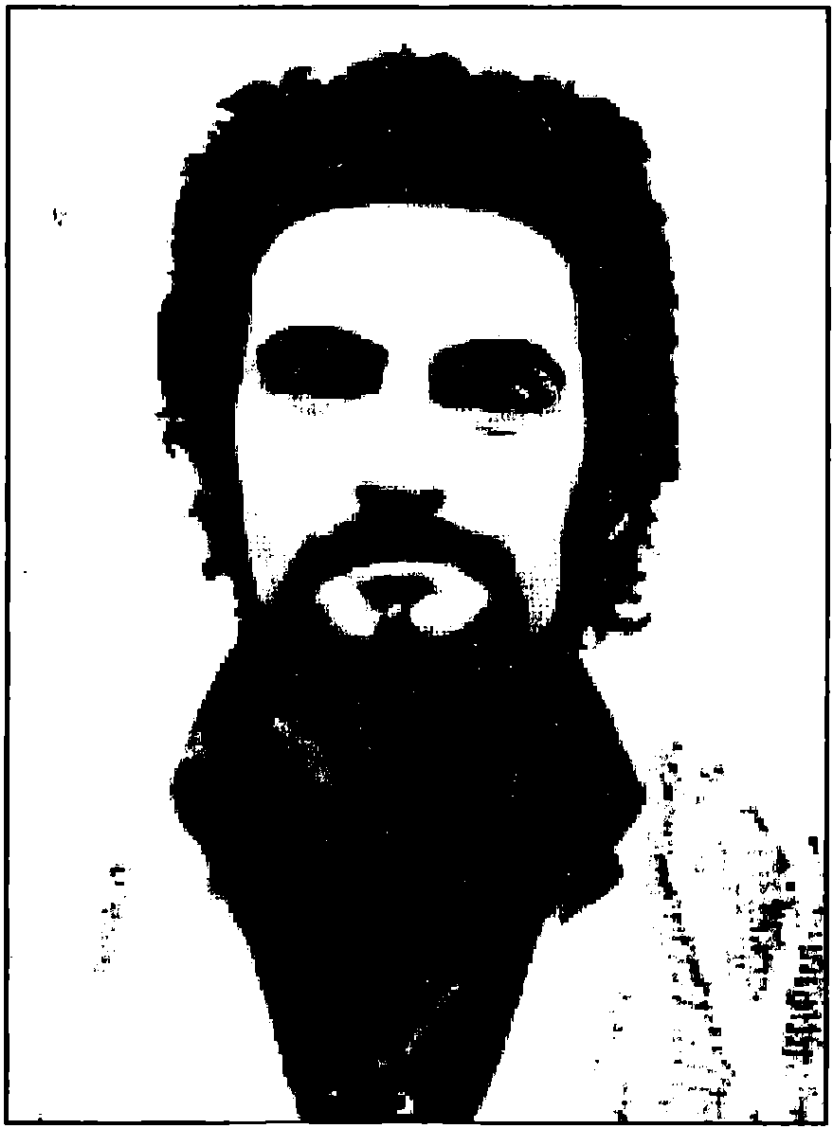

খুনি পিটার উইলিয়াম সাটক্লিফ

১৯৭৪ সালের ১০ আগস্ট সে ব্র্যাডফোর্ডের ক্লেটন ব্যাপিটিস্ট চ্যাপেলে (Clayton Baptist Chapel, Bradford) বিয়ে করে। সেদিন তার স্ত্রী সোনিয়া জুরমার (Sonia Szurma) জন্মদিন ছিল। ২৪ বছর বয়সী এই আকর্ষণীয় নারী পেশায় ছিল একজন শিক্ষিকা। লাজুক ও নম্র সোনিয়া তার

স্বামীর লাম্ব লেনে ও অন্যান্য যৌনকর্মীদের এলাকায় যাতায়াতের কথা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। এমনকি বিয়ের আগের রাতেই সে লাম্ব লেনে যৌনকর্মীদের সাথে একটি পার্টি করেছিল। লাম্ব লেন, লিডসের চ্যাপেলটাউন ও ম্যানচেস্টারের মস সাইডে (Moss Side, Manchester) তার অবাধ আসা-যাওয়া ছিল। বিয়ের ১৪ মাসের মাথায় সে উইলমাকে হত্যা করে এবং শুরু হয় এক রক্তপিপাসু জঘন্য পিশাচের ত্রাসের রাজত্ব।

পুলিশ তার ম্যানচেস্টার শিকারের হাতব্যাগে একটি নতুন ৫ পাউন্ডের নোট পেয়েছিল। তার সিরিয়াল নম্বর A W 51121565 খোঁজ করে দেখা যায় যে, তা ব্র্যাডফোর্ডের শহরতলী শিপলির মিডল্যান্ড ব্যাংক (Midland Bank, Shipley) থেকে পাওয়া। ব্যাংকের হিসাব মিলিয়ে দেখা যায় যে, সেটি পাঁচদিন আগে তোলা হয়েছিল। সেখানে আরও পুলিশ ও গোয়েন্দা আনা হয় এবং তদন্ত জোরদার করা হয়। প্রায় হাজারখানেক লোকের জবানবন্দি নেওয়া হয়। এদের মধ্যেই একজন ছিল লরি ড্রাইভার সাটক্লিফ। তার লরির ক্যাবে ছিল একটি হাতে লেখা নোটিস। সেটির লেখাটি ছিল এরকম, 'এই ট্রাকে ঘুমিয়ে আছে এক অসম্ভব জ্ঞানী ব্যক্তি। যদি তা ফাঁস হয় তবে তা সম্পূর্ণ জাতিকে মাতিয়ে রাখবে এবং তার অদ্ভুত শক্তি আশপাশের সবাইকে বশীভূত করে ফেলবে। তাকে ঘুমুতে দেওয়াই ভালো।'

গোয়েন্দারা যদি ব্যাংকের কাগজের স্বাক্ষর ও ট্রাকের লেখাটি মিলিয়ে দেখত তবে তাকে আরও ৮ বার জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিত না। তাকে এতবার জিজ্ঞাসাবাদে ডাকার কারণে তার বন্ধুরা তাকে রিপার বলে কৌতুক করত।

এদিকে শিক্ষিত সোনিয়ার প্রভাবে তার উন্নতি হতে থাকে। তার পোশাক ও চালচলন বদলে যায় এবং শীঘ্রই সে অভ্র এলাকার একজন সম্মানিত গাড়ি চালকে পরিণত হয়। কিছুদিন পর তারা হিটন স্ট্রিটে (Heaton Street) একটি চার রুমের বাড়িতে উঠল। তবে সেখানে আশ্চর্য ঘটনা ঘটত। প্রায়ই সোনিয়াকে তার উপর গলাবাজি করতে শোনা যেত। প্রতিবেশীরা শুনবে বলে সাটক্লিফের দোহাইও শোনা যেত পর্দার আড়াল থেকে। এটি খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এমন জঘন্য খুনি তার নিজের বাড়িতে এতটা নিরীহ হতে পারে। অনেকে বলে যে, সোনিয়ার প্রতি অপ্রকাশ্য ক্রোধেই সে এসব নিরীহ মেয়েদের প্রতি হামলা চালাত। প্রতিবেশীদের কাছে সে বিশ্বস্ত স্বামী, মনোযোগী কর্মচারী ও নম্র ব্যক্তি হিসেবেই পরিচিত ছিল। তার কোনো রূপই রিপার চরিত্রের সাথে মিলেনি। প্রথমে তার হত্যাস্পৃহার সাথে জ্যাক দ্য রিপারের মিল পাওয়া যায়, কেননা সে সব যৌনকর্মীদের হত্যা করছিল। কিন্তু জেইন, বারবারা, জোসেফাইন এরা কেউই যৌনকর্মী ছিল না। যেসব নারী তার হামলার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল ও প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল তাদের কেউই যৌনকর্মী ছিল না।

পিটার উইলিয়াম সাটক্লিফের শিকার

স্যাটক্লিফ কি সোনিয়ার প্রতি প্রতিশোধস্পৃহায় হত্যা করছিল নাকি সমস্ত নারী জাতিকেই সে ঘৃণা করত? ১৯৭২ সালে সে ও তার ভাইবোনেরা এটি আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের ধর্মপ্রাণ মা অনেক দিন ধরে পরকীয়া করে আসছে। সে ১৯৭৮ সালে মারা যায়। তার মতো সম্মানিত নারীর প্রতিমূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় সন্তানদের সামনে। তার ১২তম শিকারের সাথে তার মায়ের মিল ছিল। ৪৭ বছর বয়সী মারগো ওয়ালস (Margo Walls) WRAC এর একজন প্রাক্তন কর্মচারী ছিল। সে ছিল অবিবাহিত ও পুডসিতে (Pudsey) একাই থাকত। ১৯৮০ সালের ২২ আগস্ট কাজ শেষে ঘরে ফেরার সময় সে দেখে যে, অন্ধকার ফুঁড়ে একটি লোক তাকে হঠাৎই আঘাত করার উপক্রম করছে। সে ভয় পেলেও আঁচড়, কামড় ও ঘুষি দিয়ে জীবন বাঁচানোর প্রাণপণ

চেষ্টা করে। তবে শেষ পর্যন্ত সাটক্লিফ তার ঘাড়ে আঘাত করে ফাঁস লাগিয়ে তাকে নিস্তেজ করে ফেলে। এরপর একইভাবে তাকে পিটিয়ে হত্যা করে তার সম্পূর্ণ দেহ ছুরি দিয়ে চিরে ফেলে। এরপর তাকে রাস্তার পাশে টেনে এনে ঘাস ও লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দেয়। পুলিশ যখন মৃতদেহটি খুঁজে পায়। গলার ফাঁস তাদের চিন্তিত করে ফেলে, কেননা এ পদ্ধতি রিপার এর আগে ব্যবহার করেনি। আরও একজন উন্মাদ খুনির উপস্থিতি আশঙ্কা করে তারা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। ১৭ নভেম্বর সে আবারও হামলা করে এবং পুলিশের আর সন্দেহ থাকে না যে খুনি একজনই। এবারে শিকার ছিল ২০ বছর বয়সী জ্যাকলিন হিল (Jacqueline Hill)। সে লিডস ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিল। মেয়েটিকে মাথায় আঘাত দিয়ে হত্যা করে তাকে অ্যালমা রোডের (Alma Road) পাশে ঝোপে লুকিয়ে ফেলে। এরপর একটি চোখা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে মেয়েটির দেহে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লিখতে শুরু করে। সে মেয়েটির দেহ ক্ষতবিক্ষত করে লিখে, 'কারণ, মনে হচ্ছিল সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।'

আরও একটি হত্যাকাণ্ডে পুলিশের ওপর চাপ বেড়েই চলছিল। ২৫ নভেম্বর চিফ কনস্টেবল জর্জ একটি সুপার স্কোয়াড নামানোর পরিকল্পা করলেন। তিনি এই তদন্তের ভার তাদের কাছে হস্তান্তরিত করেন। এই মামলাটি হাতছাড়া হওয়া জর্জের জন্য সুখকর ছিল না। পাঁচ বছর ধরে তিনি দিন রাত এক করে রিপারকে খুঁজেছেন। তাকে ধরা তার একটি ব্যক্তিগত আক্রোশে পরিণত হয়েছিল, বিশেষ করে তাকে বিদ্রুপ করে সেই ক্যাসেটটি পাঠানোর পর থেকে। এদিকে সুপারিনটেনডেন্ট হবান যে এই তদন্ত শুরু করেছিলেন হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে তার পদে লিডসের সিআইডি প্রধান জিম হবসনকে (Jim Hobson) দায়িত্ব দেওয়া হয়। হবসন ও জর্জ সামনাসামনি দেখা করতেন না। হবসন এসেই প্রথমে জর্ডি উচ্চারণকে তদন্তের ভিত্তি হিসেবে বাতিল করে দেন। জর্জ তার নিজের ভাবমূর্তিকে যে ঝুঁকিতে ফেলেছিল তাই কিছু করতে পারেনি। এরপর হবসন একটি ঘোষণা দেন, 'রিপারকে যদি কেউ ধরতে পারে তবে সেটি সাধারণ ইউনিফর্মধারী পুলিশই হবে এবং তারা তাদের সাধারণ ডিউটিতেই তাকে অচিরেই গ্রেপ্তার করবে।'

ঠিক এটিই ঘটেছিল ১৯৮১ সালের ২ জানুয়ারি শুক্রবারে। সাটক্লিফ তার ১৪তম শিকারকে হত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মেয়েটি ছিল আভা রিভারস (Ava Reivers) নামের এক যৌনকর্মী, যে শেফফিল্ডে থাকত। তারা সাটক্লিফের রোভার V8 গাড়িতে করে শেফাফিল্ডের মেলবোর্ন ড্রাইভের (Melbourne Drive) দিকে যাচ্ছিল। তার সাথে রাত কাটানোর জন্য সাটক্লিফ তাকে দশ পাউন্ডের একটি নোট দিয়েছিল। গাড়ির পেছনের সিটেই ছিল হাতুড়ি, গলার ফাঁস ও চোখা স্ক্রু ড্রাইভারটি। একটি ছায়াযুক্ত গাছের নিচে গাড়িটি রেখে সে আভাকে

বলল, 'আমার ভয় লাগছে, খুব ভয় লাগছে।' তবে সত্যিকারের ভয় লাগছিল আভার। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল যে, এই লোকটি যে তার নাম বলেছে ডেভ (Dave) তার ক্ষতি করতে চাইছে। ঠিক এমন সময় একটি পুলিশের টহল গাড়ি এল রাস্তায় অবৈধভাবে পার্ক করা গাড়ি সরিয়ে দিতে। 'ডেভ' পুলিশ দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে যায় এবং জীবনে প্রথমবার আভা পুলিশ দেখে স্বস্তি পেল এবং পুলিশ স্টেশনে তাকে নিয়ে যাওয়া হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তাকে তার সঙ্গীর পরিচয় জিজ্ঞেস করে পুলিশ। তবে সে ভুল নামটি ছাড়া আর কিছুই বলতে পারে না। এরপর সাটক্লিফকে তার গাড়ির ভুয়া নম্বর প্লেট সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। সার্জেন্ট আর্থার আর্মিটেগের (Sergent Arthur Armitage) জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে সে বলে যে তার নাম পিটার উইলিয়ামস। অনেকক্ষণ ধরে তার সাথে কথা বলে হঠাৎই তার মাথায় আসে রিপারের কণ্ঠের সাথে এই ব্যক্তির উচ্চারণ ও কণ্ঠ মিলে। এরপর পরীক্ষা করে সে রিপারের সাউথ ইয়র্কশায়ারের উচ্চারণে বলে ওঠে, Thas't Ripper, thee!' এখানেই রিপারের দুঃস্বপ্ন শেষ হয়ে যায়।

১৯৮১ সালের ২২ মে শুক্রবার তার মামলার শুনানি হয় ওল্ড বেইলির প্রথম শ্রেণীর আদালতে। তাকে ১৩টি হত্যা ও ৭টি হত্যার প্রচেষ্টায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মি. জ্যাস্টিস বোরহ্যাম (Mr. Justice Boreham) তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। সে বলে, 'হোম সেক্রেটারির সাথে পরামর্শ করব। যদিও তোমার সর্বোচ্চ সাজা হয় ৩০ বছর যা আমার বিচার জীবনে সবচেয়ে অস্বাভাবিক লম্বা সাজাকাল তুমি অত্যন্ত ভয়ংকর একটি ব্যক্তি বলে আমি চেষ্টা করব তোমার সাজা যেন আক্ষরিক অর্থেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।' বর্তমানে স্যাটক্লিফ সর্বোচ্চ পাহারায় আইজেল অব উইটের পার্কহার্স্ট কারাগারে (Parkhurst Prison, Isle of Wight) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড খাটছে।

দ্য লিথাল রোমিও

খুনের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নয় যেখানে খুনিরা বিরহপীড়িত, ধনী ও সাদাসিধে চিরকুমারীদের প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে তাদের নিঃস্ব করে শেষপর্যন্ত হত্যা করেছে। এসব ক্ষেত্রে খুনিরা হয় প্রণয়াভিলাষী ও ধূর্ত যাদের মায়াজাল থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। সাধারণ মানুষেরা অনেকেই এসব ঘটনাকে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বললেও জর্জ জোসেফ স্মিথের (George Joseph Smith) কর্মকাণ্ডে পরিহাসের বিন্দুমাত্র ছিল না।

এই দুশ্চরিত্র ব্যক্তির জন্ম হয় ১৭৮২ সালে লন্ডনের বেথনাল গ্রিনে (Bethnal Green, London)। খুব শীঘ্রই সে তার বাবা-মায়ের হতাশায় পরিণত হয়। খুব অল্প বয়সেই তার মধ্যে অপরাধ প্রবণতা প্রকাশ পাওয়ায় তার মা আশঙ্কা করেছিল যে, অপরাধের কারণেই একদিন তার মৃত্যু হবে। যখন মাত্র নয় বছর বয়সেই তাকে আট বছরের সাজা দিয়ে গ্রেভসেন্ডের (Gravesend) সংশোধনাগারে পাঠানো হয়, তার মা একটুও অবাক হয়নি। এই সাজাতে সে আশা করেছিল তার ছেলের কিছুটা উন্নতি হবে। সংশোধনাগার স্মিথের চারিত্রিক সংশোধনের বদলে তা কলুষিত করেছিল বেশি। তার সাজার সময়কাল তাকে আরও ঘাঘু অপরাধীতে পরিণত করে। অন্যান্য অপরাধীদের সাথে থেকে সম্পূর্ণ সময়টি সে কাজে লাগিয়েছিল। এরপর তিন বছর সে সৈনিক হিসেবে নর্থামটনশায়ারে রেজিমেন্টে (Northamptonshire Regiment) থাকাকালীন সময়ে দক্ষ চোরে পরিণত হয়। ক'দিন জেলের বাইরে, ক'দিন ভেতরে এভাবেই চলতে থাকে তার জীবন। স্মিথ অত্যন্ত ধূর্ত ছিল। শীঘ্রই সে বুঝতে পারল যে, এভাবে নিজে ছোটখাটো চুরি করে খুব একটা লাভ হচ্ছে না। সে তার হয়ে চুরি করার জন্য অন্যদের কাজে লাগাতে লাগল।

স্মিথের একহারা দেহ সুঠাম ও আকর্ষণীয় না হলেও সে আশ্চর্যজনকভাবে মেয়েদের আকর্ষণ করতে পারত। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জ্বলজ্বলে কালো চোখগুলো বহু মেয়েকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে তারই এক শিকার পুলিশকে বলেছিল, 'তার এই চোখগুলোই ছিল সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার মতো, যেন জাদু করে ফেলে।

চুম্বকের মতো আমাকে আকর্ষণ করত।' চোখের সাহায্যে হোক বা তার মিষ্টি কথার জালের সাহায্যেই হোক, স্মিথ কোনো না কোনো কৌশলে মেয়েদের অতি সহজে প্ররোচিত করত তার হয়ে কাজ করার জন্য। এমনকি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে যেন ভুলেও তারা স্মিথের নাম না নেয় সে ব্যাপারেও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ছিল। এভাবে সে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে ফেলে। ১৮৯৭ সালে লিসেস্টারের রাসেল স্কয়ারে (Russell Square, Leicester) একটি রুটির দোকান খোলে। পরের বছর স্মিথ ক্যারোলিন বিটরাইস থর্নহিল (Caroline Beatrice Thornhill) নামের ১৮ বছর বয়সী এক মেয়েকে তার পরিবারের অমতে বিয়ে করে। তখন স্মিথের বয়স ছিল ২৬ বছর। সে নিজেকে জর্জ লাভ (George Love) বলে পরিচয় দিত। বিয়ের পর সে লন্ডনে বসবাস শুরু করে। তার স্ত্রী ব্রাইটন, হোভ ও হ্যাস্টিংসে (Brighton, Hove, Hastings) বিভিন্ন ধনী পরিবারে গৃহকর্মীর কাজ শুরু করে। এসব ধনাঢ্য পরিবারে কাজ পেতে তার কোনো সমস্যাই হতো না। স্মিথ তাকে বেশ কিছু সার্টিফিকেট তৈরি করে দিয়েছিল যা তার নিখুঁত কাজের প্রশংসা করত ও সহজেই তার চাকরি হয়ে যেত। এসব বাড়ি থেকে সে মূল্যবান বস্তু চুরি করে তার স্বামীকে দিত। তাদের জীবন বেশ ভালোই চলছিল, কিন্তু ১৮৯৯ সালে ক্যারোলিন তার মালিকের বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় অনেক রুপার চামচ, কিছু গহনা ও বেশ কিছু টাকাসহ ধরা পড়ে। তাকে গ্রেপ্তার করে এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গ্রেপ্তার হওয়ার সাথে সাথেই স্মিথ তাকে ত্যাগ করে, যা তাদের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করে। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর পরই সে পুলিশকে স্মিথের আসল রূপের কথা জানিয়ে দেয়। স্মিথের চলাফেরা ও গন্তব্য সবই ছিল তার নখদর্পণে তাই পুলিশ শীঘ্রই স্মিথকে ধরে ফেলে। ১৯০১ সালের জানুয়ারিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রচুর চুরির মালসহ ধরা পড়ায় তাকে দুই বছর সাজা দেওয়া হয়। তার মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিল। দুই বছর পর তার সাজা শেষ হবার পর পরই সে ক্যারোলিনের বাবার বাড়িতে যায় তাকে হত্যা করার উদ্দেশে। সেখানে ক্যারোলিনের পরিবারের সদস্যরা তাকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এরপর তারা ক্যারোলিনকে কানাডা পাঠিয়ে দেয় স্মিথের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

কিছুদিন কপর্দকহীন থাকার পর সে মেয়েদেরকে তার জীবিকার কাজে লাগানোর এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করল। ক্যারোলিনের গ্রেপ্তারের পর পরই ১৮৯৯ সালে সে আরেকটি বিয়ে করেছিল। তার দ্বিতীয় স্ত্রী ছিল মধ্যবয়স্ক, সে একটি বোর্ডিং হাউসের পরিচারিকা ছিল। স্মিথ তার সাথেই তার বাড়িতে থাকত এবং সেই সাথে তার সমস্ত টাকা-পয়সা চুরি করে যাচ্ছিল। এরপর সে দক্ষিণাঞ্চলে ভ্রমণ শুরু করল, বিশেষ করে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায়। সেখানে সে একাধিক মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং একের পর এক বিয়ে করে

যেতে থাকে। কিছুদিন পর পরই সে তার স্ত্রীদের ত্যাগ করে চলে যেত। এসব মেয়েদের কেউই লজ্জায় পুলিশ বা আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছে সত্যি কথা বলতে পারেনি। এর ফলে স্মিথ এভাবেই বিভিন্ন স্থানে একাধিক বিয়ে করে টাকা চুরি করতে থাকে। সে তার প্রত্যেকটি অপরাধ সম্পন্ন করত সবচেয়ে সস্তা উপায়ে। সে ট্রেনের থার্ড-ক্লাস টিকিট কাটত, নিম্ন শ্রেণীর হোটেল ও লজে থাকত এবং এমন সব স্থানে ঘুরে বেড়াত– যেখানে তার টাকা খরচ করতে হবে না। এভাবেই সে তার আয় থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের চেষ্টা করত।

১৯০৮ সালের জুনে তার পরিচয় হয় ফ্লোরেন্স উইলসন (Florence Wilson) নামের এক বিধবার সাথে। তার পোস্ট অফিসে ৩০ পাউন্ডের একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট ছিল। প্রায় তিন সপ্তাহ প্রণয়ের পর তারা বিয়ে করে। ফ্লোরেন্স স্মিথের মিষ্টি কথায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার অ্যাকাউন্টের সব টাকা তাকে দিয়ে দেয়। ৩ জুলাই স্মিথ তাকে হোয়াইট সিটি প্রদর্শনীতে (White City Exhilcition) নিয়ে যায়। খবরের কাগজ কেনার কথা বলে সে ফ্লোরেন্সকে সেখানে রেখে পালিয়ে যায়। প্রদর্শনী থেকে বের হওয়ার পর এক মুহূর্ত নষ্ট না করে সে ক্যামডেন টাউনে (Camden Town) চলে আসে, যেখানে সে ফ্লোরেন্সের সাথে থাকত। ফ্লোরেন্সের টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু নিয়ে সে বাকি সব জিনিস সেদিনই বিক্রি করে ফেলে। এরপর সেখান থেকেও পালায়। ১৯০৯ সালে সে সাউথামটনে (Southampton) জর্জ রোজ (George Rose) ছদ্মনামে আবারও একটি বিয়ে করে। সারাহ ফ্রিম্যান (Sarah Freeman) ছিল অত্যন্ত সহজ সরল ও চিরকুমারী। স্মিথ বিয়ের পর তাকে নিয়ে সাউথ লন্ডনের ক্ল্যাপহ্যামে (Clapham, South London) বসবাস করা শুরু করে। স্মিথের সম্ভ্রান্ত পোশাক ও আচরণে কেউ তার আসল রূপ আঁচ করতে পারত না। সে যখন তার স্ত্রীকে বলল যে, অ্যান্টিক বস্তুর ব্যবসার জন্য তার টাকার প্রয়োজন, সে সাথে সাথে তাকে টাকা দেয়। সে তার সেভিংস থেকে সব টাকা তুলে স্মিথকে দেয়। এরপর তার সরকারি স্টকগুলোও বিক্রি করে সব টাকা স্মিথের হাতে তুলে দেয়। ৫ নভেম্বর স্মিথ তাকে ন্যাশনাল গ্যালারিতে (National Gallery) নিয়ে যায়। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সে শৌচাগারে যাওয়ার কথা বলে সেখান থেকে পালায়। এরপর বাসায় এসে সবকিছু চুরি করে বিক্রি করে ফেলে এবং তার স্ত্রীকে ফেলে পালায়। এভাবে এক মাসের মধ্যে তার হাতে ৪০০ পাউন্ড এসে যায়। এই দুই বিয়ে ছাড়াও একই সময়ে সে আরও একটি বিয়ে করেছিল। কালো চুলের গোলগাল এডিথ ম্যাবেলের (Edith Mabel) বয়স ছিল ২৮ বছর। ব্রিস্টলের গ্লুসেস্টার রোডে (Gloucester Road) সে একটি দোকান চালু করেছিল। দোকানের জন্য কর্মচারীর সন্ধানে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে সাড়া দেয় এডিথ। এভাবেই এডিথের সাথে তার পরিচয়। এডিথকে সে অন্যদের মতো ব্যবহার

করেনি। বরং অন্যদের কাছ থেকে চুরি করা টাকা সে এডিথের পেছনে খরচ করত। সে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালেও ক'দিন পর পরই এডিথের কাছে ফেরত আসত। একমাত্র এডিথের কাছেই সে তার আসল নাম বলেছিল।

খুনি জর্জ জোসেফ স্মিথ

স্মিথের তথাকথিত ভ্রমণগুলো দিন দিন ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে থাকে। ১৯১০ সালের আগস্টে তার পরিচয় হয় ৩৩ বছর বয়সী এক চিরকুমারী রিটরাইস কনস্ট্যান্স অ্যান মান্ডির (Beatrice Constance Anne Mundy) সাথে। সে তখন ক্লিফটনে (Clifton) একটি রিসর্টে বেড়াতে গিয়েছিল। যখন সে জানতে পারল যে মান্ডির পিতা মৃত্যুর পর তার নামে ২৫০০ পাউন্ড রেখে গেছে, সে নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এই সম্পত্তি থেকে মান্ডি প্রতি মাসে ৮ পাউন্ড পেত তার খরচ চালানোর জন্য। স্মিথ হেনরি উইলিয়ামস (Henry Williams) নামে তার সাথে পরিচিত হয় এবং তার কাছে ঘেঁষার

চেষ্টা করতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই সে সফল হয় এবং মান্ডিকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে ফেলে। সে মান্ডিকে নিয়ে গিয়ে ওয়েমাউথে রডওয়েল অ্যাভিনিউতে (Rodwell Avenue, Weymouth) একটি বাড়িতে বসবাস শুরু করে। ২৬ আগস্ট তারা সেখানেই বিয়ে করে। মান্ডির আত্মীয়-স্বজন কেউই স্মিথকে পছন্দ করেনি। যদিও স্মিথ বার বার তাদের আশ্বস্ত করেছে কিন্তু তাদের সন্দেহ কমেনি। তারা প্রথম দেখাতেই তাকে সুযোগ সন্ধানী ও অর্থলোভী ভেবেছিল, তবে মান্ডি কারো কথা কানে নেয়নি। ডিসেম্বরেই তার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে যখন তারা মান্ডিকে ১৩৪ পাউন্ড পাঠায়। এই টাকা নেওয়ার জন্য স্মিথ মরিয়া হয়ে যায় এবং ১৩ ডিসেম্বর অত্যন্ত রূঢ়ভাবে মান্ডিকে ত্যাগ করে চলে যায়। সে মান্ডির উদ্দেশে চিঠি রেখে যায় যার বিষয়বস্তু ছিল এই যে, মান্ডি তার সুখী জীবনের সকল আশার আলো ম্লান করে দিয়েছে তাকে একটি ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত করে। সে এও বলে যে, মান্ডি নৈতিকভাবে স্বচ্ছ নয়, তাই তার সাথে সংসার করা অসম্ভব। সে জানায় যে, সে চিকিৎসার উদ্দেশে লন্ডন যাচ্ছে। যার জন্য বেশ মোটা অংকের অর্থের প্রয়োজন। তাই সে আত্মীয়দের পাঠানো ১৩৪ পাউন্ড নিয়ে যাচ্ছে। চিঠিতে সে মান্ডিকে উপদেশ দেয় যেন সে তার আত্মীয়দের বলে যে, টাকাটি চুরি হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও আত্মীয় ও বন্ধুদের তার সম্পর্কে কী কী বলতে হবে তাও শিখিয়ে দেয় স্মিথ। মান্ডি এ ঘটনায় অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে আবারও চিরকুমারী জীবনে ফিরে যায় এবং স্মিথের কথামতো সবাইকে জানায় যে, তার স্বামী ব্যবসার কাজে ফ্রান্স গিয়েছে।

এদিকে স্মিথ ব্রিস্টলে এডিথের কাছে ফিরে যায়। এরপর সাউথেন্ড (Southend) লন্ডন ঘুরে আবারও ব্রিস্টলে ফিরে আসে। তার হৃদয়হীন ভ্রমণ যে কত নারীকে কষ্ট দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, বিশেষ করে মান্ডির ক্ষেত্রে। সে স্মিথকে কখনোই ভুলেনি। ব্যাপারটি পরিষ্কার হয় যখন ১৮ মাস পর তার সাথে স্মিথের দেখা হয় ওয়েস্টন সুপার মেয়ারে (Weston super-mare)। সেখানে সে তার এক বান্ধবীর সাথে বেড়াতে এসেছিল। সময়টি ছিল ১৯১২ সালের মার্চ, সে স্মিথকে সমুদ্রের পাড়ে হেঁটে বেড়াতে দেখে। স্মিথ তার সেই চিঠি হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া এবং তার সব টাকা খরচ করে ফেলার পক্ষে একটি অজুহাত দাঁড় করিয়ে ফেলে। মান্ডি আবারও তার মিষ্টি কথায় নরম হয়ে যায়। এমনকি বন্ধুদের অনুরোধ সত্ত্বেও সে সব ছেড়ে স্মিথের সাথে চলে যায়। তারা বিভিন্ন শহরে শহরে ঘুরে বেড়াতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে বছরই মে-তে তারা কেন্ট (Kent) এ স্থায়ী হয়। হারনে বেতে ৮০ হাই স্টিটের (80 High Street, Herne Bay) একটি সাদাসিধে বাড়িতে বসবাস শুরু করে। এর মধ্যে স্মিথ খোঁজখবর নিতে লাগল যে, কীভাবে মান্ডির ২৫০০ পাউন্ড সম্পত্তি হাত করা যায়। একজন আইনজীবী তাকে বলে যে, মান্ডি যদি তার উইলে উল্লেখ করে তাহলেই এটি

সম্ভব। স্মিথ কোনো সময় নষ্ট না করে জুলাইয়ের ৮ তারিখেই তার পরিকল্পনার এক ধাপ বাস্তবায়িত করে। তারা দুজনেই উইলে স্বাক্ষর করে যে, মৃত্যুর পর তারা একজন অপরজনের সকল সম্পত্তি পাবে। পরদিন, ৯ জুলাই সে একটি দস্তার তৈরি বাথটব কিনে দুই পাউন্ড দিয়ে। ১০ জুলাই সে মান্ডিকে একজন নতুন অদক্ষ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায় এবং দাবি করে যে মান্ডির মৃগীরোগ আছে। দু'দিন পর সেই চিকিৎসককে তাদের বাড়িতে ডাকা হয় এই বলে যে আবারও মান্ডির মৃগী হচ্ছে। চিকিৎসক বাড়িতে এসে দেখে মান্ডি বিছানায় শুয়ে আছে। অত্যন্ত দুর্বল হলেও বাহ্যিকভাবে বেশ ভালো ছিল সে। তাই চিকিৎসক তার বিশ্রামের জন্য ঘুমের ওষুধ লিখে দেয়। সে রাতে মান্ডি তার চাচাকে একটি চিঠি লিখে তার অসুস্থতার কথা জানায় এবং বলে যে তার স্বামী তার কতটা যত্ন করছে। সে তাদের উইলের কথাও চিঠিতে উল্লেখ করে। পরদিন সকাল ৮ টায় সেই চিকিৎসকের কাছে একটি চিরকুট যায়। যাতে লেখা ছিল, 'আপনি কি এক্ষুনি আসতে পারবেন, আমার ভয় হচ্ছে, আমার স্ত্রী হয়তো মারা গিয়েছে।' চিকিৎসক শীঘ্রই সেখানে উপস্থিত হয় এবং দেখে যে, পানি ভর্তি বাথটবটিতে মান্ডি নগ্ন অবস্থায় শোয়া, তার চোখদুটো খোলা এবং ডানহাতে একটি সাবান শক্ত করে ধরা আছে। স্মিথ তাকে বলে যে, তার স্ত্রী নিজেই বাথটবটিতে পানি ভরেছে, প্রায় ২০ বার সিঁড়ি দিয়ে নিচে ওঠানামা করে রান্নাঘর থেকে পানি এনে। এ সময় সে মাছ কিনতে বাজারে যায় এবং ফিরে এসে তাকে মৃত অবস্থায় পায়। স্থানীয় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, তবে তারা সবকিছু দেখে এই মৃত্যুতে সন্দেহ করার মতো কিছু পায়নি। স্মিথ সারাক্ষণই অঝরে কাঁদছিল। পরের সোমবার পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সময়ও সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। করোনার তাকে সান্ত্বনা দেয় এবং ঘটনাটিকে একটি দুর্ভাগ্যজনিত দুর্ঘটনা বলে তদন্ত সেখানেই শেষ করে দেয়।

কারো মনে এই প্রশ্ন জাগেনি যে, এত ছোট একটি বাথটবে মান্ডি কীভাবে ডুবে মারা গেল? কেন স্মিথ চিকিৎসক আসার আগ পর্যন্ত তাকে পানি থেকে বের করেনি? কেনইবা সে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি? মাত্র ক'দিন আগে করা উইলটি নিয়েও কেউ কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেনি। এমনকি যখন স্মিথ তার উইলে বাড়ি ছেড়ে দিতে আপত্তির কথা উল্লেখ করে তখনো কোনো সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। সে এ ব্যাপারে অত্যন্ত চালাকির সাথে কাজ করেছিল। মান্ডির হত্যার ক্ষেত্রে সে অত্যন্ত সাবধান ছিল এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে ফেলে। মান্ডির চাচাকে খবর দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার কোনো আত্মীয়ই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে উপস্থিত হতে পারেনি, কেননা সবকিছু খুবই দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল। মান্ডির চাচা পোস্টমর্টেমের আবেদন করে এবং স্মিথ যেন মান্ডির সম্পত্তি না পায় সে ব্যবস্থা

করার চেষ্টা করে। তবে স্মিথ এক্ষেত্রে তার চেয়েও ধূর্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত সে মান্ডির নামের ২৫৯১ পাউন্ড লাভ করতে সফল হয়। এরপর সে সেই বাথটাবটি দোকানে ফেরত দিয়ে আসে ও টাকাও ফেরত নিয়ে আসে। এরপর সে মারগেটের (Margate) উদ্দেশে রওনা দেয় ও এডিথকে সেখানে আসতে বলে। সে তাকে বলেছিল যে, তার ব্যবসার অত্যন্ত উন্নতি হচ্ছে। যখন এডিথ বলে ফেলে যে, সে উলউইচ ও র‍্যামসগেটে (Woolwich and Ramsgate) তার খবর নিতে গিয়েছিল, সে অত্যন্ত রেগে যায়। সে এডিথকে বলে যে, সে মেয়েদের ব্যবসার সাথে জড়িত হওয়া পছন্দ করে না এবং আর কখনো তার কাজে নাক গলাতে আসলে সে কখনোই সুখী জীবনযাপন করতে পারবে না। এরপর থেকে এডিথ কখনো তার কাজে আগ্রহ দেখায়নি। স্মিথ ছিল অত্যন্ত ধূর্ত। তার অসংখ্য বিয়ের একটিও তখন ফাঁস হয়নি। সে মান্ডির টাকা দিয়ে ব্রিস্টলে ৮টি বাড়ি কিনে ও আরও একটি দোকান খোলে। ১৯১৩ সালের অক্টোবরের মধ্যেই আবারও অর্থসংকটে পড়ে সে। সে আবারও তার সফল পরিকল্পনাটি কাজে লাগানোর সুযোগ খুঁজতে থাকে। এ সময় তার পরিচয় হয় ২৫ বছর বয়সী নার্স এলিস বার্নহ্যামের (Alice Burnham) সাথে। মেয়েটির বাবা প্রথম দেখাতেই স্মিথকে অত্যন্ত অপছন্দ করে, তবে এতে কোনো কাজ হয়নি। ৪ নভেম্বর তারা পোর্টসমাউথে (Portsmouth) বিয়ে করে। এর পরদিনই স্মিথ তার স্ত্রীর নামে ৫০০ পাউন্ডের একটি জীবনবীমা করায়। এরপর সে এলিসের বাবার কাছে তার মেয়ের জন্য ১০০ পাউন্ড চেয়ে চিঠি লিখে এবং স্ত্রীর সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে ২৭ পাউন্ড তুলে নেয়। কিছুদিনের মধ্যেই সে এলিসকে নিয়ে ছুটি কাটাতে যায়। ১০ ডিসেম্বর বুধবার তারা ব্ল্যাকপুলে (Blackpool) পৌঁছে নিরিবিলি ছুটি কাটানোর জন্য। তারা প্রথমে অ্যাডেলেই স্ট্রিটে (Adelaide Street) একটি হোটেলে ওঠে। স্মিথ সেদিনই সেখান থেকে চলে যায়, কেননা সেখানে কোনো ঘরে বাথটব ছিল না। তবে ১৬ রিজেন্ট রোডের (16, Regent Rood) মিসেস ক্রসলির (Mrs. Crossley) বাড়িতে ছিল। তারা সেখানে পেইং গেস্ট হিসেবে থাকা শুরু করে। সেখানে তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে স্মিথ দেরি না করে চিকিৎসক ডেকে আনে। এলিস তার বাবাকে চিঠি লিখে জানায় যে, সে কত সুখে আছে এবং তার স্বামী তার কতটা যত্ন করে। শুক্রবার সন্ধ্যায় সে তার স্ত্রীর গোসলের জন্য বাথটব প্রস্তুত করতে বলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে সে বাইরে হাঁটতে যায়। রাত ১০ টা ১৫ মিনিটে যখন মিসেস ক্রসলি রাতের খাবার খাচ্ছিল, সে হঠাৎ পানির আওয়াজ শুনতে পায় ওপরতলা থেকে। উপরে তাকিয়ে দেখে যে কাঠের ঘরের ছাদ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ছে। সে উঠে উপরে যাবে এমন সময় স্মিথ ঘরে ঢোকে। তার হাতে সদ্য কেনা কয়েকটি ডিম। মিসেস ক্রসলি তাকে জিজ্ঞেস করে যে, হেঁটে ফিরে আসার পর সে কখন বাইরে গিয়েছে।

উত্তরে স্মিথ বলে যে, নাস্তার জন্য ডিম কিনতে গিয়েছিলাম, কিছুক্ষণ আগেই বের হয়েছে। এরপর সে উপর তলায় চলে যায়। কয়েক মুহূর্ত পরই সে হন্তদন্ত করে নিচে নেমে আসে ও চিৎকার করে বলে, 'শীঘ্রই কেউ চিকিৎসক ডেকে আনো, আমার স্ত্রী আমার সাথে কথা বলছে না।' তার মৃত্যুও মান্ডির মতো করেই হয়েছিল। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে শেষপর্যন্ত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হিসেবে তদন্ত শেষ করে যায়। সম্পূর্ণ সময় স্মিথ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে যাচ্ছিল। তার চোখের পানিতে একজনই নরম হয়নি, সে হলো মিসেস ক্রসলি। সে স্মিথকে আর একটি রাতের জন্যেও তার বাড়িতে থাকতে দেয়নি। স্মিথ জীবনবীমা থেকে প্রাপ্ত ৫০০ পাউন্ড ও এলিসের কিছু জামাকাপড় উপহার হিসেবে নিয়ে এডিথের সাথে দেখা করে। আগস্টে তারা টরকোয়ে (Torquay) ও লন্ডন শেল্টেনহ্যাম (London Cheltenham) হয়ে তারা বোর্নমাউথে চলে আসে। কিছুদিন পর সে আবারও লন্ডন যায় ও এলিস রিভিল (Alice Eeavil) নামের এক মেয়ের সাথে দেখা করে। তারা ১৭ সেপ্টেম্বর বিয়ে করে উলউইচে বসবাস শুরু করে। তবে এখানে বেশিদিন থাকেনি সে। মেয়েটির ৮০ পাউন্ড টাকা ও জামাকাপড় নিয়ে সে আবারও এডিথের কাছে যায়। এই মেয়েটি হত্যা করার জন্য যথেষ্ট দরিদ্র ছিল বলে এ যাত্রা সে বেঁচে যায়। ততদিনে তৃতীয় শিকার স্মিথ ঠিক করে ফেলেছিল। সে হলো ৩৮ বছর বয়সী মিস মার্গারেট লোফটি (Miss Margaret Lofty)। তার কাছে স্মিথ নিজের পরিচয় দেয় জন লয়েড (John Loyd) নামক এস্টেট এজেন্ট হিসেবে। খুব শীঘ্রই তারা বিয়ে করে এবং এবারও স্মিথ তাকে প্ররোচিত করে ৭০০ পাউন্ডের একটি জীবনবীমা করায়। এরপর তারা লন্ডনে চলে আসে। তারা হাইগেটের ১৪ নং বিসমার্ক রোডে (14, Bismarck Road, Highgate) বসবাস শুরু করে। এখানেও বাথটব ছিল। প্রথম দু'টি সফলতা তাকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলছিল। তবে এবার সে ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছিল। সে মার্গারেটকে ১৭ ডিসেম্বর চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। এরপর সে আবারও একটি উইল করাল একইভাবে। ১৮ ডিসেম্বর সে বাথটবে গোসল করছিল। তাদের বাড়িওয়ালি নিচতলা থেকে প্রথমে পানি ছিটকে যাওয়ার শব্দ পায়। এর দশ মিনিট পরই সে দেখে যে, স্মিথ বাইরে থেকে এসেছে। তার হাতে কিছু টমেটো ছিল। সে বলে যে, এগুলো তার স্ত্রীর জন্য এনেছে। তবে তার স্ত্রী তখন সেগুলো খাওয়ার জন্য জীবিত ছিল না। তাকে পরদিনই কবরস্থ করা হয়। এরপর সে আবারও ব্রিস্টলে ফিরে যায়। সেখানে এডিথকে গোসল করার ক্ষেত্রে সাবধান হওয়ার উপদেশ দেয় সে। বলে, 'আজকাল অনেক স্থানে বাথটবে বহু নারী প্রাণ হারাচ্ছে, দুর্বল হৃদপিণ্ড ও হঠাৎ বাথটবে অজ্ঞান হওয়ার কারণে।' ১৯১৫ সালে মার্গারেটের মৃত্যু সম্পর্কেও করোনার একই মন্তব্য করে। আগের হত্যাকাণ্ডগুলো খুব সহজেই হয়েছিল এবং তা খুব বেশি জানাজানিও হয়নি। তবে

মার্গারেটের মৃত্যুর খবর পত্রপত্রিকায় ফলাওভাবে ছাপা হয়। পূর্বের হত্যাকাণ্ডের সাথে এই ঘটনার আশ্চর্য মিল কাকতালীয় হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এলিসের বাবা পত্রিকায় মার্গারেটের মৃত্যুর খবর পড়ে আইনজীবী ও পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে। এদিকে মিসেস ক্রসলিও তার আশঙ্কার কথা পুলিশকে জানায়। পুলিশ প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করা শুরু করে। খুব শীঘ্রই বের হয় যে, এই প্রত্যেকটি ব্যক্তি একজনই তখন তাকে ঘাতক স্বামী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়। ১ ফেব্রুয়ারি যখন সে তার স্ত্রীর নামের ৭০০ পাউন্ডের জীবনবীমা তুলতে যায়, তখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিনজন নারীর দেহই রাসায়নিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়, ঠিক কীভাবে তাদের ডুবিয়ে মারা হয়েছিল এবং কীভাবে তাদের মৃত্যু হয়েছিল। তাকে তিনটি হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ইংলিশ 'ল' অনুযায়ী শুধুমাত্র একটি হত্যার দায়ে অপরাধীর বিচারকার্য করা হয়। স্মিথ তার প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের নিখুঁত বর্ণনা দেয় আদালতে। সরকার পক্ষের আইনজীবী আদালতে আবেদন জানায়, তিনটি হত্যাকাণ্ডই বিবেচনা করতে। কেননা এটি ছাড়া তার অপরাধ প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে বোঝা অসম্ভব। তার বিচারকার্য শুরু হয় ১৯১৫ সালের ২২ জুন ওল্ড বেইলিতে (Old Bailey)। বিচারকার্যের সময় সে প্রথমে বলছিল যে, সে একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ, তবে সে খুনি নয়। প্রত্যেকটি ঘটনা এখানে কাকতালীয়। তবে শেষপর্যন্ত তাকে দোষী ঘোষণা করা হয়। ১ জুলাই জুরির মাত্র ২২ মিনিট সময় লেগেছিল তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে। প্যাথলজিস্ট স্পিলসবারি (Spilsbury) ব্যাখ্যা করে যে, কীভাবে হত্যাগুলো করা হয়েছিল এবং পোস্টমর্টেম করে আবিষ্কৃত তথ্যের আলোকে সে আদালতে হত্যার ঘটনা অভিনয় করে দেখায়। এরপর স্মিথকে তিনটি হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

তাকে প্রথমে পেন্টনভিল জেলে (Pentonville Jail) রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে তাকে মেইডস্টোন প্রিজনে (Maidstone Prison) নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সে ধর্মে মনোনিবেশ করলেও তার মধ্যে কোনোদিন অনুশোচনা বোধ প্রকাশ পায়নি। মৃত্যুর আগে সে তার প্রেমিকা এডিথকে চিঠি লিখেছিল। এডিথ স্মিথের মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সে জেলের বাইরে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলেছে এবং বলেছে "May an old age, Serene and bright and as lovely as a Lapland night, lead thee to thy grave. Now, My true love, goodleye until we meet again."

১৩ আগস্ট স্মিথের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর একমাত্র এডিথই বিলাপ করেছে ও শোক প্রকাশ করেছে। স্মিথের মৃত্যুর পরদিন তার প্রথম ও আইনত স্ত্রী তার বিধবা হওয়ার সুবিধা নিয়ে লিসেস্টারে একজন কানাডিয়ান সৈনিককে বিয়ে করে।

আটলান্টা'স স্ট্রিটস অব ফিয়ার

১৯৮১ সালের বসন্তের শেষদিকে আটলান্টা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে 'মিসিং অ্যান্ড মর্ডারড চিলড্রেন' ফাইলে প্রায় ২৬টি অমীমাংসিত কেস জমে গিয়েছিল। এর আগের দুই বছরে বিভিন্ন রাস্তাঘাট থেকে প্রচুর কৃষ্ণাঙ্গ শিশু ছিনতাই হয়েছিল এবং অনেকেই উধাও হয়ে যাচ্ছিল শহরটির বেশ দক্ষিণে। প্রায়ই এসব নিখোঁজ ঘটনা ঘটছিল তাদের মৃতদেহগুলো পচাগলা অবস্থায় ডোবা-নালা বা কোনো নদীতে পাওয়া যাওয়ার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই। এমনকি আটলান্টার প্রত্যেকটি অঞ্চলে আতংক মহামারীর রূপ ধারণ করছিল। প্রত্যেকবারই শিকার হয়েছিল কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরা এবং বেশির ভাগই এত ছোট যে নিজেরদের রক্ষা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। এই ছোট্ট নিষ্পাপ শিশুগুলোকে গলাটিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেন, সাত বছরের একটি শিশুকে পেছন থেকে গলা বরাবর বাহু দিয়ে চেপে ধরে হত্যা করা হয়েছিল। ছোট্ট ছেলেটি সে মরণফাঁদ থেকে মুক্ত হতে একেবারেই অপারগ ছিল। যখন থেকে এই নরঘাতক পিশাচের আবির্ভাব হলো, শহরের মানুষ এক ত্রাসের মধ্যে বসবাস করছিল। সন্ধ্যার পর পরই রাস্তা ও ফুটপাথ একদম ফাঁকা হয়ে যেত। বাবা-মায়েরা কয়েক সেকেন্ডের জন্য বাচ্চাদের চোখের আড়াল হতে দিত না। বাচ্চাদের সব সময়ই ঘরের ভেতর আটকে রাখত। এমনকি বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্য আলাদা গার্ড বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল। বাচ্চাদের বাবারা সব সময়ই তাদের সাথে বেসবল ব্যাট রাখত অস্ত্র হিসেবে। কিন্তু তারপরও সন্দেহ থেকেই যাচ্ছিল। সবার মনে প্রশ্ন ছিল, কোনো শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি কি কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের উপর তার বর্ণবাদী পৈশাচিক ঘৃণা প্রকাশ করছে নাকি কোনো ভয়ংকর পাগল খুনি মুক্তভাবে চলাফেরা করে এ সকল ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে। প্রায় দু'বছরের তদন্তে এই নরপশু বহু পুলিশ অফিসারকেও আহত করেছিল। একে ধরার জন্য স্টেট জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট একটি স্পেশাল ইউনিটও গঠন করেছিল। কিন্তু প্রতিবারই একটি করে বাচ্চা নিখোঁজ হতে থাকে এবং তাদের চেষ্টা বৃথা হতে থাকে। এদিকে রাষ্ট্রের অনেক টাকা খরচ হয়ে যেতে থাকে তবে কোনোভাবেই কোনো কাজ হয় না। আটলান্টায় দায়িত্বরত পুলিশ চিফ লি ব্রাউন (Lee Brown) কে

সাহায্য করার জন্য এফবিআই (FBI) সদস্যদেরও আনা হলো। পুলিশ চিফের উপর শহরবাসীর চাপ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। এদিকে অপরাধীর কোনো খোঁজ-খবর দেওয়ার জন্য ঘোষিত এক লক্ষ ডলার পুরস্কার লাভের আশায় দলে দলে খামখেয়ালি আধপাগলরা পুলিশ স্টেশনে ভিড় জমাতে লাগল। এই রহস্যটি ছিল অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ। পুলিশের মনে হতে লাগল যে, খুনি তাদের উপহাস করার চেষ্টা করছে। মরিয়া হয়ে তারা তদন্ত চালাতে লাগল।

১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে যখন ১১৩তম খুনটি সংঘটিত হয়, পুলিশ দেখে যে প্রতি সাড়ে তিন সপ্তাহে একটি করে খুন হচ্ছে। মৃতদেহগুলো লুকিয়ে রাখার বদলে বরং লক্ষণীয়ভাবেই পার্কে ফেলে রাখছিল খুনি নরপশু। পিতা-মাতারা সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও একের পর এক শিশু নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিল। যতই খুনি তার এই জঘন্য হত্যাভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল, ক্রমে ক্রমে তা ভীষণ পৈশাচিক রূপ ধারণ করছিল। প্রত্যেকটি শিশুর বয়সই ৭ থেকে ১৪-এর মধ্যে ছিল এবং দু'জন বাদে সবাই ছিল ছেলে। যদিও এ দেখে সবাই ধর্ষকামী খুনির আশঙ্কা করছিল তবে কোনো শিশুর দেহে কোনো যৌন নির্যাতনের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পুলিশের দুশ্চিন্তার আরও একটি কারণ ছিল খুনির সংখ্যা। তারা কোনোভাবেই বের করতে পারছিল না যে খুনি একজনই নাকি একাধিক। পিশাচ ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে। তারা এটাও ভেবে নিচ্ছিল যে এক ধরনের মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত পিশাচের একটি দলকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে কোনোভাবে, কেননা একা কারও পক্ষে এতগুলো খুন করে পার পেয়ে যাওয়ার কথা নয়। বলতে গেলে এই খুনিকে ধরার প্রচেষ্টা ও অভিযান ইউনাইটেড স্টেটসের অন্যতম বড় অভিযানগুলোর একটি হয়ে গেল। প্রায় বিশ হাজার মানুষকে পুলিশ সামনাসামনি এবং পনেরো হাজারকে ফোনের মাধ্যমে জেরা করেছিল। প্রায় দশ হাজার শিশুর সাথে কথা বলেছিল পুলিশ এই আশংকায় যে কখনও হয়তো কেউ তাদের একজনকে অপহরণ করার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে কিনা। ৩৫ জন এফবিআই অফিসারকে আটলান্টায় নিযুক্ত করা হয় স্থায়ীভাবে। এই তদন্ত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা আটলান্টায় দায়িত্বরত ছিল। এত চেষ্টা এবং সাবধানতা কোনোভাবেই সফল হচ্ছিল না। এরপর ১৯৮১ সালের মে মাসের এক রাতে নাটকীয়ভাবে শত্রুবূহ্য ভেদ করতে সক্ষম হয় পুলিশ। দু'জন পুলিশ অফিসার এবং দু'জন এফবিআই সদস্য ফোর লেনযুক্ত সাউথ ড্রাইভ ব্রিজের (South Drive Bridge) ঢালে লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। সারা শহরের বিভিন্ন স্থানে আরও ডজন খানেক পুলিশ ও এফবিআই অফিসার লুকিয়ে ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সেই কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে তারা এত সতর্কতার মধ্যেও কেউ নদীটির দিকে নজর দিচ্ছিল না। তারা শুধুমাত্র ব্রিজটিকে বেষ্টন করে পাহারা দিচ্ছিল। কেননা এটি অন্য শহর থেকে আটলান্টার অন্যতম প্রধান প্রবেশপথ ছিল। এখান থেকে চট করেই

খুনি ওয়েন বার্ট্রাম উইলিয়ামস

যেকোনো রাস্তায় পুলিশ চলে যেতে পারবে যদি কোনো সন্দেহজনক কিছু ঘটে। তারা নিজেদের মধ্যে নিরাপত্তা বিষয়ক ফিসফিসানির এক পর্যায়ে প্রচণ্ড একটি আওয়াজে চমকে উঠে। আওয়াজটি ছিল নদীর পানিতে হঠাৎ ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ যা নিশুতি রাতে বহুগুণে সম্প্রসারিত হয়ে শোনা গেছে। ব্রিজের নিচে পাহারারত অফিসারদের থেকে তা খুব বেশি হলে এক মিটার দূরত্বে হবে। দু'জন অফিসার সাথে সাথে নদীতে নেমে খোঁজাখুজি করতে লাগল এবং অপর দু'জন সাথে সাথে ব্রিজে উঠে গেল। অন্যান্য অফিসার এবং পেট্রোলকারগুলো মহাব্যস্ত হয়ে চারদিকে তল্লাশি চালাতে লাগল। আসা-যাওয়ারত সকল গাড়ি আরও ভালো মতো তল্লাশী করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। পরদিন সকালে ফ্রগম্যানেরা (Frogman) নদী থেকে ২৭ বছর বয়সী নাথানিয়েল কেটারের (Nathaniel Cater) মৃতদেহ উদ্ধার করল। একইভাবে শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। যদি একই খুনি এই হত্যা করে থাকে তবে সে তার পদ্ধতি বদলেছে, যা পুলিশকে আরও ভাবিয়ে তুলল। এবারের শিকারও ছিল কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বাসরোধ করে নিহত তবে এবারে সে ছিল প্রাপ্ত বয়স্ক। পুলিশের হিসাব অনুযায়ী কেটার

এই হত্যা চক্রের ২৭তম শিকার। 'মিসিং অ্যান্ড মার্ডারড চিলড্রেন' ফাইলটির নামকরণ হলো মিসিং অ্যান্ড মার্ডারড পিপল' হিসেবে।

এর কিছুদিন পরই ২১বছর বয়সী রে পেইনের (Ray Payne) মৃত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ নদী থেকে। সেও ছিল কৃষ্ণাঙ্গ এবং একইভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী কেটার ও পেইনের মৃত্যুর সময় প্রায় একই এবং রাতের একই সময়ে তাকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এর আগে আরও চারটি শিশুর মৃতদেহ নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। পুলিশ এবার আসা-যাওয়ারত সকল ড্রাইভারকে আবারও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। রেকর্ডে যাদের নাম আছে তাদেরও খুঁজে বের করে জেরা করা শুরু করে।

তাদের মধ্যে একজন ছিল ২৩ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ ওয়েন বার্ট্রাম উইলিয়ামস (Wayne Bertram Williams)। সে তার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা বাবা-মায়ের সাথে আটলান্টার উত্তর-পশ্চিমে সাধারণ একটি বাড়িতে থাকত। তাকে সারারাত পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ দেখে যে, সে নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করত এবং বেশ উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করত। তার বর্ণনা অনুযায়ী সে সবসময় রেডিওতে অপরাধমূলক খবর শুনে তার ক্যামেরাটি নিয়ে সেখানে হাজির হতো। সাধারণত সাংবাদিকদেরও আগে গিয়ে নিজের মতো করে ঘটনাস্থলের ছবি তুলত। ১৪ বছর বয়সেই সে নিজের রেডিও স্টেশন চালানো শুরু করে। শৈশব কেটেছে একাকিত্বে এবং তার বিরুদ্ধে ১৮ বছর বয়সে পুলিশ অফিসারের ছদ্মবেশ ধারণের অভিযোগ ছিল। যখন তার বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়রা জানল সে এই ব্যাপারে পুলিশের সন্দেহভাজন তখন সকলেই বেশ অবাক হয়েছিল।

জুন মাসের ৩ তারিখে তাকে আবারও ১২ ঘণ্টার জন্য রিমান্ডে নেওয়া হয়। পরদিন সে খবরের কাগজ এবং টিভি স্টেশনে ফোন করে প্রেস কনফারেন্স ডাকে। সেখানে সে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে এবং বলে, পুলিশ তাকে প্রধান অপরাধী বলে নিজেদের অপারগতা ঢাকতে চাচ্ছে। সে বলে যে, 'একজন অফিসার আমাকে বলেছে, আমি নাকি নাথিনিয়েল কেটারের খুনি এবং আমাকে ধরা নাকি শুধু সময়ের ব্যাপার ছিল। তবে আমি বলছি যে আমি কাউকে হত্যাও করিনি, কাউকে ব্রিজ থেকে ফেলেও দেইনি।'

পরের কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত উইলিয়ামসকে পুলিশের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। এরপর তার গাড়ির সিটের তন্তুগুলো (Fiber) ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়। রিপোর্ট আসার পর দেখা যায় সবগুলোই কেটার ও পেইনের মৃতদেহ থেকে পাওয়া তন্তুর সাথে হুবহু মিলে যায়। এরপর উইলিয়ামসকে কেটার ও পেইনের হত্যার দায়ে গ্রেফতার করা হয়। তবে উইলিয়ামসকে দোষী

প্রমাণ করতে পুলিশকে বেশ হয়রানি হতে হয়েছিল। কেননা, তথ্যপ্রমাণসহ কোনো চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল না যে, তাকে সরাসরি মৃতদেহ নদীতে ফেলতে দেখেছে। সবকিছুই ফরেনসিক এক্সপার্টের রিপোর্টের উপর নির্ভরশীল ছিল।

তবে তাদের আশংকা সত্যি প্রমাণিত হলো যখন নয় সপ্তাহের এই মামলার শুনানি শেষ হলো। প্রথমত, এখানে তারা হত্যার কোনো মোটিভ বা উদ্দেশ্য পায়নি। যদিও সরকার পক্ষের উকিল বলছিলেন যে, উইলিয়ামস একজন হতাশাগ্রস্ত কৃষ্ণাঙ্গ, যে তার জাতিকে বিশুদ্ধ করতে চাচ্ছিল দরিদ্রদের হত্যা করে। তবে একথা কোনো কাজে আসেনি। উইলিয়ামসের আত্মরক্ষার্থে ছিল মিসিসিপির অন্যতম আইনজীবী অ্যালভিন বাইন্ডার (Alvin Binder) যে প্রতিপক্ষের অভিযোগকে বলতে গেলে তছনছ করে দিয়েছিল। তবে এই মামলার শুনানি একটি চমকপ্রদ মোড় নেয়, যখন প্রসেকিউশন বা সরকার পক্ষের পরিচালকেরা আত্মপক্ষ সমর্থনে কৈফিয়ৎ দেবার আবেদন করে এবং বিচারক তাতে সম্মতি দেন। তারা তথ্যপ্রমাণ ও সূত্রের সংযোগের মাধ্যমে আরও দশটি নিহতের সাথে উইলিয়ামসের সম্পর্ক আদালতে পেশ করে। অ্যাসিসট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি জোসেফ ড্রলেট (Joseph Drolet) বলেন, 'তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব খুনের সাথে জড়িত বা অভিযুক্ত করা হয়নি। তবে এসব একটি নির্দিষ্ট অপরাধী মানসিকতা ও কাজের পদ্ধতি প্রকাশ করতে সক্ষম হবে।'

এই তথ্যপ্রমাণগুলো মামলাটির যেন জীবন ফিরিয়ে দেয়, যা শুধুমাত্র ফরেনসিক তথ্যের আলোকে প্রায় হেরে যাচ্ছিল। ১৫ বছর বয়সী একটি ছেলেকে উইলিয়ামস যৌন হয়রানি করেছিল। পরবর্তীকালে যাকে দেখা যায় ১৪ বছর বয়সী আরেকটি সমকামী ছেলে লুবি গেটারের (Luvie Geter) সাথে বেশ আপত্তিকর অবস্থায়। লুবির পচা গলা মৃতদেহ পাওয়া যায় তার কিছুদিন পরই। পরনে ছিল শুধু আন্ডারপ্যান্ট। আরও বেশ কিছু সাক্ষী বলে যে, তাকে কয়েকজন নিহতের সাথে কয়েকবার দেখা গিয়েছে। উইলিয়ামসের সাথে মিউজিকের ব্যবসা ছিল এমন এক ব্যক্তি বলে, উইলিয়াসম তাকে একদিন একটি চিঠি লিখেছিল যেখানে ছিল, 'আমি একজন মেয়রও হতে পারি একদিন, এমনকি আমি একজন খুনিও হতে পারি।'

উইলিয়ামস বার বার বলতে লাগল যে, সে ব্রিজে গাড়ি থামায়নি, এমনকি গতি ধীরও করেনি। কোনও দিন কেটারকে নদীতে ছুড়ে ফেলেনি, এতটা শক্তি তার শরীরে থাকা অসম্ভব। সে বার বার এটাও বলছিল, সে মোটেও সমকামী নয় এবং পুলিশ কর্তৃক প্রদর্শিত তথ্যপ্রমাণ সবই মিথ্যা। সে বিচারকদের বলছিল, 'আমি এদের কাউকে কোনো দিন দেখিনি, পৃথিবীর যেকোনো মানুষের মতোই আমারও তাদের জন্য মায়া হচ্ছে, কষ্ট লাগছে। আমার নিজেরই বয়স মাত্র ২৩ বছর। আমিই তো নিহতদের একজন হতে পারতাম।' এরপর মামলা এগিয়ে

চললে সে প্রসেকিউটরকে বোকার হদ্দ বলে গালি দেয় এবং বলে যে তার জিজ্ঞাসাবাদকারী এফবিআই অফিসারেরা সবাই গো-মূর্খ। শেষ পর্যন্ত আটজন কৃষ্ণাঙ্গ ও চারজন শ্বেতাঙ্গের এই জুরি প্রত্যাবর্তন করে। তারা ১২ ঘণ্টা সকল তথ্য প্রমাণের সুনিশ্চিত নিরীক্ষণ করে, যে পর্যন্ত উইলিয়ামসকে সকল অভিযোগের জন্য দোষী রায় দেয়।

যখন তাকে তার সাজা শোনানো হচ্ছিল, সে কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং বার বার বলতে থাকে, 'আমি অন্তর থেকে বলছি যে আমি নির্দোষ। আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।' তার পিতা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে বলে যে, 'এমন একজন যুবককে দোষী সাব্যস্ত করাটা অসম্ভব। আমার ছেলে এ কাজ করতেই পারে না।' তবে সত্যি কথা হলো যে, সে দোষী প্রমাণিত হয়েছিল এবং তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৪ বছর সাজা খাটার আগ পর্যন্ত সে নিজের পক্ষে কোনো কিছু বলার সুযোগ পাবে না জেনেই সে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিল। তার পক্ষের আইনজীবীরা যদিও সাথে সাথেই আবেদন করার কথা ভাবছিল তবে সে জন্যেও অনেক বছর সময় লাগবে বলে বিচারক শেষ রায় ঘোষণা করে।

দ্য কেস অব লিথাল কাপপা

গ্রাহাম ইয়াং (Graham Young) একজন চা বিক্রেতা হিসেবে অত্যন্ত সুদর্শন ও ছিমছাম ছিল। তার সুস্বাদু চা-কফি স্থানীয় সবার কাছেই ছিল প্রিয়। এছাড়া তার তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও করিতকর্মা হওয়ায় সবাই আশা করেছিল একদিন সে অনেক বড় কিছু হবে, সবাই তার নাম জানবে। প্রতিবেশীদের ইচ্ছাটি পূরণ হয়েছিল, তবে ঠিক যথাযর্থভাবে নয়। গ্রাহামের নাম চারদিকে ছড়িয়ে যায় জঘন্য খুনি হিসেবে। তার সুস্বাদু চা কফির মূল্য অনেকেরই দিতে হয়েছে প্রাণ দিয়ে। বৈমাত্রেয়সহ পরিবারের অন্যদের হত্যা করার পর সে আরও ৭০ জন লোককে হত্যার চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে সবাইকে হত্যা করতে সে সক্ষম হয়নি।

তার জন্ম ১৯৪৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। লন্ডনের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত নিসডেনে (Neasden) সে তার পরিবারের সাথে থাকত। খুব অল্প বয়স থেকেই তার বিষের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। ১৯৬১ সালে ১৪ বছর বয়সে সে তার পরিবারের সদস্যদের ওপর বিষপ্রয়োগ করা শুরু করে। প্রত্যেকেই ভয়ংকরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ত কিন্তু কোনো কারণ খুঁজে পেত না। সে স্কুলের বিজ্ঞান প্রজেক্টের কথা বলে কিছুদিন পর পরই অল্প অল্প করে অ্যান্টিমনি ও ডিজিটালিস কিনত। একসময় তার পরিমাণ একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। ১৯৬২ সালে তার সৎ মা মলি (Molly) ভীষণ অসুস্থ হয়ে মারা যায়। সে তার বাবা, বোন ও এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও বিষপ্রয়োগ করে যাচ্ছিল। এমনকি মাঝে মাঝে পরিবারের অন্যদের মতো সে নিজেও বমি বমি ভাব অনুভব করত কেননা সে ভুলে যেত ঠিক কোন কোন খাবারে সে বিষ মিশিয়েছে এবং নিজেও সেগুলো খেয়ে ফেলত। মলির বিষক্রিয়ায় মৃত্যুতে তার বোন উইনি (Winnie) একমাত্র গ্রাহামকে সন্দেহ করে, কেননা সে তার বিষের প্রতি আগ্রহের কথা জানত। সে গ্রাহামকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠালে সে পরামর্শ দেয় পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে। ১৯৬২ সালের ২৩ মে গ্রাহামকে মলির হত্যা ও তার বাবা এবং বোনকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তাকে মানসিক বিকারগ্রস্ত অপরাধীদের প্রতিষ্ঠান ব্রডমুর হসপিটালের (Broadmoor Hospital) মেন্টাল হেলথ

অ্যাক্টের অধীনে রাখা হয়। সেখানে সে দুইজন প্রসিদ্ধ মনোরোগ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসাধীন ছিল। তার বিচারকার্য সংঘটিত হয় ওল্ড বেইলিতে (Old Bailey)। বিচারপতি মি. জাস্টিস মেলফোর্ড স্টিভেনসন (Mr. Justice Melford Stevenson) তাকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেয় এবং ১৫ বছরের আগে তাকে ব্রডমুর থেকে মুক্ত না করার আদেশ দেয়। কিন্তু নয় বছর পর চিকিৎসকেরা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ঘোষণা করে হসপিটাল থেকে মুক্তি দেয়– যার ফলে আরও ৭০ জনের বিষপ্রয়োগ ও দুইজন নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঘটে।

হাসপাতালের নয় বছর সে রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বই পড়ে বিষ সম্পর্কে আরও বেশি জ্ঞান সংগ্রহ করে। সেখানেও সে গোপনে ওষুধ চুরি করে কর্মচারী ও অন্যান্য রোগীদের বিষপ্রয়োগ করত। তার স্বীকারোক্তিতেই জানা যায় যে, সে হাসপাতালের বাগানের লরেল বুশ (Laurel Bush) গাছের পাতা থেকে সায়নাইড আলাদা করতে পারত। এটি সে গবেষণা করেছিল তার রুমমেট জন বেরিজের (John Berridge) ওপর। কিন্তু বেরিজের মৃত্যুতে বিষপ্রয়োগের সন্দেহ করেনি কেউ। সে এমনিতেই বেশ অসুস্থ ছিল এবং প্রচণ্ড খিঁচুনি হতো। তার হঠাৎ মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ব্যস্ত চিকিৎসকেরা মাথা ঘামায়নি। তাদের এই অবহেলার ফলেই গ্রাহামের মতো পিশাচ সাজা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ১৯৭১ সালে মুক্তি পায়।

তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর। মুক্তি পাওয়ার পর সে বার্কশায়ারের স্লতে (Slough, Berkshire) একটি সরকারি প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। এ সময় তার চোখে পড়ে খবরের কাগজের একটি বিজ্ঞাপন, দ্রুত গতির বিশেষজ্ঞ ফটোগ্রাফিক ও অপটিক্যাল যন্ত্রপাতির নির্মাতা জন হ্যাডল্যান্ডের (John Hadland) একজন ম্যানেজার প্রয়োজন, তার একটি ছোট কারখানার জন্য। বোভিংডনের হার্টফোর্ডশায়ার গ্রামে (Hertfordshire, Bovingdon) কারখানাটি অবস্থিত। কাছেই হেমেল হেমস্টেডে (Hemel Hempstead) গ্রাহামের বোনের বাড়ি ছিল। সে দ্রুত সেখানে গিয়ে বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে চাকরির আবেদন করে। তার যোগ্যতা হিসেবে সে বলে, সে অর্গানিক ও ইনর্গানিক কেমিস্ট্রি, ফার্মাকোলজি ও টক্সিকোলজি (Organic, Inorganic Chemistry, Pharmarolgy, Toxicology) সম্পর্কে ১০ বছর ধরে পড়াশোনা করেছে। সে এটাও উল্লেখ করে যে, বিভিন্ন কেমিক্যাল সম্পর্কেও তার জ্ঞান আছে। তার ব্রডমুরে চিকিৎসাধীন থাকার ব্যাপারে সে নিজেই আলোকপাত করে, বলে যে মায়ের মৃত্যুতে সে মানসিকভাবে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিল যার কারণে কিছুদিন সেখানে চিকিৎসাধীন ছিল সে। তার যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি. গডফ্রে ফস্টার (Mr. Godfrey Foster) তাকে পরদিনই যোগদান করতে বলে। এই কারখানায় থ্যালিয়াম ব্রোমাইড আয়োডাইড দিয়ে ইনফ্রারেড লেন্স (Infrared,

অবলোহিত) তৈরি করা হতো যা মিলিটারি কাজে রাতের অন্ধকারে দেখার জন্য ব্যবহৃত হতো। এই রাসায়নিক পদার্থগুলোই গ্রাহামের এখানে চাকরি নেওয়ার মূল আকর্ষণ ছিল। উচ্চ পদে থাকার কারণে যখনই থ্যালিয়ামের প্রয়োজন হতো কারখানা থেকে তাকেই পাঠানো হতো লন্ডন থেকে তা আনার জন্য। সে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর থ্যালিয়াম চুরি করে। কিছুদিন পর সে চাকরির পাশাপাশি চা-কফির ব্যবসা শুরু করে। তার সহকর্মীরা ব্রডমুরে চিকিৎসাধীন থাকার ব্যাপারে জানত ঠিকই, তবে ততখানিই, যতখানি সে জানাতে চেয়েছিল। তার আসল রূপ সম্পর্কে কারো বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। তার চা-কফির ব্যবসাকে সবাই নিছক কৌতুকের মতোই নিয়েছিল। কারখানার সবাই তার কাছ থেকেই চা-কফি কিনত এবং কিছুদিনের মধ্যেই কৌতুক প্রশংসায় পরিণত হয়। ধীরে ধীরে তার বিক্রি বাড়তে থাকে। এর পর শুরু হয় একে একে বিভিন্ন মানুষের অসুস্থ হওয়া। প্রত্যেকেরই ভয়ংকর পেটে ব্যথা, খিঁচুনি ও বমি হতে থাকে।

খুনি গ্রাহাম ইয়াং

কারখানার পরিচালকেরা যদি জানত যে, গ্রাহামের বিষপ্রয়োগকারী হিসেবে সাজা হয়েছিল তাহলে কোনোদিনই তাকে চাকরি দিত না, কর্মচারীদের এমন অবস্থাও হতো না। এক্ষেত্রে ব্রডমুরের চিকিৎসকের গাফিলতি ও উদাসীনতাই দায়ী। যখন গ্রাহামের খবর নেওয়ার জন্য ব্রডমুরে লোক পাঠানো হয়েছিল চিকিৎসক তাকে গ্রাহামের সম্পূর্ণ ইতিহাস না বলে শুধু এটুকু বলেছিল যে, সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং চমৎকার কাজ করতে পারবে। গ্রাহামের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বেশ প্রশংসাও করে সে। কেননা গ্রাহামের চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তাকে মুগ্ধ করেছিল। তার প্রতিটি প্রশংসাই শেষ পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। তবে ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। একের পর এক গ্রাহামের সহকর্মী অসুস্থ হয়ে যেতে থাকে। গ্রাহাম কাজে প্রবেশ করার পর থেকেই তারা তাকে বেশি স্নেহ করত তার পূর্ব অসুস্থতার কথা ভেবে। তার উন্নতির কথা চিন্তা করে শুধু তার কাছ থেকে চা-কফি পান করাটাই তাদের কাল হয়ে দাঁড়াল। স্নেহের বিনিময়ে তারা পেল 'লিথাল কাপপা' অর্থাৎ এক কাপ মৃত্যু! (Lethal Cuppa; Cuppa অর্থ এক কাপ কফি) তার প্রতি সবচেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল ছিল প্রধান স্টোরম্যান, ৫৯ বছর বয়সী বব ইগল (Bob Egle), ৬১ বছর বয়সী ফ্রেডরিক বিগস (Frederick Biggs) যে ছিল কারখানার উন্নয়ন বিভাগের প্রধান ও ৪১ বছর বয়সী ড্রাইভার রোনাল্ড হেউইট (Ronald Heuitt)। বব ও ফ্রেডরিক প্রায়ই তাকে সিগারেট খাওয়াত এবং দরকারের সময় তাকে বিনা বাক্যব্যয়ে টাকা ধার দিত। গ্রাহাম তাদেরকে প্রায়ই বিনামূল্যে চা খাওয়াত। যারা তার প্রতি সদয় ছিল সে তাদের সকলকেই মাঝে মাঝে বিনামূল্যে চা খাওয়াত। এই চায়ের বিষ তাদের সবার মধ্যে ছড়িয়ে গেলে প্রত্যেকেরই বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। তারা এই অজানা রোগের নাম দেয় বোভিংডন বাগ (Bovingdon Bug) কেননা তা বিষাক্ত পোকার মতোই সবার মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। প্রায় ৭০ জন কর্মচারী এই রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে যায়। উপসর্গগুলোর মধ্যে প্রকট ছিল ডায়রিয়া, প্রচণ্ড পেট ব্যথা, চুল ঝরে যাওয়া, পা অবশ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কেউ কেউ বলছিল যে, তাদের চা-কফি বেশি তিতা লাগে খেতে এবং কারখানা প্রদত্ত অন্যান্য খাবার নিয়েও বিভিন্ন অভিযোগ উঠতে থাকে। উপায় না দেখে কারখানা কর্তৃপক্ষ একদল চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করে এর কিনারা বের করতে। তাদের আশঙ্কা ছিল কারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ কর্মচারীদের ওপর বিষক্রিয়া করতে পারে। এরই মধ্যে ববের মৃত্যু হয় রহস্যময় রোগ বোভিংডন বাগে আক্রান্ত হয়ে। গ্রাহামের চাকরির তখন সবেমাত্র দুই মাস হয়েছে। গ্রাহাম চাকরি নেওয়ার একমাসের মধ্যেই সে অসুস্থ হতে শুরু করে। অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকলে তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় দুইবার তার হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলে তাকে তৎক্ষণাৎ

আইসিইউতে (I.C.U, Intensive Care Unit) নেওয়া হয়। বেশ কিছুদিন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় থেকে জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে করতে ৭ জুলাই তার মৃত্যু হয়। ববের মৃত্যুতে গ্রাহামকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখা যায় এবং সে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বেশ বিমর্ষ ছিল।

এর কিছুদিন পরই সেপ্টেম্বরে ফ্রেডরিকের মৃত্যু হয়। অসুস্থ হওয়ার পর তাকে লন্ডন হসপিটালে (London Hospital) নিয়ে যাওয়া হয়। তার ছিল অসহনীয় পেট ব্যথা ও সাথে বমি। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় তার রক্ত বমি শুরু হয়। প্রায় তিন সপ্তাহ পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুসংবাদেও গ্রাহামকে দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। সে বলেছিল, 'হতভাগা বুড়ো ফ্রেড! তার কী হয়েছিল এটি ভেবেই অবাক হই আমি। তার মতো ভালো লোকের এভাবে মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। আমি তার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলাম।' দুইজনের মৃত্যুর পর কারখানার সবার মধ্যে মৃত্যুভয় ঢুকে যায়। বেশিরভাগ কর্মচারী চাকরি ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেয় এবং সুচিকিৎসার দাবি করে। বেশ কিছু দক্ষ চিকিৎসক এ কাজে তৎপর হয়ে ওঠে। সেই সাথে পুলিশী তদন্তেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। এদিকে একজন চিকিৎসকের সন্দেহ পড়ে গ্রাহামের ওপর। একইসাথে কারখানার প্রধান মেডিকেল অফিসার ইয়াইন অ্যান্ডারসনের (Iain Anderson) মাথায় হঠাৎই ব্যাপারটি আসে। গ্রাহাম সবসময়ই রাসায়নিক পদার্থ ও বিষ সম্পর্কে তার জ্ঞান জাহির করে বেড়াত যা ইয়াইনের কাছে কখনোই ভালো লাগেনি। তদন্তকারী চিকিৎসককে গ্রাহাম জিজ্ঞাসা করে যে, তারা থ্যালিয়ামের বিষক্রিয়ার ব্যাপারটি ভেবে দেখেছে কিনা, কেননা এই কারখানায় থ্যালিয়ামের ব্যবহারই প্রধান। সে তার কাছেও বিষক্রিয়া বা টক্সিকোলজি নিয়ে তার জ্ঞান জাহির করে যা তার সন্দেহ বাড়ায়। ইয়াইনের সাথে সে গ্রাহামের ব্যাপারটি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করে বিষের প্রতি গ্রাহামের জ্ঞান ও আগ্রহের কথা জানতে পারে। ইয়াইন এরপর পুলিশের কাছে গিয়ে গ্রাহামের পূর্ব অপরাধ সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারে, তবে তা যথেষ্ট ছিল না। হেমেল হেমস্টেডের পুলিশ প্রধান ডিকেটটিভ চিফ ইন্সপেক্টর জন কার্কল্যান্ড (Detective Chief Inspector John Kirkland) গ্রাহামের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের (Scotland Yard) সাহায্য নেয়। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের তদন্ত রিপোর্টের ফলাফল আসামাত্রই গ্রাহামকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হয়।

গ্রাহামের বাসা ছিল কেন্টের শিয়ারনেসে (Sheerness, Kent) যা তার কর্মস্থল থেকে বেশি দূরে নয়। ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর পুলিশ তাকে কর্মস্থল থেকে গ্রেপ্তার করে ও তার বাসায় তল্লাশি চালায়। গ্রেপ্তার করার সময় গ্রাহামের পকেটে এক বোতল থ্যালিয়াম পাওয়া যায়। স্বাদগন্ধহীন এই ঘাতক বিষ দিয়েই সে এতগুলো মানুষকে রোগাক্রান্ত করেছিল এবং দুজনকে হত্যা করতে সফল

হয়েছিল। তার ঘরে বিছানার নিচে অসংখ্য বিষের বোতল পাওয়া যায় যার মধ্যে অ্যান্টিমনি, থ্যালিয়াম ও অ্যাকোনিটাইনই ছিল বেশি। ঘরের দেওয়ালে তার আদর্শদের ছবি সাঁটা ছিল, যেখানে হিটলার ও অন্যান্য নাৎসি নেতাদের সংখ্যাই ছিল বেশি। তার আলমারি থেকে একটি মোটা ডায়েরি পাওয়া যায় যেখানে তার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। বিভিন্ন বিষ, তাদের প্রভাব, পরিমাণ এবং কাকে কোন বিষ দেওয়া হবে সবই বিস্তারিত লেখা ছিল সেখানে। কী পরিমাণে কোন বিষ প্রয়োগ করলে অবধারিত মৃত্যু অথবা কীভাবে প্রয়োগ করলে অনেকদিন ভুগে মৃত্যু হবে তার নিখুঁত হিসাব লেখা ছিল সেখানে। বিষক্রিয়ার কোনো গবেষণা গ্রন্থের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না তার ডায়েরি।

১৯৭২ সালে সেন্ট অ্যালকনসে (St Albans) তার মামলার শুনানি শুরু হয়। দুইজন মানুষকে হত্যা ও ৭০ জনকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত গ্রাহামকে অপরাধী ঘোষণা করে সাজা শোনাতে বিচারকগণের মাত্র এক ঘণ্টা বা তারও কম সময় লেগেছিল। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে সর্বোচ্চ পাহারায় আবারও অপরাধীদের হাসপাতাল ব্রডমুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এবারে সেখানে তার নতুন বন্ধু হয়। 'দ্য মুরস মার্ডারার আইয়্যান ব্র্যাডি' (The Moors Murderer, Ian Brady) ছিল তার রুমমেট। ব্র্যাডির আত্মজীবনীতে গ্রাহামের বেশ প্রশংসা পাওয়া যায়। এক স্থানে সে লিখেছে, 'গ্রাহাম ইয়াংয়ের প্রতি সহানুভূতি না আসাটাই বরং কঠিন।' আরও একজন কুখ্যাত অপরাধী রয় শ (Roy Shaw) তার আত্মজীবনী 'প্রিটি বয়' (Pretty Boy) গ্রন্থে গ্রাহাম ইয়াংয়ের সাথে বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করেছে। মামলার শুনানির সময় গ্রাহাম তার ডায়েরিকে একটি কাল্পনিক উপন্যাস বলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। তার ভাষ্যমতে তার বইয়ের নাম, 'দ্য টি কাপ পয়সনার' যা পরবর্তীতে তারই খেতাব হয়ে যায়। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর তাকে পার্কহার্স্ট (Parkhurst) কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৮৯ সালে মাত্র ৪২ বছর বয়সে কারাপ্রকোষ্ঠেই তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর কারণ ছিল মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন (Myocardial Infarction) বা হৃদপিণ্ডের কলাবিনষ্টি। স্বাভাবিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়েই মৃত্যু ঘটে দ্য টি কাপ পয়সনারের।